সমালোচনা-সংগ্রহ

তৃতীয় সংস্করণ

(তৃতীয় মুদ্রণ)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত

১৯৪৮

সূচী

সাহিত্য-প্রসঙ্গ

কবি-প্রসঙ্গ

[দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রবন্ধ ব্যতীত সমুদয় প্রবন্ধের স্বত্বাধিকারিগণের অনুমতিক্রমে প্রবন্ধগুলি মুদ্রিত হইল। এইজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ স্বত্বাধিকারিগণের প্রত্যেকের নিকট কৃতজ্ঞ।]

সম্পাদকের মন্তব্য

বাঙ্গালা সমালোচন-সাহিত্যের বয়স তেমন বেশী না হইলেও সাহিত্য-সমাজে ইহার জন্ম-ইতিহাস-সম্বন্ধে একটি ভ্রান্ত মতের প্রচলন দেখা যায়। 'ভবানীপুর-সাহিত্য-সম্মিলনে' মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল তাঁহার 'অভিভাষণে'র একস্থানে বলেন, "বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথমে বঙ্গদর্শনে বাংলাতে সাহিত্য-সমালোচনার পথ দেখাইয়া দেন। তাঁর পূর্ব্বে সাহিত্য-সমালোচনা কাকে বলে, বাংলায় কেহ জানিত বলিয়া বোধ হয় না।" শুধু বিপিনচন্দ্রের নহে, আরও অনেকের রচনায় এইরূপ মন্তব্য পরিদৃষ্ট হয়। বিপিন বাবুর পূর্ব্বে, পণ্ডিতপ্রবর হরপ্রসাদও তাঁহার 'বঙ্কিমবাবু ও উত্তরচরিত'-শীর্ষক প্রবন্ধে এই প্রকার মতই প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু ইতিহাসের সাক্ষ্য গ্রহণ করিলে, এই প্রচলিত মতকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যায় না।

ইউরোপীয় সাহিত্য-সমালোচনার অনুকরণে বাঙ্গালা সমালোচনার যে সৃষ্টি হইয়াছে, এ কথা অবশ্য অস্বীকার্য্য নহে। কিন্তু সে সৃষ্টির সূত্রপাত বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার বঙ্গদর্শনে করিয়াছিলেন, এমন কথা বলিলে ভুল হইবে। বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গসাহিত্যে যে সমালোচন-প্রতিভার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহা সত্যই অনন্যসাধারণ। তাঁহারই হাতে পড়িয়া এ জিনিসটার যে সবিশেষ উৎকর্ষ-লাভ ঘটে, সে বিষয়েও সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার উৎপত্তি হইয়াছিল রাজেন্দ্রলাল মিত্র-সম্পাদিত 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ'-নামক মাসিক পত্রে।

এই কাগজখানি বঙ্গদর্শন-প্রকাশের প্রায় একুশ বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত হয়। বিবিধার্থ-সংগ্রহে বিদ্যাসাগর, প্যারীচাঁদ, রামনারায়ণ, রঙ্গলাল, মধুসূদন, দীনবন্ধু প্রভৃতি বহু বিখ্যাত গ্রন্থকারের বহু গ্রন্থের সমালোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। এ সব সমালোচনা কে বা কাহারা লিখিতেন, তাহা এখন নিশ্চিতরূপে বলা সুকঠিন। তবে দেখিতে পাই, নাট্যকার মনোমোহন বসু মহাশয় ২৫শে জ্যৈষ্ঠ, ১২৮০ সালে তাঁহার 'মধ্যস্থ-' নামক সাপ্তাহিক পত্রে লিখিয়া গিয়াছেন, "মৃত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছিলাম, তিনিই বিবিধার্থ-সংগ্রহে ইহার (সমালোচনার) প্রথম পথ-প্রদর্শন করেন।" এ কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে কালীপ্রসন্নকেই বঙ্গসাহিত্যের আদি সমালোচক বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হইবে। আমরা অবশ্য এ কথায় অবিশ্বাস করিবার তেমন কোনও কারণ দেখি না।

রাজেন্দ্রলালের পর কালীপ্রসন্নই বিবিধার্থ-সংগ্রহের সম্পাদক-পদে নিযুক্ত হন। এই সময়ে এই কাগজের 'ভূমিকা'য় তিনি রাজেন্দ্রলাল-সম্পাদিত বিবিধার্থ-সংগ্রহে

প্রকাশিত সমালোচনার উদ্দেশে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহাতে যেন ঐ উক্তিরই ইঙ্গিত আছে বলিয়া মনে করি। তিনি লিখিয়াছিলেন, "বিবিধার্থ নিয়ত শুদ্ধ সাধারণের হিতচেষ্টায় নিযুক্ত ছিল; এবং কখন কাহারও নিন্দা বা সম্পদ্-সুলভ সন্মান-লোভে ধনীর উপাসনা করে নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে নূতন গ্রন্থের সমালোচন-সময়ে কখন কখন কোন কোন গ্রন্থকারের উপরে কটাক্ষের আভাস হইয়াছিল, কিন্তু তাহা ভানমাত্র; তাহাতে কেবল গ্রন্থই উদ্দেশ্য, কদাপি কোন গ্রন্থকারের নিন্দা অভিধেয় হয় নাই। তাহা পরিশুদ্ধ সরল-হৃদয়-সম্ভূত, তাহাতে দোষ বা রোষের লেশও লক্ষিত হয় না; বরং ভারতবর্ষীয় বর্তমান গ্রন্থকারকুলের কল্যাণ-সাধনই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য।" —এই লেখাটুকুর মধ্যে আত্মগত কৈফিয়তেরই একটু আভাস নাই কি?

বিবিধার্থ সংগ্রহের আরও একটি কৃতিত্বের কথা এখানে স্মরণযোগ্য। যে 'সমালোচনা'-শব্দ আজকাল আমাদের একটি ঘরোয়া কথার মতন হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সে শব্দটিও বিবিধার্থ-সংগ্রহের সৃষ্টি। ইহার পূর্ব্বে এ শব্দের ব্যবহার আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। আধুনিক কোনও কোনও লেখক এ শব্দের প্রতি প্রসন্ন নহেন। 'সম্' ও 'আ' এই দুই উপসর্গের একই প্রকার অর্থ ভাবিয়া তাঁহারা সংস্কৃত 'আলোচনা'-শব্দের পূর্ব্বে 'সম্' উপসর্গের সংযোগকে অসঙ্গত বলিয়া ঘোষণা করেন। তাঁহারা বলেন, ইংরাজী Criticism শব্দের প্রতিবাক্য-হিসাবে 'আলোচনা' ও 'সমালোচনা' এই দুই শব্দের মধ্যে যদি কোনটিকে রাখিতে হয়, তবে 'সম্'কে বাদ দিয়া 'আলোচনা'কে রক্ষা করাই শ্রেয়ঃ। আমাদের কিন্তু অন্যরূপ ধারণা। মনে হয়, পণ্ডিতেরা 'নিরুক্তে'র 'সমাম্নায়ঃ' ও 'সমাম্নাতঃ' শব্দ দুইটির যে ভাবে অর্থ করিয়া থাকেন, সেই ভাবে 'সমালোচনা' শব্দটিকে যদি আমরা বুঝিবার চেষ্টা করি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে, উহার 'সম্' ও 'আ' এই দুই উপসর্গেরই রীতিমত সঙ্গতি, সার্থকতা ও উপযোগিতা আছে। সমালোচনা অর্থে 'সম্' অর্থাৎ সম্যক্, 'আ' অর্থাৎ পরিপাটির সহিত এবং 'লোচন' অর্থাৎ ঈক্ষণ। সুতরাং বলিতে হয়, ইংরাজী 'Criticism' শব্দের প্রতিবাক্য-হিসাবে যিনি এই শব্দের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার শব্দ-গঠন-শক্তি প্রশংসনীয়; এবং এই জন্যই বোধ হয়, ভূদেব, রাজনারায়ণ, বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্র প্রভৃতি সেকালের পণ্ডিত ও চিন্তাশীল লেখকেরা এই শব্দটিকে গ্রহণ করিতে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচবোধ করেন নাই। রবীন্দ্রনাথের রচনায় ঐ শব্দের বহুল ব্যবহার আছে বলিলে যথেষ্ট হইবে না—'সমালোচনা' নামে তাঁহার একখানি গ্রন্থও আমরা দেখিয়াছি। এই সঙ্কলন-গ্রন্থে তাঁহার রচিত 'সাহিত্য-সমালোচনা' ও ঠাকুরদাসের লিখিত 'সমালোচনা ও সমালোচক' নামে যে দুইটি প্রবন্ধ আছে, তাহাও এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। সুতরাং সাহিত্য-সংসারে এই শব্দ যখন এমন ভাবে চলিয়া গিয়াছে, তখন ইহা ঠিক হউক আর না হউক, ইহার বিরুদ্ধে কিছু বলিতে গেলে কেহ তাহা শুনিবে না। আমরাও শুনি নাই। তাই এই সংগ্রহ-পুস্তকের নামকরণ হইয়াছে সমালোচনা-সংগ্রহ। *

বিবিধার্থ-সংগ্রহ যে সমালোচনা-পদ্ধতির প্রবর্তন করেন, সেই পদ্ধতি-অনুসারে বাঙ্গালা-গ্রন্থের সমালোচনা পরে 'রহস্য সন্দর্ভ,' 'সর্বার্থ সংগ্রহ,' ঢাকার 'মিত্র প্রকাশ' প্রভৃতি পত্রিকার সমানে সতেজে চলিয়াছিল। তারপর বঙ্কিমের বঙ্গদর্শনের অভ্যুদয়। এই বঙ্গদর্শনে বঙ্কিম-কৃত সমালোচনার উদ্দেশে এত লেখক এত প্রশংসার কথা কহিয়াছেন যে, এখানে আমাদের আর কিছু না বলিলেও চলে। তবে প্রসঙ্গক্রমে এটুক্ বলা প্রয়োজন যে, বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্য-সমালোচনার যে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেন, সেই আদর্শের অনুসরণে সে-সময়ে অক্ষয়চন্দ্র সরকার, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকজন প্রতিভাশালী লেখক উহার পুষ্টি-সাধনে অগ্রসর হইয়াছিলেন। ইহার অল্প কাল পরেই, এ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ দেখা দেন। বলা বাহুল্য যে, সমতিবিলম্বেই তাঁহার সমালোচনা-নৈপুণ্যের যশঃ-সৌরভ চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইতে আরম্ভ হয়। বস্তুতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের পর, বাঙ্গালা সমালোচনা-সাহিত্যের নূতন রূপের প্রবর্ত্তক-হিসাবে যদি কাহারও নাম করিতে হয়, তাহা হইলে তাঁহার নামই অবশ্য-করণীয়।

এই সংগ্রহ-পুস্তকে বিষয়-হিসাবে 'সাহিত্য-প্রসঙ্গ' ও 'কবি-প্রসঙ্গ' নামে দুইটি বিভাগ করা হইয়াছে। 'কবি-প্রসঙ্গে' যাঁহাদের কথা আছে, তাঁহাদের মধ্যে একমাত্র জয়দেব ব্যতীত আর সকলেই বঙ্গ-ভাষার কবি। জয়দেব বাঙ্গালী কবি হইলেও তাঁহার কাব্য সংস্কৃত ভাষায় রচিত। সুতরাং এরূপ প্রশ্ন অনেকের মনে জাগিতে পারে যে, উক্ত প্রসঙ্গ-মধ্যে জয়দেব প্রবেশ-লাভ করিলেন কেন?

এই 'কেন'রই একটু উত্তর এখানে দিতেছি। বাঙ্গালা-গীতি-কবিতার আদি উৎস নিরূপণ করিতে গিয়া আমাদের দেশের বড় বড় লেখকগণের মধ্যে কেহ বৌদ্ধ দোহার, আর কেহ বা সুরদাস প্রভৃতির হিন্দী কবিতার উল্লেখ করিয়াছেন। আমাদের কিন্তু মনে হয়, চণ্ডীদাসাদি কবিগণ 'জয়দেবের ভাষা, জয়দেবের ছন্দ, জয়দেবের পদ-বিন্যাস-পদ্ধতি ও সঙ্গীত-রীতি'র নিকট যেরূপ ঋণী, তেমন আর কাহারও নিকট নহেন। এই কথাটাই 'জয়দেব'-প্রবন্ধে অতি পরিপাটির সহিত বুঝাইয়া বলা হইয়াছে।

আসল কথা, কলেজের ছাত্রগণ বঙ্গসাহিত্য-সম্বন্ধে যাহাতে নানা জ্ঞাতব্য তত্ত্ব ও তথ্য জানিতে পারেন, যাহাতে সাহিত্য-বিষয়ে তাঁহাদের বিচার-শক্তির উন্মেষ ঘটে, সেই দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই এই পুস্তক-সম্পাদনের প্রয়াস পাইয়াছি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান ভাইস্-চ্যান্সেলার শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, এম্.এ. বি.এল্. ব্যারিষ্টার-এট্-ল, এম্.এল্.এ. মহোদয়েরও আমার উপর এইরূপ নির্দ্দেশ ছিল। সে নির্দ্দেশ-প্রতিপালনের যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। চেষ্টা সফল হইয়াছে কিনা, বলিতে পারি না। তবে এ ধরণের সংগ্রহ-পুস্তক বঙ্গভাষায় যে এই প্রথম প্রকাশিত হইল, এ কথা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিবেন না।

পরিশেষে বক্তব্য, এই সংগ্রহ-পুস্তকে যে সমস্ত প্রবন্ধের সন্নিবেশ করিয়াছি, প্রায় সকলগুলিই বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। কেবল বঙ্কিমচন্দ্র-লিখিত

'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত', 'প্যারীচাঁদ মিত্র' ও 'দীনবন্ধু মিত্র'—এই তিনটি প্রবন্ধ ঐ তিন গ্রন্থকারের 'গ্রন্থাবলী'তে ভূমিকা-স্বরূপ প্রকাশিত হয়। যাহা হউক, প্রবন্ধগুলিকে এই পুস্তকে সাজাইবার সময়ে প্রবন্ধ-রচয়িতৃগণের জন্ম-তারিখ বা তাঁহাদের খ্যাতি-প্রতিপত্তির দিকে আমরা লক্ষ্য রাখি নাই। প্রবন্ধসমূহের প্রথম প্রকাশের কালানুযায়ী যথাক্রমে উহাদিগকে বিন্যস্ত করা হইয়াছে।

১৯৩৭

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন

১৯৩৭ সালে এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ মুদ্রিত হইয়াছিল। প্রথম সংস্করণের ছয়টি প্রবন্ধ এই সংস্করণে বর্জিত, এবং তৎপরিবর্তে এগারটি প্রবন্ধ সংযোজিত হইল।

১৯৩৯

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়

তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন

এই সংস্করণে দ্বিতীয় সংস্করণের চারিটি প্রবন্ধ বাদ দিয়া তৎস্থানে সাতটি প্রবন্ধ যোগ করা হইয়াছে।

১৯৪৩

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়

সাহিত্য-প্রসঙ্গ

সমালোচনা-সংগ্রহ

গীতিকাব্য

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কাব্য কাহাকে বলে, তাহা অনেকে বুঝাইবার জন্য যত্ন করিয়াছেন, কিন্তু কাহারও যত্ন সফল হইয়াছে কি না সন্দেহ। ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, দুই ব্যক্তি কখনও এক প্রকার অর্থ করেন নাই। কিন্তু কাব্যের যথার্থ লক্ষণসম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও কাব্য একই পদার্থ সন্দেহ নাই। সেই পদার্থ কি, তাহা কেহ বুঝাইতে পারুন বা না পারুন, কাব্যপ্রিয় ব্যক্তিমাত্রেই এক প্রকার অনুভব করিতে পারেন।

কাব্যের লক্ষণ যাহাই হউক না কেন, আমাদিগের বিবেচনায় অনেকগুলিন গ্রন্থ, যাহার প্রতি সচরাচর কাব্য-নাম প্রযুক্ত হয় না, তাহাও কাব্য। মহাভারত, রামায়ণ ইতিহাস বলিয়া খ্যাত হইলেও তাহা কাব্য; শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ বলিয়া খ্যাত হইলেও তাহা অংশবিশেষে কাব্য। স্কটের উপন্যাসগুলিকে আমরা উৎকৃষ্ট কাব্য বলিয়া স্বীকার করি। নাটককে আমরা কাব্য-মধ্যে গণ্য করি, তাহা বলা বাহুল্য।

ভারতবর্ষীয় এবং পাশ্চাত্য আলঙ্কারিকেরা কাব্যকে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। তাহার মধ্যে অনেকগুলিন বিভাগ অনর্থক বলিয়া বোধ হয়। তাঁহাদিগের কথিত তিনটি শ্রেণী গ্রহণ করিলেই যথেষ্ট হয়; যথা—১ম দৃশ্যকাব্য, অর্থাৎ নাটকাদি; ২য় আখ্যানকাব্য অথবা মহাকাব্য; রঘুবংশের ন্যায় বংশাবলীর উপাখ্যান, রামায়ণের ন্যায় ব্যক্তি-বিশেষের চরিত, শিশুপাল-বধের ন্যায় ঘটনা-বিশেষের বিবরণ, সকলই ইহার অন্তর্গত; বাসবদত্তা, কাদম্বরী প্রভৃতি গদ্যকাব্য ইহার অন্তর্গত এবং আধুনিক উপন্যাসসকল এই শ্রেণীভুক্ত। ৩য় খণ্ডকাব্য,—যে কোন কাব্য প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত নহে, তাহাকেই আমরা খণ্ডকাব্য বলিলাম।

দেখা যাইতেছে যে, এই ত্রিবিধ কাব্যের রূপগত বিলক্ষণ বৈষম্য আছে; কিন্তু রূপগত বৈষম্য প্রকৃত বৈষম্য নহে। দৃশ্যকাব্য সচরাচর কথোপকথনেই রচিত হয় এবং রঙ্গাঙ্গনে অভিনীত হইতে পারে, কিন্তু যাহাই কথোপকথনে গ্রথিত এবং অভিনয়োপযোগী, তাহাই যে নাটক বা তৎশ্রেণীস্থ, এমত নহে। এ দেশের লোকের সাধারণতঃ উপরি-উক্ত ভ্রান্তিমূলক সংস্কার আছে। এই জন্য নিত্য দেখা যায় যে, কথোপকথনে

গ্রথিত অসংখ্য পুস্তক নাটক বলিয়া প্রচারিত, পঠিত, এবং অভিনীত হইতেছে। বাস্তবিক, তাহার মধ্যে অনেকগুলিন নাটক নহে। পাশ্চাত্ত্য ভাষায় অনেকগুলিন উৎকৃষ্ট কাব্য আছে, যাহা নাটকের ন্যায় কথোপকথনে গ্রথিত, কিন্তু বস্তুতঃ নাটক নহে। "Comus," "Manfred," "Faust" ইহার উদাহরণ। অনেকে শকুন্তলা ও উত্তররামচরিতকেও নাটক বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, ইংরেজি ও গ্রীকভাষা ভিন্ন কোন ভাষায় প্রকৃত নাটক নাই। পক্ষান্তরে, গেটে বলিয়াছেন যে, প্রকৃত নাটকের পক্ষে, কথোপকথনে গ্রন্থন বা অভিনয়ের উপযোগিতা নিতান্ত আবশ্যক নহে। আমাদিগের বিবেচনায় "Bride of Lammermoor"কে নাটক বলিলে অন্যায় হয় না। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, আখ্যানকাব্য ও নাটককাব্যে প্রণীত হইতে পারে, অথবা গীত-পরম্পরায় সন্নিবেশিত হইয়া গীতিকাব্যের রূপ ধারণ করিতে পারে। বাঙ্গালা ভাষায় শেষোক্ত বিষয়ের উদাহরণের অভাব নাই। পক্ষান্তরে, দেখা গিয়াছে অনেক খণ্ডকাব্য মহাকাব্যের আকারে রচিত হইয়াছে। যদি কোন একটি সামান্য উপাখ্যানের সূত্রে গ্রথিত কাব্যমালাকে আখ্যানকাব্য বা মহাকাব্য নাম দেওয়া বিধেয় হয়, তবে "Excursion" এবং "Childe Harold"কে ঐ নাম দিতে হয়, কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় ঐ দুই কাব্য খণ্ড-কাব্যের সংগ্রহ মাত্র।

খণ্ডকাব্য-মধ্যে আমরা অনেক প্রকার কাব্যের স্থান করিয়াছি। তন্মধ্যে একপ্রকার কাব্য প্রাধান্য লাভ করিয়া ইউরোপে গীতিকাব্য (Lyric) নামে খ্যাত হইয়াছে। অদ্য সেই শ্রেণীর কাব্যের কথায় আমাদিগের প্রয়োজন।

ইউরোপে কোন বস্তু একটি পৃথক্ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া আমাদিগের দেশেও যে একটি পৃথক্ নাম দিতে হইবে, এমত নহে। যেখানে বস্তুগত কোন পার্থক্য নাই, সেখানে নামের পার্থক্য অনর্থক এবং অনিষ্টজনক, কিন্তু যেখানে বস্তুগুলি পৃথক্, সেখানে নামও পৃথক হওয়া আবশ্যক। যদি এমত কোনও বস্তু থাকে যে, তাহার জন্য গীতিকাব্যনামটি গ্রহণ করা আবশ্যক, তবে অবশ্য ইউরোপের নিকট আমাদিগকে ঋণী হইতে হইবে।

গীত মনুষ্যের একপ্রকার স্বভাবজাত। মানব ভাব কেবল কথায় ব্যক্ত হইতে পারে, কিন্তু কণ্ঠভঙ্গীতে তাহা স্পষ্টীকৃত হয়। 'আঃ' এই শব্দ কণ্ঠভঙ্গীর গুণে দুঃখবোধক হইতে পারে, বিরক্তিবাচক হইতে পারে এবং সাকাঙ্ক্ষিও হইতে পারে। "তোমাকে না দেখিয়া আমি মরিলাম"—ইহা শুধু বলিলে দুঃখ বুঝাইতে পারে, কিন্তু উপযুক্ত স্বরভঙ্গীর সহিত বলিলে দুঃখ শতগুণ অধিক বুঝাইবে। এই স্বর-বৈচিত্র্যের পরিণামই সঙ্গীত। সুতরাং মনের বেগ-প্রকাশের জন্য আগ্রহাতিশয্য-প্রযুক্ত মনুষ্য সঙ্গীতপ্রিয় এবং তৎসাধনে স্বভাবতঃ যত্নশীল।

কিন্তু অর্থযুক্ত বাক্য ভিন্ন চিত্ত-ভাব ব্যক্ত হয় না; অতএব সঙ্গীতের সঙ্গে বাক্যের সংযোগ আবশ্যক। সেই সংযোগোৎপন্ন পদকে গীত বলা যায়।

গীতের জন্য বাক্য-বিন্যাস করিলে দেখা যায় যে, কোন নিয়মাধীন বাক্য-বিন্যাস করিলেই গীতের পারিপাট্য হয়। সেই সকল নিয়মগুলির পরিজ্ঞানেই ছন্দের সৃষ্টি।

গীতের পারিপাট্য জন্য আবশ্যক দুইটি,—স্বর-চাতুর্য্য এবং শব্দ-চাতুর্য্য। এই দুইটি পৃথক পৃথক দুইটি ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। দুইটি ক্ষমতাই একজনের সচরাচর ঘটে না। যিনি সুকবি, তিনিই সুগায়ক, ইহা অতি বিরল।

কাজে কাজেই একজন গীত রচনা করেন, আর একজন গান করেন। এইরূপে গীত হইতে গীতিকাব্যের পার্থক্য জন্মে। গীত হওয়াই গীতিকাব্যের আদিম উদ্দেশ্য, কিন্তু যখন দেখা গেল যে, গীত না হইলেও কেবল ছন্দোবিশিষ্ট রচনাই আনন্দদায়ক এবং সম্পূর্ণ চিত্তভাবব্যঞ্জক, তখন গীতোদ্দেশ্য দূরে রহিল, অগেয় গীতিকাব্য রচিত হইতে লাগিল।

অতএব গীতের যে উদ্দেশ্য, যে কাব্যের সেই উদ্দেশ্য তাহাই গীতিকাব্য। বক্তার ভাবোচ্ছ্বাসের পরিস্ফুটতামাত্র যাহার উদ্দেশ্য, সেই কাব্যই গীতিকাব্য।

বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদিগের রচনা ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরী, মাইকেল মধুসূদন দত্তের ব্রজাঙ্গনা কাব্য হেমবাবুর কবিতাবলী, ইহাই বাঙ্গালা ভাষায় উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য। অবকাশরঞ্জিনী আর একখানি উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য। *

যখন হৃদয় কোন বিশেষ ভাবে আচ্ছন্ন হয়,—স্নেহ কি শোক, কি ভয় কি যাহাই হউক, তাহার সমুদয়াংশ কখন ব্যক্ত হয় না। কতকটা ব্যক্ত হয়, কতকটা ব্যক্ত হয় না। যাহা ব্যক্ত হয়, তাহা ক্রিয়ার দ্বারা বা কথার দ্বারা। সেই ক্রিয়া এবং কথা নাটককারের সামগ্রী। যেটুকু অব্যক্ত থাকে সেইটুকু গীতিকাব্য-প্রণেতার সামগ্রী। যেটুকু সচরাচর অদৃষ্ট, অদর্শনীয় এবং অন্যের অননুমেয় অথচ ভাবাপন্ন ব্যক্তির রুদ্ধ হৃদয়মধ্যে উচ্ছ্বসিত, তাহা তাঁহাকে ব্যক্ত করিতে হইবে। মহাকাব্যের বিশেষ গুণ এই যে, কবির উভয়বিধ অধিকার থাকে। ব্যক্তব্য এবং অব্যক্তব্য উভয়ই তাঁহার আয়ত্ত। মহাকাব্য নাটক এবং গীতিকাব্যের এই একটি প্রধান প্রভেদ বলিয়া বোধ হয়। অনেক নাটককর্ত্তা তাহা বুঝেন না, সুতরাং তাঁহাদিগের নায়ক-নায়িকার চরিত্র অপ্রাকৃত এবং বাগাড়ম্বরবিশিষ্ট হইয়া উঠে। সত্য বটে যে গীতিকাব্য-লেখককেও বাক্যের দ্বারাই রসোদ্ভাবন করিতে হইবে, নাটককারেরও সেই বাক্য সহায়। কিন্তু যে বাক্য ব্যক্তব্য, নাটককার কেবল তাহাই বলাইতে পারেন। যাহা অব্যক্তব্য, তাহাতেই গীতিকাব্যকারের অধিকার। উদাহরণ ভিন্ন ইহা অনেকে বুঝিতে পারিবেন না। কিন্তু এ বিষয়ের একটি উত্তম উদাহরণ উত্তরচরিত-সমালোচনায় উদ্ধৃত হইয়াছে। সীতা-বিসর্জ্জন-কালে ও তৎপরে রামের ব্যবহারে যে তারতম্য ভবভূতির নাটকে এবং বাল্মীকির রামায়ণে দেখা যায়, তাহার আলোচনা করিলে

* যখন এই প্রবন্ধ লিখিত হয়, তখন রবীন্দ্রবাবুর কাব্যসকল প্রকাশিত হয় নাই।

এই কথা হৃদয়ঙ্গম হইবে। রামের চিত্তে যখন যে ভাবের উদয় হইতেছে, ভবভূতি তৎক্ষণাৎ তাহা লেখনীমুখে ব্যক্ত করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বাক্তব্য এবং অবাক্তব্য উভয়ই তিনি অকুণ্ঠ নাটক-মধ্যগত করিয়াছেন। ইহাতে নাটকোচিত কার্য্য না করিয়া গীতিকাব্যকারের অধিকারে প্রবেশ করিয়াছেন। বাল্মীকি তাহা না করিয়া কেবল রামের কার্য্যগুলিই বর্ণিত করিয়াছেন এবং তত্তৎ-কার্য্য-সম্পাদনার্থ যতখানি ভাব-ব্যক্তি আবশ্যক, তাহাই ব্যক্ত করিয়াছেন। ভবভূতি-কৃত ঐ রাম-বিলাপের সঙ্গে ডেস্‌ডিমোনা-বধের পর ওথেলোর বিলাপের বিশেষ করিয়া তুলনা করিলেও এ কথা বুঝা যাইবে। সেক্ষপীয়র এমত কোন কথাই তৎকালে ওথেলোর মুখে ব্যক্ত করেন নাই, যাহা তৎকালীন কার্য্যার্থ বা অন্যের কথার উত্তরে ব্যক্ত করা প্রয়োজন হইতেছে না, বাক্যব্যয় অতিরিক্ত তিনি এক কথাও বলান নাই। তিনি ভবভূতির ন্যায় নায়কের হৃদয়ানুসন্ধান করিয়া ভিতর হইতে এক একটি ভাব টানিয়া আনিয়া একে একে প্রকাশ করিয়া সারি দিয়া সাজান নাই। অথচ কে না বলিবে যে, রামের মুখে যে দুঃখ ভবভূতি ব্যক্ত করিয়াছেন তাহার সহস্রগুণ দুঃখ সেক্ষপীয়র ওথেলোর মুখে ব্যক্ত করিয়াছেন।

সহজেই অনুমেয় যে, যাহা বাক্তব্য, তাহা পর-সম্বন্ধীয় বা কোন কার্য্যোদ্দিষ্ট। যাহা অবাক্তব্য, তাহা আত্মচিত্ত-সম্বন্ধীয় উক্তিমাত্র তাহার উদ্দেশ্য। এরূপ কথা যে নাটকে একেবারে সন্নিবেশিত হইতে পারে না এমত নহে, বরং অনেক সময়ে হওয়া আবশ্যক। কিন্তু ইহা কখন নাটকের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। নাটকের যাহা উদ্দেশ্য, তাহার আনুষঙ্গিকতা-বশতঃ প্রয়োজনমত কদাচিৎ সন্নিবেশিত হয়।

[বঙ্গদর্শন, ১২৮০]

পলাশির যুদ্ধ

কালীপ্রসন্ন ঘোষ

মনুষ্য-জগতে নির্দ্দোষ রূপ নাই এবং নির্দ্দোষ কাব্য নাই। কবিবর শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র সেনের এই কাব্যখানিও সর্ব্বাংশে নির্দ্দোষ নহে। তবে এ কথা তথাপি অকুণ্ঠ চিত্তে বলা যাইতে পারে যে, 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্য সর্ব্বত্রই তাঁহার অসাধারণ কবিত্বের নিদর্শন রহিয়াছে। ইহা নিশ্চয়ই বাঙ্গালা ভাষার কণ্ঠদেশে একটি কমনীয় আভরণ-স্বরূপ গ্রথিত হইল, এবং যত দিন এই ভাষা জীবিত থাকিবে, ততদিনই ইহার প্রফুল্লকান্তি সহৃদয়ের হৃদয়-দর্পণে প্রতিফলিত হইবে।

এই কাব্যের বিষয় পলাশির প্রসিদ্ধ যুদ্ধ, অথবা নবাব সিরাজদ্দৌলার পতন এবং বঙ্গে ইংরেজ-রাজলক্ষ্মীর প্রথম অভ্যুদয়। এদেশীয়েরা সাধারণতঃ যে সকল বিষয়ের আদর করিয়া থাকেন, এই কাব্যে তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ইহাতে দেবতা নাই, গন্ধর্ব্ব নাই, দেবাসুরের যুদ্ধ নাই, তপোবন প্রভৃতির বর্ণনা নাই, জটাচীরধারী তাপসদিগের কঠোর তপস্যার কথা অথবা শৈবাল-সমাবৃতা পদ্মিনীর ন্যায় বল্কলাবৃতা তপস্বিকন্যাদিগের প্রেম, বিরহ ও অশ্রুবর্ষণ প্রভৃতি এতদ্দেশপ্রিয় অস্বাভাবিক বৃত্তান্তনিচয়েরও উল্লেখ নাই। কিন্তু তথাচ ইহাতে যাহা আছে, তাহা পাঠ করিবার সময়ে হৃদয় অনির্ব্বচনীয় আনন্দে উচ্ছলিয়া উঠে এবং কল্পনা অনন্ত সমুদ্রে ভাসমান হয়।

পলাশির যুদ্ধ বলিলে বালকেরা মার্শম্যান সাহেবের ইতিহাস-পুস্তক স্মরণ করে, এবং যুবকেরা বিলাতের কোন প্রসঙ্গ মনে করিয়া বীতস্পৃহ হন। কিন্তু যাঁহাদিগের চক্ষু দৃষ্টিশক্তি লাভ করিয়াছে এবং বুদ্ধি চিন্তা-সহযোগে আমাদিগের কবির কল্পনার সঙ্গে উড্ডীন হইতে পারিবে, তাঁহাদিগের নিকট বঙ্গীয় কবির বীণার জন্য ইহা অপেক্ষা উচ্চতর বিষয় সম্ভবে না। পলাশির যুদ্ধ বর্ত্তমান ভারত-ইতিবৃত্তের প্রথম পৃষ্ঠা; পলাশির যুদ্ধ ভারতের নিয়তি-নেমির শেষ আবর্ত্ত। ভাগীরথী ও কালিন্দীর ন্যায় দুইটি পুরাণপ্রসিদ্ধ স্রোতস্বতী দুই দিক্ হইতে প্রবাহিত হইয়া যেখানে আসিয়া প্রণয়-ভরে পরস্পরকে আলিঙ্গন করে, অনেকে ভক্তিপ্লুত চিত্তে সেই স্থানকে তীর্থস্থান বলিয়া পূজা করেন। আবার, সমুন্নত পর্ব্বতোচ্ছাস-প্রবাহসকল যে স্থলে আসিয়া ভৈরবরবে পরস্পর-প্রহত হয়, এবং অপার তরঙ্গমালা সৃজন করিয়া চতুর্দ্দিক প্রকম্পিত করে, অনেকে প্রকৃতির মহিমায় মুগ্ধ হইয়া তাদৃশ স্থানকে বৈজ্ঞানিকের দর্শনস্থান বলিয়া আদর করেন। এই প্রকারে, পলাশির ক্ষেত্র মহাতীর্থ ও মহাদর্শন। এখানে পূর্ব্ব ও পশ্চিম পরস্পর সম্মিলিত হয়, এখানে প্রাচীন সভ্যতা ও আধুনিক উন্নতি এই দুই প্রতিকূল স্রোত পরস্পর পরস্পরকে আঘাত ও প্রতিঘাত করে। এখানে বাণিজ্যপরম্পরায় সমগ্র জাতি লোকের জাতীয় তেজের পরীক্ষা হইয়া যায়। এখানে দুই মহাদেশের দুইটি ইতিহাস, কালের এক কুক্ষিগত গ্রন্থিতে নিবদ্ধ হইয়া একীভূত নূতন মূর্ত্তিতে ভাসিয়া উঠে, এবং বঙ্গভূমি, ভারতবর্ষ ও সমস্ত এসিয়া-ভূখণ্ডে এইক্ষণ যে পরিবর্ত্তনের চক্র অনিবার্য্য গতিতে অহর্নিশ চলিতেছে, প্রকৃত প্রস্তাবে এখানেই তাহা প্রথম চালনা পায়। যদি ইতিহাসে পলাশির যুদ্ধ না থাকিত, তবে এদেশের অবস্থা এইক্ষণ কিরূপ হইত, তাহা চিন্তা করাও কঠিন। লোকে এইক্ষণ যে কুশিক্ষাপ্রবণ ও অভিনব সৃষ্টি দেখিয়া কখনও আশায় উৎফুল্ল, কখনও বিষাদে অবসন্ন হইতেছে, তাহার চিহ্নও কুত্রাপি পরিলক্ষিত হইত কি না, সন্দেহের কথা। বস্তুতঃ সমালোচ্য গ্রন্থে পলাশির যুদ্ধ যে ভাবে কল্পিত হইয়াছে, তাহা অতি উচ্চ শ্রেণীর কল্পনার পরিচয় দেয় এবং সমগ্র চিত্রটিকে হৃদয়ে গ্রহণ করিতে হইলে ইতিহাস-শৈলের ঊর্দ্ধতম শৃঙ্গে আরোহণ করিয়া ভারতের মানচিত্রকে পুনরায় কবির চক্ষে নিরীক্ষণ করা আবশ্যক হয়। নচেৎ পলাশির যুদ্ধ কিছুই নহে।

আমরা শুদ্ধ কল্পিত বিষয়ের উচ্চতা, প্রসার ও অতুল গৌরব স্মরণ করিয়াই কবির প্রশংসা করিতেছি না। এই কল্পনায় নবীনবাবুর আর একটি বিশেষ প্রশংসা আছে। তিনি যে পথে গমন করিয়াছেন, সে পথে কেহই তাঁহার পূর্ব্বে পাদক্ষেপ করেন নাই। তিনি যে 'মণিপূর্ণ খনিতে' সাহস সহকারে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, তাহার অভ্যন্তরে কেহই তাঁহার জন্য আলোকবর্ত্তিকা স্থাপন করেন নাই। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস প্রভৃতির সময় হইতে এদেশে যিনিই যে কোন কাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন, তিনিই একটি পুরাতন অবলম্ব পাইয়াছেন। কেহ পুরাণ ফুলে নূতন মালা গাঁথিয়াছেন, কেহ নূতন ফুলে পুরাণ সূত্র ব্যবহার করিয়াছেন। নবীনবাবুর তাহা হয় নাই। তাঁহার অবলম্ব স্বক্ষমতা ও স্বকীয় কল্পনা মাত্র। তাঁহার জন্য বাল্মীকিও মণি ছেদ করিয়া যান নাই, এবং কবি-কল্প-পাদপ কালিদাসও সূত্রবৎ রত্নরাশি সাজাইয়া রাখেন নাই। তাঁহাকে প্রায় সমস্তই স্বহস্তে সঞ্চয়ন ও স্বহস্তে গ্রন্থন করিতে হইয়াছে। ইহা সামান্য অভিমানের কথা নহে।

পলাশির যুদ্ধ কাব্য অনতিবৃহৎ পাঁচটি সর্গে বিভক্ত। ইহার প্রথম সর্গে নবাব বিদ্রোহীদিগের ষড়্‌যন্ত্র ও কুমন্ত্রণা, দ্বিতীয় সর্গে ব্রিটিশ সেনার শিবির-সন্নিবেশ, তৃতীয় সর্গে পলাশি-ক্ষেত্রের বর্ণনা-প্রসঙ্গে সিরাজদ্দৌলার তৎকালীন অবস্থা-বর্ণন ইত্যাদি, চতুর্থ সর্গে যুদ্ধ এবং পঞ্চম সর্গে শেষ আশা অথবা সিরাজদ্দৌলার শোচনীয় উপসং-হৃতা।

প্রথম সর্গের আরম্ভ যেমন গম্ভীর, তেমনই মনোহর। বোধ হয় মেঘনাদ-বধের আরম্ভ বিনা বাঙ্গালার কোন কাব্যের প্রারম্ভ বর্ণনাতেই এইরূপ ভয়ঙ্কর গাম্ভীর্য্য এবং এইরূপ পরিশুদ্ধ মনোহারিত্ব প্রদর্শিত হয় নাই। অভ্রভেদী পর্ব্বত কি অনন্ত-বিস্তারিত সমুদ্রাদির বর্ণনাতে মনে এক গাম্ভীর্য্যের আবেশ হয়। ইহা সেইরূপ গাম্ভীর্য্য নহে। কোন অলৌকিক-রূপলাবণ্যবতী অঙ্গনা, কি মৃদুহাসিনী সুপ্তোত্থিতা, কিংবা সরোবিলাসিনী ফুল্ল কমলিনী প্রভৃতির বর্ণনাতেও উৎকৃষ্ট কবিরা মনোহারিত্ব স্থাপন করিতে পারেন।

এই মনোহারিত্ব সেই প্রকারের নহে। যদি কোন প্রতিভাশালী চিত্রকর বিষাদের প্রতিমূর্ত্তি আঁকিয়া তুলিতে সমর্থ হইতেন এবং সেই মূর্ত্তিতে আতঙ্ক ও আশা এই উভয়ের বিরোধ এবং শোকের মলিনতা তদ্রূপ ফলাইতে পারিতেন, তবে তাহাকেই ইহার উপমাস্থল বলিয়া নির্দ্দেশ করিতাম। পড়িবার সময়ে প্রতীতি হয়, যেন প্রকৃতি আপনি আসিয়া আসন্নপ্রসবিনী বঙ্গভূমির দুঃখে করুণকণ্ঠে বিলাপ করিতেছেন, আর সমস্ত সংসার ভয়, বিস্ময় এবং শোকভরে স্তম্ভিত হইয়া অনন্য-মনে ও অনন্যকর্ণে সেই বিলাপ শ্রবণ করিতেছে।

নিস্তব্ধকারী অন্ধকারের বর্ণনায় এই অংশে একটি আশ্চর্য্য পংক্তি কবির লেখনী হইতে হঠাৎ স্খলিত হইয়াছে,—

"তিমিরে অনন্তকায় শূন্য ব্যাপ্ত"

জগৎশেঠের প্রতিজ্ঞাও ভীষণের ন্যায়; শুনিলেই হৃদয় চমকিয়া উঠে এবং যেন এতক্ষণ পরে পুরুষ-সম্মুখে আসিয়াছি এইরূপ প্রতীতি জন্মে ;—

সম্ভব, হইবে মুক্ত ভারত চত্বর
অসম্ভব, যাবে মুণ্ড দেহের খসিয়া।"
* * * *
"সাধিতে প্রতিজ্ঞা যদি হয় প্রয়োজন,
উপাড়িব একা নভো-নক্ষত্র-মণ্ডল,
সুমেরু সিন্ধুর জলে দিব বিসর্জন,
লইব ইন্দ্রের বজ্র কাড়ি বজ্রধরে।
যদি পাপিষ্ঠের থাকে সহস্র পরাণ;
সহস্র হলেও তবু নাহি পরিত্রাণ।"

[illegible] মহারাজ রাজবল্লভের কথায় বিষম বিলাপ আছে, তেজস্বিতা নাই, কথা যেন ফুটে ফুটে হইয়াও মুখাগ্রভাগে কণ্ঠলগ্ন হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ যে অস্ফুট কথা; তাহাতেও—

"* * * উঠিল কাঁপিয়া
ধুক ধুক করি বিশ্বাসঘাতক হিয়া।"

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রকৃত ধার্ম্মিক, পাপদ্বেষী পবিত্র ও পরদুঃখকাতর। তিনি যখন আলিবর্দির অকলঙ্ক চিত্রপটের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সিরাজের কলঙ্ক-পরিপূর্ণ কুৎসিত প্রতিমূর্তি নিরীক্ষণ করেন তখন ঘৃণায় তাঁহার আত্মা অর্দ্ধলিপ্ত হয়। কিন্তু তিনি জগৎশেঠের মত সাহসী নহেন, রাজবল্লভের মত কূটভাষীও নহেন। তাঁহার পরামর্শ স্পষ্ট কথা। চক্রান্তিদিগের মধ্যে তাঁহারই চক্রান্ত নাই, কারণ তিনি মীমাংসা-কারী। আমরা প্রস্তাব-বাহুল্য ভয়ে সাধী [illegible] কথা হইতে পাঠকের জন্য কিছুই উদ্ধৃত করিতে না পারিয়া নিতান্ত দুঃখিত রহিলাম। কিন্তু ইহা বলিতে পারি যে, যিনিই সেই অসমসাহসিক বিষ কি বিষাক্ত অমৃত পান করিবেন তিনিই পদে পদে কবিবর নবীনচন্দ্রকে হৃদয় খুলিয়া সাধুবাদ দিবেন। যদি কোন ব্যক্তি সুগভীর নিদ্রার মধ্যে সহসা কোন অশ্রুতপূর্ব্ব অদ্ভুত শব্দ শ্রবণ করিয়া জাগিয়া উঠেন, তাহা হইলে তাঁহার চিত্ত যেরূপ নানাবিধ অচিন্তনীয় ভাবে তৎক্ষণাৎ আলোড়িত হয় এই কাব্যের প্রথম সর্গ হইতে দ্বিতীয় সর্গে অবতীর্ণ হওয়া মাত্র পাঠকের অসাবধান চিত্তও সহসা সেইরূপ আলোড়িত হইয়া উঠে।

প্রথম সর্গের সমস্ত কথাই পূর্ব্বে এক একবার নিশার দুঃস্বপ্নের মত অলীক বোধ হয়, অথবা [illegible] অকস্মাৎ মেঘ-গর্জন শ্রবণ করিলে কিংবা অকস্মাৎ দামিনীর ক্ষণস্থায়ী চমক দেখিলে, তাহা যেমন শ্রুতি কি দৃষ্টির বিভ্রম বলিয়া বিশ্বাস জন্মে, সেইরূপ যাহা কিছু শুনিয়াছি এবং যাহা কিছু দেখিয়াছি সমস্তই যেন মনের ভ্রান্তি, এইরূপ বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু দ্বিতীয় সর্গে প্রবেশ করিলেই সেই প্রীতিকর ভ্রম ও প্রিয় বিশ্বাস তিরোহিত হইয়া যায়, এবং যাহা দেখি তাই

সাবধানতা, এবং পদবিন্যাসেও সেই সাবধানতা। যেন প্রত্যেক শব্দ শত পরীক্ষার পর গৃহীত হইয়াছে, এবং প্রত্যেক ভাব শতবার শোধিত হইয়া কবির হৃদয় হইতে বাহিরে আসিয়াছে। বায়রণের লেখায় এই সাবধানতার চিহ্নমাত্রও বিলোকিত হয় না। উহা নিশীথে বংশীধ্বনির মত, অথবা বাত্যাবিক্ষোভিত স্রোতস্বিনীর বিলাপ-ধ্বনির মত, শুনিবামাত্রই চিত্ত পাগলের ন্যায় নাচিয়া উঠে। কি শুনিলাম, কে শুনাইল, ইহা বিচার করিবার অবসর থাকে না, প্রাণ আকুল হইয়া পড়িতেছে, কেবল এই মাত্র ধারণা থাকে; কখনও বিরক্তি বোধ হয়, কখনও বা মনে প্রীতির সঞ্চার হয়, কখনও আত্মা অশান্তিতে ছটফট করে, কখনও বা শান্তির ক্ষণস্থায়ী সুখ-স্পর্শ ক্ষণকালের জন্য সুখের আস্বাদ পায়। কিন্তু সেই অনির্ব্বচনীয় আকুলিত ভাব কিছুতেই প্রশমিত হয় না। উহা ক্রমশঃই পরিবর্দ্ধিত হইয়া শেষে সমস্ত হৃদয়কে উচ্ছ্বসিত করিয়া তুলে। উল্লিখিত কবিদ্বয়ে শক্তিবিষয়ে এত তারতম্য কিসে? এই প্রশ্নে সকলেই এই উত্তর দিবে যে, একজন বুদ্ধির কবি, আর এক জন হৃদয়ের কবি। পিঞ্জর-বদ্ধ শুক এবং প্রমত্ত বন-বিহঙ্গ। যিনি বুদ্ধির কবি, তিনি 'সোহহং' এবং 'তত্ত্বমসি' দিয়া বুদ্ধিমানদিগকে প্রবোধ দেন, কিন্তু তাঁহার সেই সুমার্জ্জিত ও সুসংস্কৃত কথা শ্রুত হইয়াও অশ্রুতবৎ থাকে। যিনি হৃদয়ের কবি, তিনি জ্ঞানমার্গে পদার্পণ না করিয়া, সরল সুরে কি মানব দুঃখ ক্রন্দনের গীত গাইয়া গেলেন, কিন্তু সেই কথা সর্ব্বত্র বিস্তার হইলেও হৃদয়ে হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হয় এবং এক তানে শত তান সৃজন করে।

পলাশির যুদ্ধ এই শেষোক্ত শ্রেণীর কাব্য। ইহা হৃদয়-রূপ জীবন্ত প্রস্রবণ হইতে নিঃসৃত হইয়াছে, এবং ইহার প্রত্যেক কবিতা, ও প্রতি পংক্তিতেই সজীবতার পরিচয় দিতেছে। আমরা ইহাকে বায়রণের কোন কাব্যের সহিত তুলনা করিতে ইচ্ছা করি না, কারণ সে তুলনায় ইহা অবশ্যই হীনপ্রভ প্রতীয়মান হইবে।

কিন্তু বায়রণের কবিতায় যে দৃক্‌পাতশূন্য স্বাধীনতার এবং যে অদ্ভুত মাধুর্য্য আছে, ইহাতেও অনেক স্থলেই তাহার অনুরূপ সদৃশ পরিলক্ষিত হয়। কোন কৃত্রিম কবি কদাপি 'পলাশির যুদ্ধ' প্রণয়নে সমর্থ হইত না। ইহার লেখকের হৃদয়ে চির বসন্ত, চির-যৌবন। তাঁহাতে বার্দ্ধক্যের জড়ত্ব নাই, চিন্তামাত্র-পরায়ণের সাবধানতা নাই, এবং ভাবিয়া ভাবিয়া পদবিন্যাসেরও অবকাশ নাই। কিন্তু লেখা তথাপি হৃদয়-স্পর্শিনী। আমরা নিম্নে তৃতীয় সর্গের আরম্ভ হইতে কতিপয় পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম। নবীনচন্দ্রকে কেন অসাবধান কবি এবং অসাবধান বলিয়াও কেন অকৃত্রিম কবি বলি, ইহা হইতেই তাহা সংক্ষেপে বুঝাইয়া দিতে পারিব।

"এই কি পলাশিক্ষেত্র? এই সে প্রাঙ্গণ?
যেইখানে কি বলিব?—বলিব কেমনে?
স্মরিলে সে সব কথা বাঙ্গালীর মন
ডুবে শোক-জলে, অশ্রু বহে দু'নয়নে;—

ভেদ করিয়া সিরাজের শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়াছে এবং সেই পুনর্নিদ্রিত অর্দ্ধমৃত, হতভাগ্য যুবার শিরশ্ছেদের জন্য করে খড়্গ তুলিয়াছে, তখন দয়ার্দ্রচিত্ত কবি উপদেশ করিতেছেন—

"রে নিষ্ঠুর অনুচর! কৃতঘ্ন হৃদয়ে
কি কাজে উদ্যত আজি নাহি কিরে জ্ঞান?
কেমনে রে দুরাচার! কেমনে নির্ভয়ে
নাশিতে উদ্যত আজি নবাবের প্রাণ?"

* * * *

"ডুবিবে, ডুবিবে, পাপী, আপনি আপন;
পুরস্কৃত পিশাচত্ব ত্যজিয়া শিবির
পড়ে যবে রণাঙ্গনে, কি কাজ তখন
আঘাত করিয়া আর শবের উপর?"

'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যের ভাষা কিরূপ হৃদয়হারিণী হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। বস্তুতঃ এরূপ সরস, সরল ও সুখপাঠ্য কবিতা এদেশীয়দের অধিক দেখি নাই। আমাদিগের বিবেচনায় ইংরেজি ভাষার সহিত ওয়াল্টার স্কটের "লেডি অব দি লেক" নামক কাব্যের যে সম্বন্ধ বাঙ্গালা ভাষার সহিত 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যের সেই সম্বন্ধ থাকিবে। তবে কবিবর নবীনচন্দ্র ইংরেজী ভাষার প্রাঞ্জলতা সহজে বাঙ্গালা ভাষায় আনিতে গিয়া স্বজাতির যেমন কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন, মধ্যে মধ্যে তেমনি দুই একটি অসহ্য অপরাধও করিয়াছেন। যথা,—'পাড়া-পড়শিবাসী-গ্রাম'— 'চিত হয়ে পড়ে লও দাঁতে তৃণ' ইত্যাদি। শ্রুতিকটু-দোষ দূষিত এইরূপ এক একটি পংক্তি, দুগ্ধ-কুম্ভে গোময়ের পঙ্কপাতের ন্যায়, এক একটি মনোহর কবিতাকে একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু কবি কিছু কিছু পরেই আবার এমন এক একটি সুধানিস্যন্দিনী কবিতা বড় গম্ভীর কণ্ঠে তুলিয়া দিয়াছেন যে, দেখিয়া তাঁহার সকল অপরাধ ভুলিয়া গিয়াছি। নিম্নে ইহার উদাহরণ দেখ —

"লোহিতে একটি রবি পশ্চিম গগনে,
ভাসিছে সহস্র রবি জাহ্নবী-জীবনে।"

* * * *

"ফিরে কেরোলাইনা আমার!
যেই পূত অশ্রুরাশি আজি অভাগার
ঝরিতেছে নিরবধি,
জমাট না হত যদি
গাঁথিতাম সেই হার তব উপহার—
কি ছার ইহার কাছে গোলকুণ্ডাহার!"

পলাশির যুদ্ধে এরূপ কবিতা এবং এইরূপ ললিত পদাবলীর অভাব নাই। যেন লেখনী অবিরত মুক্তাফল প্রসব করিয়াছে। যখন বাল্মীকি কবিতা লিখিয়াছিলেন,

তখন তাঁহাকে পরকীয় পদানুসরণ করিতে হয় নাই; যখন হোমর বীণাযন্ত্রে মত্ত হইয়া স্বপ্নগীতস্বরে সেই এক গীত গাইয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে আর কাহারও কণ্ঠানুকরণ করিতে হয় নাই। কিন্তু নূতন কবিদিগের সে সৌভাগ্য সম্ভবে না। তাঁহারা প্রকৃতির নিকট যত না শিখিন, তাঁহাদের পূর্ববর্তী কবি-সম্প্রদায়ের নিকট তাহা অপেক্ষা অধিক শিখেন। সুতরাং তাঁহারা অনুকারী। নবীনবাবুও অনুকরণের অপবাদ হইতে নির্মুক্ত নহেন। সিরাজদ্দৌলার নিকট স্বপ্ন-দর্শনে সেক্সপীয়রের তৃতীয় রিচার্ড নামক নাটকের স্বপ্ন-দর্শন স্পষ্ট প্রতিভাত রহিয়াছে, চাইল্ড হেরল্ডের তৃতীয় কাণ্ডের কতিপয় কবিতায় নৃত্য-গীতের মধ্যে যুদ্ধ বর্ণন আছে, পলাশির যুদ্ধে কোন কোন কবিতায় তাহার ছায়া পড়িয়াছে, এবং মোহন ও ক্লাইভে আরও অনেক স্থলে অনুকরণ করা হইয়াছে। ইহাকে আমরা দোষ বলি না। কারণ এ দোষে সকলেই সমান দোষী। দোষ অথবা অপূর্ণতার কথা বলিতে হইলে পলাশির যুদ্ধের বিশেষ দোষ কিংবা অপূর্ণতা এই যে, ইহাতে মনুষ্য-চরিত্রের বিকাশ চিত্র নাই। ইহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে মনে কতকগুলি অত্যুৎকৃষ্ট ভাব এবং অত্যুৎকৃষ্ট বর্ণনা চির-নিবদ্ধ থাকে, কিন্তু উৎকৃষ্ট কি অপকৃষ্ট কোন একটি চরিত্র তেমন চিত্রিত থাকে না।

নবীনবাবু প্রতিভা-সম্পন্ন কবি। আমরা ভরসা করি তিনি ভবিষ্যতে আমাদিগের এই ক্ষোভ দূর করিবেন। বঙ্গভাষা অসম্পূর্ণ হইলেও বঙ্গদেশের প্রাণ-স্বরূপ। সেই বঙ্গভাষা যাঁহা কর্তৃক অলঙ্কৃত হইল, তাঁহাকে অবশ্য আমরা ভালবাসিব। এবং তাঁহাকে ভালবাসিলে তাঁহার নিকটে কত না আশা করিব।

[জ্ঞানাঙ্কুর—১২৮৩]

প্রাচীন কবি ও আধুনিক কবি

তাড়িত-সংযোগে মৃত ব্যক্তিও যেমন দৃশ্যতঃ চেতনা প্রাপ্ত হয়, আমাদের আধুনিক কবিতাসকলও সেইরূপ দৃশ্যতঃ কবিতা বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু তাহা হইতে যদি বিদেশীয় কবিতার তাড়িত-প্রভাব নির্বাসিত করা যায় ত দেখিতে পাইবে যে, সে-সকল কবিতা প্রকৃত প্রস্তাবে হীনশক্তি নির্জীব শবদেহ মাত্র। প্রকৃত হৃদয়-উচ্ছ্বাসের যে একটি দুর্দমনীয় উন্মাদ শক্তি আছে, তাহা আধুনিক বঙ্গীয় কবিতাতে প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হয় না। আর, তাহা কেমন করিয়াই বা হইবে? আধুনিক বঙ্গীয় কবির অন্তর-দৃষ্টি যে একেবারেই নাই, তাহা শত-সহস্র উদাহরণ-দ্বারা প্রমাণ করা যাইতে পারে।

ভালবাসার অনন্ত অভিমান আধুনিক কবিতায় কোথায়?—সে অভিমান ইংরাজি কবিতাতে নাই, সে অভিমান ইংরাজি প্রকৃতিতে নাই। সেই জন্যই তাহা আধুনিক বঙ্গীয় কবিতাতেও নাই। অভিমানে যে-একটি পরাধীনতা—যে-একটি প্রাণ ঢালা নির্ভরের ভাব আছে তাহার সহিত ইংরাজি হৃদয়ের স্বাভাবিক স্বাতন্ত্র্য ভাবের কখনই ঐক্য হইতে পারে না। বঙ্গীয় হৃদয় ভালবাসার সমুদ্রে প্রাণ-মন-হৃদয়—সর্ব্বস্ব একেবারে বিসর্জন দেয় কিন্তু ইংরাজি-হৃদয় ভালবাসার সমুদ্রে আত্ম-বিসর্জন করিয়াও নিজের নিজত্ব কখনই ভুলিতে পারে না। ভালবাসার স্থলে বঙ্গীয় হৃদয় এই বলিবে যে, 'হে হৃদয়সর্ব্বস্ব! আমি তোমারই—তোমাতেই আমার জীবন, তোমাতেই আমার মৃত্যু—তোমা ছাড়া আমার অস্তিত্বই নাই।'—কিন্তু ইংরাজি হৃদয় বলিবে যে, "হে হৃদয়সর্ব্বস্ব! তোমাকে আমি প্রাণের সহিত ভালবাসি, তোমাকে না হইলে আমি সুখী হইতে পারি না।' নবীন প্রেমেও ইংরাজি হৃদয় কখনই নিজের স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীন নিজত্ব একেবারে বিসর্জন করে না। প্রেমের অপমানে প্রেমের বিরহে ক্ষুব্ধচিত্তা একটি ইংরাজি হৃদয় উন্মত্ত হইয়াই বলিবে যে,

> "I wish you were dead, my dear,
> I would give you, had I to give
> Some death too bitter to fear;
> It is better to die than live.
> I wish you were stricken of thunder,
> And burnt with a bright flame through
> Consumed and cloven in sunder,
> I dead at your feet like you."

ইহাতে অনন্ত ভালবাসার কিছু অভাব নাই,—নহিলে শেষে পদতলে মরিতে চাহিবে কেন?—কিন্তু সে অনন্ত ভালবাসা সত্ত্বেও ইংরাজি হৃদয় নিজের নিজত্ব, নিজের স্বাতন্ত্র্য ভুলিতে পারে নাই। এরূপ স্থলে একটি অবিকৃত বঙ্গীয় হৃদয় এই বলিয়া কাঁদিবে,—

> 'অবশেষে বলি প্রাণনাথ! শুন এ পদে আবেদন
> কও কথা একবার কও কথা তোমায় ও নিবেদন
> প্রণয় ভেঙেছে ভেঙেছে তাহে ক্ষতি কি?
> এমন ত প্রেম ভাঙাভাঙি অনেকের দেখি।
> আমার কপালে নাই সুখ—
> বিধাতা হ'ল বিমুখ,
> আমি সাগর সেঁচেও মণি মাণিক পেলাম না।
> দাঁড়াও—দাঁড়াও প্রাণনাথ! বদন ঢেকে যেও না।

তোমায় ভালবাসি—তাই
তোমার সুখে দেখিতে চাই,
কিছু থাক্ থাক্ তোলে তোরে বাড়ব না—
তবু দেখা দিলে তোমার মান যাবে না।
তুমি যাতে ভাল থাক, সেই ভাল,
গেল গেল কিসে প্রাণ আমারই গেল।
তোমারই পথের প্রতি নির্ভর,
আমি ত ভাবি না পর—
তুমি চক্ষু মুদে আমার দুঃখ দিও না।"

সর্ব্বাঙ্গীণ প্রেমের অপেক্ষা এত একরূপ স্বর্গীয় উদারত্ব—প্রেমপূর্ণ ভালবাসা-সত্ত্বেও একরূপ সর্ব্বত্যাগী মনঃপ্রাণের বৈরাগ্য—বৈরাগ্যে একরূপ অনুরাগ—অনুরাগে একরূপ বৈরাগ্য। এমন এক প্রকারের ভাব লক্ষিত হয়। ইংরাজি সাহিত্যে ত কখনই দেখিতে পাইবেন না। একরূপ প্রেমের অপমান-স্থলে একটি ইংরাজি হৃদয় প্রকৃত কবি Tennyson-এর মুখ দিয়া এই বলিতেছে—

"Better thou and I were lying, hidden
from the heart's disgrace,
Rolled in one another's arms, and
silent in a last embrace.

* * * *

Am I mad, that I should cherish that
which bears but bitter fruit,
I will pluck it from my bosom, though
my heart be at the root!"

ইহাই প্রকৃত ইংরাজি হৃদয়—ইহাই প্রকৃত ইংরাজি প্রতিভা। ইহার যে একটা বিশেষ সৌন্দর্য্য আছে, তাহা আমরা অস্বীকার করি না, কিন্তু ইহাও আমরা স্বীকার করি না যে উহা আমাদের দেশীয় হৃদয়ের উচ্ছ্বাস হইতে পারে। ইংরেজের lily পুষ্প ইংরাজেরই পুষ্প; তাহা প্রচণ্ড উত্তর-বাতাসেও অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে, কিন্তু বঙ্গীয় হৃদয় যে নিতান্তই কামিনীকুসুম-সদৃশ, একটু দক্ষিণ-বাতাসেও তাহার পাপ্‌ড়ী খসিয়া পড়ে—কি করিব? প্রকৃত কবি ত কামিনীকুসুমকে কামিনীকুসুম রূপেই বর্ণনা করিবেন। কিন্তু ও রূপ বর্ণনার কথা দূরে থাক, আজকাল দু'একখানি মাত্র বাঙ্গালা কাব্যেতে অভিমানের কবিতা ত কাব্যেও দেখিতে পাই না। কিন্তু যে-কেহ বঙ্গীয় হৃদয় সামান্য যত্নের সহিতও দেখিয়াছেন, তিনিই বলিবেন যে, তাহা বীররসে তেজস্বী নহে, মহান্ ভাবে প্রশস্ত নহে—তাহা করুণরসে মগ্ন, তাহা ভালবাসাতেই উথলিত এবং অভিমানই সেই ভালবাসার সর্ব্বোত্তম-স্তর। কি বাল্যকালে পিতামাতা-সম্পর্কে, কি যৌবনে প্রণয়-সম্পর্কে, কি প্রৌঢ় বা বার্দ্ধক্যে দেবতা-সম্পর্কে—আমাদের অভিমানের ভাবই বিশেষ প্রবল, অভিমানই আমাদের হৃদয়ের একটি বিশেষত্ব।

অভিমান বশে ঈষৎ ভ্রুকুটি করিয়া এইরূপ চাপা-কান্না কাঁদিতে গিয়াও দিবালোকে বিদ্যুতের ন্যায় হাসি হাসিয়া বলিতে থাকে —

'নূতন বালা, তোমার ভালা নয়নের ভাষা,
একি ফুলে ভুল,
যেন আঁখির শূল,
কেন তুমি আদর কর ?
কোথায় শিখলে নাথ! এমন মন-বাণী ?
পুরাতন নহি আর, এ কি ভাব, তোমার আর সখা!
ত্যাগো মনের বাড়াবে নবীন—
কেন কর পূজা মনের অপমান ?
ছিঃ ছিঃ নাথ! বলো না 'প্রাণ,'
উঠে হাসবে লোকে, আবার পাবে,
শেষে কি হবে অপমান!
যাকে প্রাণ দিলেম, সেই এখন প্রাণ!
আমায় বোলো 'প্রাণ'—প্রাণ জুড়াবে না,
শুনলে যে আমার, পাবে নাথ, প্রাণে বাতনা।
তারপর কোথে অন্তরের মধুর, আর যত মধুর মিশেছে মান।
কথায় হয় নব ভাব, তাতে 'প্রাণ' বলো যে হবে তার মর্ম,
আমার কেন বোলো 'প্রাণ' বাড়াও দ্বিগুণ দুখ ?
ভেবেছিলাম প্রাণনাথ! গিয়েছে সে দিন,
এখন শুনায় 'প্রাণ' কেমন কথায় প্রাণ,' কিন্তু মর্মে ফলহীন।
তোমার বিচ্ছেদ যে আমার বলায় ভাব,
করব মনোমত কি তোকে বল হে তারাবণ
চোখের দেখা বুকের আলাপন,
এখন তাই সব আজ জ্ঞান।"

এই প্রেমের কথা ছাড়িয়া দিয়া ইষ্ট-দেবতার সম্পর্কে যে এক প্রকার অভিমান আছে, তাহা বঙ্গীয় হৃদয় ব্যতীত আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। ইষ্ট-দেবতা বা ঈশ্বরের উপরে আবার অভিমান—এ কথা শুনিলেই অনেকে চমকিয়া উঠিবেন, হয়ত অনেকে তাহা "পাষণ্ড-নাস্তিকের" প্রলাপ মনে করিয়া শুনিতে চাহিবেন না। যে দেশে বা যে ধর্ম্মে ইষ্ট-দেবতা বা ঈশ্বরকে "মা" বলিয়া ডাকিতে জানে না, সে দেশের বা সে ধর্ম্মের লোক ও একরূপ অভিমানের মর্ম্মই বুঝিতে পারিবে না, কারণ, "পিতা" বলিতেই যে ভাবটি আমাদের মনে আসে, তাহার সহিত ভক্তির সম্পর্কই অধিক। কিন্তু বাঙ্গালীর "মা"—ঐ একটি অক্ষরের শব্দের ভিতরে কি অপার, অগাধ, অতলস্পর্শ স্নেহের প্রকৃত মহাকাব্য অবরুদ্ধ রহিয়াছে। তিনি আমাদের ভক্তির বিষয়, কি ভালবাসার বিষয়, ভয়ের বিষয়, কি আবদারের বিষয়,

তাহা আমরা জানি না, জানিতে চাহিও না,—তিনি আমাদের মা, তাঁহার স্নেহোমল পক্ষচ্ছায়ায় আমরা দিন-দিন প্রতিপালিত দিন দিন বর্দ্ধিত—দিন দিন উল্লসিত। তিনি ভিন্ন ব্যক্তি হইলেও আমি তাঁহার দেহের অংশীভূত, তাঁহার হৃৎস্পন্দন জানিব, তাঁহার প্রাণের প্রাণ। সুখ হইলে উল্লাসে তাঁহার বক্ষে গিয়া পড়িব, দুঃখেতে তাঁহারই বক্ষে মুখ লুকাইয়া কাঁদিব, অনুরাগে তাঁহার কোলে মাথা রাখিব—আবার রাগে তাঁহারই উপর উপদ্রব করিব। বাল্যকালে যখন আমরা মায়ের উপর অভিমান করিয়া ভাত খাইতে চাহিতাম না তখন ভাত না খাইলে যে আমাদের কষ্ট হইবে, তাহা ত ভাবিতাম না কিন্তু আমি ভাত খাইলাম না বলিয়া মায়ের মনে যে আঘাত লাগিবে, সেই আঘাতের উপর লক্ষ্য করিয়াই ত আমরা সুখে দুঃখে থাকিতে পারিতাম—যেন মনে মনে বুঝিতাম যে, আমার ক্ষুধার যাতনার অপেক্ষাও মায়ের মর্ম্ম যাতনা অধিকতর তীব্র হইবে এবং সেই জ্ঞানেই—সেই অহঙ্কারেই আমরা ভাত ছাড়িয়া উঠিয়া যাইতাম। আজ যদি আমার ইষ্ট-দেবতাকে সেই আমার মা-ভাবে না দেখিতে পারিলাম ত আমার পক্ষে দেবতা থাকা আর না থাকা—আমার ভগবান্ পক্ষে, সাহেবের পক্ষে, উভয়ের পক্ষে প্রায়ই সমান হইয়া পড়ে। যাঁহারা জগদীশ্বরকে প্রকৃত মা বলিয়া জানেন, যাঁহারা সংসারের অত্যাচারে, বিপদের ঘূর্ণিবাত্যায়, দুঃখের মর্ম্মবেদনায় অস্থির হইয়া ইহলোকের মা অপেক্ষাও গাঢ়তর ঈশ্বরকে মা বলিয়া ডাকিয়া উঠেন, তাঁহাদের মনের সাহস ও ভরসা, উল্লাস ও শান্তি অনির্ব্বচনীয়। তবে মায়ের উপর অভিমান হইবে কেন?—তাহারও আবার বিলক্ষণ কারণ আছে।

বিশ্বাস দুই প্রকার—একটি মনের বিশ্বাস, আর একটি মর্ম্মের বিশ্বাস। মা সম্পর্কে অনেক সময়ে আমাদের মর্ম্মের বিশ্বাস ঠিক থাকিলেও কোন বিশেষ অবস্থাগত ব্যবহারে মনের বিশ্বাস বিচঞ্চল হইয়া পড়ে। যখন নানা প্রকার জ্বালা যন্ত্রণার মধ্যে পড়িয়া আমরা আপনাদিগকে নিতান্ত নিঃসহায় মনে করি, তখন এই ভাবি যে, আমার অমন "মা" থাকিতে কেনই-বা যন্ত্রণা পাইব,—অথচ যন্ত্রণা পাইতেছি কাল্পনিক যন্ত্রণা নয়,—প্রকৃত কঠোর যন্ত্রণায় ভুগিতেছি, তখন আমার ইষ্ট-দেবতার স্নেহের উপর কতকটা মনের অবিশ্বাস আসিয়া পড়ে, কিন্তু মর্ম্মের বিশ্বাস একেবারে যায় না, এবং যায় না বলিয়াই আমরা নিতান্ত দুর্ব্বল, নিঃসহায়, আশ্রয়হীন, শিশুর মত এই বলিয়া দারুণ অভিমান-ভরে কাঁদিতে থাকি,—

"'মা'—'মা'—ব'লে আর ডাক্‌ব না।
ও মা, দিয়েছ, দিতেছ কতই যন্ত্রণা।
বারে বারে ডাকি 'মা'—'মা'—বলিয়ে
মা বুঝি আছ গো অচেতনা হ'য়ে?
মাতা বর্ত্তমানে এ দুঃখ সন্তানের,
মা বেঁচে, তার কি ফল বল না?

তখন ভক্তবৎসল মহাদেব সতী পুনর্দর্শন-বাসনা নারদের মনস্তুষ্টি সম্পাদনার্থ শক্তির আচ্ছাদন অপসারিত করিলেন।

অমনি

"মহাদেব মহাবেশ অনকায়ে ধরিল।
তীব্রবল জ্যোতঃপুঞ্জ প্রকাশ করিল॥
বিসারিত ব্যাপিল প্রকৃতি ঢেকিল।
ঘোর ঘটা ভীমছটা আকাশেতে উঠিল॥"

দেখিতে দেখিতে বিশ্বের যাবতীয় বস্তু একে একে মহাদেবের শরীরে প্রবেশ করিল। দেখিতে দেখিতে গিরি, নদী, বৃক্ষ, লতা সমস্তই একে একে অদৃশ্য হইল। সূর্য, নক্ষত্র প্রভৃতি সমস্তই বিলোপিত হইল। বিশ্বের সমস্ত বস্তু এইরূপে শিব-দেহে প্রবিষ্ট হইলে, মহাদেব নারদকে সঙ্গে এক মহাকাশ সৃজন করিলেন। এই নীরব মহাকাশের উপর দেখিতে দেখিতে এক বাণিচক্র স্থাপিত হইল। দেখিতে দেখিতে ঐ বাণিচক্র দশ কক্ষে বিভক্ত হইল। এবং তখন দেখা গেল যে, ঐ বাণিচক্রের কক্ষে কক্ষে সতী ভিন্ন ভিন্ন মূর্তিতে বিরাজ করিতেছেন।

নারদ দূর হইতে সতীর দশমূর্তি দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু দূর হইতে দেখাতে তাঁহার তৃপ্তিলাভ হইল না। তিনি বলিলেন — "দেব! যদি অনুমতি হয়, তাহা হইলে, নিকটে গিয়া এই দশ মূর্তি নিরীক্ষণ করি।" নারদ বলিলেন —

"কুতূহলে বিকসিত পরাণ উতলা।
দেখিব নিকটে গিয়া অনাদ্যা অবলা॥"

তখন ভক্তবৎসল মহাদেব কৈলাস পর্বত সহিত নারদকে পূর্বোক্ত বাণিচক্রের কেন্দ্রস্থলে উপস্থিত করাইলেন। বালকস্বভাব নারদ ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া বলিলেন,— 'আমি আরও নিকটে যাইয়া দেখিব।' মহাদেব এবার নারদের কুতূহল চরিতার্থ করিলেন না। তিনি বলিলেন — 'আমি তোমাকে দিব্য চক্ষু দিতেছি, তুমি এখান হইতেই সমস্ত দেখিতে পাইবে।' তখন নারদ বাণিচক্রের কেন্দ্রস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া দশ কক্ষে দশ মহাবিদ্যার লীলা প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন। কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ধূমাবতী, বগলা, ছিন্নমস্তা, মাতঙ্গী, ভৈরবী, কমলা প্রভৃতি দশ প্রকার দশ মহাবিদ্যার দশ লীলা দেখিয়া নারদ আনন্দে বিভোর হইয়া পুনরায় বীণাবাদন আরম্ভ করিলেন। মহাদেবও সেই গীত শ্রবণ করিয়া আনন্দে বিমোহিত হইলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার শরীর পুনরপি বৃহদাকার ধারণ করিল। দেখিতে দেখিতে তাঁহার শরীর হইতে বিশ্বের যাবতীয় বস্তু পুনরায় বিশ্বে প্রত্যাবর্তন করিল। দেখিতে দেখিতে বিশ্বচক্রস্থ দেবীর দশটি মূর্তি একত্র হইয়া গৌরী-রূপ ধারণ করিল। তখন হরগৌরী একাত্ম হইয়া কৈলাসে প্রত্যাবর্তন করতঃ পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন।—৫৪ পৃষ্ঠার একখানি ক্ষুদ্র পুস্তকে এতগুলি বর্ণনাবহুল ঘটনার সমাবেশ হেমবাবুর অসাধারণ লিপিকুশলতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

প্রকৃতি এক একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে আর কাঁদিতে কাঁদিতে জিজ্ঞাসা করে,—'অশ্রু ঝরে কেন?'' সমুদ্রগামী সমুদ্রজলের চারিদিকে লহরে লহরে নিজ নিপত্তি দেখিয়া হতাশ্বাস হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে জিজ্ঞাসা করে—'অশ্রু ঝরে কেন?' ধার্ম্মিক সহস্র সহস্র চেষ্টাতেও ইন্দ্রিয় দমন করিতে না পারিয়া ঊর্দ্ধে হস্তোত্তোলন করতঃ কাঁদিয়া কাঁদিয়া জিজ্ঞাসা করে,—'অশ্রু ঝরে কেন?' বিধবা নারী প্রাণপ্রিয় পুত্রের মৃত্যুতে অধীরা হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে জিজ্ঞাসা করে,—'অশ্রু ঝরে কেন?' আর যিনি জ্ঞানী, তিনিও সন্দেহ দ্বন্দ্বে বিদলিত-চিত্ত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে জিজ্ঞাসা করেন—'অশ্রু ঝরে কেন?''

আমরা সকলে যে শুদ্ধ আপনাকে আপনি এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাহা নহে। আমরা সকলেই এই প্রশ্নের একরূপ না একরূপ উত্তরও দিতেছি। কেহ বলিতেছি—'অশ্রু সংসার নিয়ম।' কেহ বলিতেছি—''অশ্রু ঈশ্বর-লীলা।'' কেহ বলিতেছি,—''অশ্রু পূর্ব্বজন্মের বা আত্মমানসের দুষ্কর্ম্মের ফল।'' কেহ বলিতেছি,—'অশ্রু দুর্ব্বলতা হইতে উৎপন্ন হয়।' দেখা যাউক, 'দশমহাবিদ্যা' এ প্রশ্নের কি উত্তর দেয়।

কবি বলিতেছেন,—

না হও নিরাশ, অবে উৎকর্ষ,
দুঃখের কারণ নাশবে।
দুঃখাদি কারণ, নহে চিরলীলা
বোঝন যাতে যে মাপবে।

* * * *

পূর্ণ সুখ তৈর জগৎ উত্থান
দেখিতে পাইবে পশ্চাতে॥
আকাঙ্ক্ষা সকল যাবে অবসরে,
হবে ক্ষীণ দুঃখ কল্পনা।
শোক দুঃখ তাপ সকলি দহন
প্রবল নির্ব্বাণ যাতনা॥
পর পর পর এ সব জগতে
জীবের উন্নতি কেবলি
অনন্ত অসীম জ্ঞান অতি আশা
আনন্দ সৌন্দর্য্যতরঙ্গী।'

অর্থাৎ,—''এই দুঃখরাশি যেমন সমুদ্রের মত চারিদিকে বিস্তারিত রহিয়াছে, দেখিতেছ এ অশ্রু চিরদিন থাকিবে না। এক একটি করিয়া বিবর্ত্তন (Evolution) স্বাভাবিক নিয়মে এই অশ্রুমালার নিরাকরণ হইতে থাকিবে। শোক দুঃখ, তাপ প্রভৃতি নানাবিধ মনঃপীড়া এক একটি করিয়া সংসার হইতে বিদায়

করিত। এক্ষণে তাহারা জ্ঞানরূপ খড়্গ করতলে লইয়া স্বীয় স্বীয় আবাসভূমি প্রস্তুত করিতেছে।

সংসার-পটের তৃতীয় অঙ্কে দেবী মনুষ্যকে সভ্যতার পথে আরও অগ্রসর করাইয়াছেন। সেখানে দেবী নর-নারীর মধ্যে দাম্পত্যপ্রেম সঞ্চারিত করিতেছেন। অসভ্য মনুষ্যের মধ্যে পরিণয়-প্রথা প্রথম প্রবর্ত্তিত হইতেছে।

কবি দেখাইতেছেন, সংসার-পটের চতুর্থ অঙ্কে দেবীর আর সে ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি নাই। তিনি সেখানে মনুষ্যের মনে অপত্যস্নেহ সঞ্চারিত করিতেছেন। যতদিন পরিণয়-প্রথা প্রচলিত ছিল না, ততদিন অপত্যস্নেহের প্রাবল্য অনুভূত হইত না। কিন্তু এখন নর-নারী সন্তান-সন্ততির প্রতি প্রচুর স্নেহ প্রকাশ করিতেছে।

সংসার-পটের পঞ্চম অঙ্কে মনুষ্যের মনে প্রথম ভক্তি, কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি উদিত হইতেছে। সংসার-পটের ষষ্ঠ অঙ্কে মনুষ্য মনুষ্যকে প্রীতি করিতে শিখিতেছে। অর্থাৎ পূর্ব্ব অঙ্কে মনুষ্য প্রত্যুপকার স্বরূপ পিতামাতাকে ভক্তি করিতে শিখিয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে মনুষ্য মনুষ্যমাত্রকেই প্রীতি করিতে শিখিতেছে। সংসার-পটের সপ্তম অঙ্কে মনুষ্য পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিয়া পরস্পর পরস্পরের দুঃখ-মোচন করিতেছে। সংসার-পটের অষ্টম অঙ্কে মনুষ্য দারিদ্র্য-অসুরকে নিহত করিতেছে। অসভ্য অবস্থায় মনুষ্য দারিদ্র্যের সহিত যুদ্ধ করিতে সক্ষম হয় না। কিন্তু যতই সভ্যতার বিকাশ হয় ততই মনুষ্য দারিদ্র্যকে পরাভূত করিতে শিক্ষা করে। সকলেই জানেন যে, সভ্য দেশে দুর্ভিক্ষ হয় না।

সংসার-পটের নবম অঙ্কে মনুষ্য পাপকে পাপ বলিয়া ঘৃণা করিতে শিখিয়াছে এবং পাপের জন্য অনুতাপ করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

সর্ব্বশেষে কবি দেখাইতেছেন যে, সংসার-পটের দশম অঙ্কে মনুষ্য দুঃখ, শোক, তাপ প্রভৃতি সমস্ত পরাভব করিয়া সর্ব্বমঙ্গলার মধুর শান্তির পরশনে দয়ার অনুগ্রহ-সিঞ্চনে সর্ব্বপ্রকার সুখভোগ করিতেছে।

কবি যে সভ্যতার এই দশ অঙ্কের বর্ণনা করিয়াছেন, ইহা কি কেবল কবির কল্পনা? সভ্যতার এই চিত্র যে কল্পনাময়, তাহা আমরা অস্বীকার করিতেছি না। আমরা কেবল ইহাই বলিতে চাহি যে, কেবল কাব্য-জগতেও এই বর্ণনার মূলে ঐতিহাসিক সত্য ও ঐতিহাসিক ঘটনা। যিনি নিরপেক্ষ চক্ষে ইতিহাস আলোচনা করেন, তিনি জানেন যে, সভ্যতার প্রত্যেক অবস্থার মূর্ত্তিই ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন রূপে আজিও বিরাজ করিতেছে। নিবিড় বনের বন-মানুষ অধিবাসী যে সভ্যতার সংহারময়ী মূর্ত্তির অধীনে বাস করে ইহা কে অস্বীকার করিবে? আর মার্কিন, ইংলণ্ড, জর্ম্মণী প্রভৃতি রাজনৈতিকগণ এ সভ্যতার কমলাত্মিকা মূর্ত্তির অধীনে বাস করেন, ইহাই বা কে না স্বীকার করিবে? হেমবাবু দেবীর দশ মূর্ত্তির [illegible] অবস্থার সংযোজনা করিয়া কল্পনার সহিত বৈজ্ঞানিক সত্যের [illegible] করিয়াছেন।

ভারতচন্দ্র ধূমাবতীর বর্ণনা করিতেছেন,—

"দেখি ভয়ে ত্রিলোচন মুদিলা লোচন।
ধূমাবতী হয়ে সতী দিলা দরশন॥
অতি বৃদ্ধা, বিধবা বাতাসে লোলে স্তন।
কাকধ্বজ রথারূঢ়া ধূমের বরণ॥
বিস্তারবদনা কৃশা ক্ষুধায় আকুলা।
এক হস্ত কম্পবান, আর হস্তে কুলা॥"

হেমবাবু ধূমাবতীর বর্ণনা করিতেছেন,—

"কাছে তার দেখিল যে ভুবন উজ্জ্বল
আরও সুনির্মল কিনি মধ্য ভুবনে।
দীর্ঘা বিবর্ণ-বপু, চঞ্চল চরণ,
কুটিল-নয়না যথা ধূমাবতী বরণে॥
বৃদ্ধা স্তন-পয়োধরা ক্ষুৎপিপাসাতুরা,
বিমুক্তকেশী যথা জীবমুখ-বিনাশে।
ধূমকান্তি শুভ্রকেশ, দুর্গাইতে রুক্ষ বেশ
বিধবার রূপে নিত্য সতী যেথা বিকাশে।
বিবর্ণা, অতি চঞ্চলা, হস্তে কম্পিত কুলা,
রথধ্বজোপরি কাকচিহ্ন প্রকাশে॥"

কোন কোন স্থলে হেমবাবু পুরাণ অকুণ্ঠ ভাষায়ও পূর্ব্বতন কবিগণকে বর্ণনা-মাধুর্য্যে পরাজিত করিয়াছেন।

ভারতচন্দ্র মাতঙ্গীর রূপ বর্ণনা করিতেছেন —

"রক্তপদ্মাসনা শ্যামা রক্তবস্ত্র পরি।
চতুর্ভুজা খড়্গ-চর্ম্ম-পাশাঙ্কুশ ধরি॥
ত্রিলোচনা অর্দ্ধচন্দ্র কপাল-ফলকে।
চমকিত বিধু বিধুনাথের চমকে॥"

কালীকৈবল্যদায়িনী মাতঙ্গীর রূপ বর্ণনা করিতেছেন,—

"পদ্মাসনা শ্যামা রক্তবসনা মাতঙ্গী॥
চতুর্ভুজ খড়্গ-চর্ম্ম পাশাঙ্কুশ-ধরা।
ত্রিলোচনী মুক্তকেশী শশাঙ্ক-শেখরা।"

হেমবাবু মাতঙ্গীর এইরূপ বর্ণনা করিতেছেন —

"সুচারু মনোহর, যেন নিকটে তার
অন্য ভুবন কিবা জ্যোৎস্না গগনে।
বীণা বাজিছে করে, বাদনে ঝরে স্বরে,
কুণ্ডল ঝলমল সুন্দর বদনে॥
কলহংস-শোভা-সম, শুভ্রমালা নিরুপম,
শ্যামাঙ্গী পদ্মের মালা দুই করে পরেছে।

প্রীতি স্তুতি ভকতনে সর্ব্ব জীব দুঃখ দলে,
মহেশ্বীর রূপে সতী পদমূলে বসেছে ॥"

সত্যের অনুরোধে ইহাও বলিতে হইতেছে যে, কোন কোন স্থলে হেমবাবু ও পূর্ব্ববর্ত্তী কবি কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছেন।

হেমবাবু ছিন্নমস্তার রূপ বর্ণনা করিতেছেন,—

হের যার ঊর্দ্ধ দেশে মহামোহ রূপ বেশে,
ছিন্নমস্তা ভয়ঙ্করী খাও নিজ করিবে ॥
বিকট উৎকট মূর্ত্তি— * * * *
রুধিরের সর্ব্বপান নিজ মুখে ধরিয়া।"

কালীকেবলগামিনী ছিন্নমস্তার রূপ এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন,—

"হাসে দুটী সখে দেবী করিলা আজ্ঞ।
চিন্তা নাই ক্ষুধা হও সুধা পাইবি* হয় ॥
এত বলি নিজ মুণ্ড কাটিয়া ফেলন।
আপনার বাম করে করিলা ধারণ ॥
কণ্ঠ হইতে তিন ধারা তিন দিকে যায়।
এক ধারা ছিন্নমস্তা অতি সুখে খায় ॥
দুই ধারা দুই সখী সুখে করে পান।
নিজ-রক্তে ক্ষুধানল করিল নির্ব্বাণ ॥"

এইরূপে হেমবাবু কখনও বা পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণকে পরাজিত করিয়াছেন, কখনও বা তাঁহাদের কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছেন। কিন্তু তিনি শুদ্ধ পুরাণের মধ্যে নিজ-কল্পনা আবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই। তিনি নিজে কয়েকটি অদ্ভুত মনোহর চিত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। আমরা নিম্নে এইরূপ দুই তিনটি চিত্রের উল্লেখ করিতেছি।

(ক) যেখানে মহাদেব স্বীয় আচ্ছাদন অপসারিত করিতেছেন এবং নিশুম্ভ দানবীয় সৈন্য একে একে শিব-দেহে প্রবিষ্ট হইতেছে, সেখানে কবির কল্পনা এক ভয়ঙ্কর ও অদ্ভুত চিত্রের সৃষ্টি করিয়াছে।

"প্রসারিয়া করি তীব্র উথিলেন অচিরে।
নিশুম্ভ-সৈন্য লুকাইল মহাকাল শরীরে।
একে একে অংশের আস্তরণ খসিল।
চন্দ্রতারা রবি মেঘ গ্রহ সনে ডুবিল ॥
* * * *
স্বর্গ পুরী অন্তর্দ্ধান হিমালয় ছুটিল।
ব্রহ্মাণ্ড সমুদয় শিব-অঙ্গে মিশিল ॥
যুগে যুগে শূন্য পথে বিন্দুকারা ধায় রে।
তবে যেন অবশেষে শিবদেহে ছায়া রে।"

* দেবী ছিন্নমস্তারূপে ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছিলেন। কিছুতেই তাঁহার ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় নাই।

মহাদেব অবৃষ্টিসংরম্ভ মেঘের ন্যায়, তরঙ্গবিহীন সমুদ্রের ন্যায়, নিবাতনিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায়। কালিদাস এখানে শোকের বর্ণনা করিয়াও শিবের শিবত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। যদি হেমবাবু পুরাণোক্ত শিব-বিলাপ বর্ণনা না করিয়া কালিদাসের শিব-চিত্র আমাদের সম্মুখে ইঁহার অনুপম ভাষায় বর্ণনা করিতেন তাহা হইলে 'দশমহাবিদ্যা' আরও মহামূল্য ও নির্মল হইত।

আমরা নিরপেক্ষভাবে যথাশক্তি হেমবাবুর কাব্যের দোষগুণ বিচার করিলাম। যদি কেহ আমাদের সমালোচনা এতদূর পাঠ করিয়া থাকেন তাহা হইলে তিনি অবশ্যই আমাদের সহিত স্বীকার করিবেন যে 'দশমহাবিদ্যা' বঙ্গভাষার এক অতি উজ্জ্বল রত্ন।

[বান্ধব, ১২৮৯]

সমালোচনা ও সমালোচক

ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়

কোনও পদার্থের স্বরূপ নির্ণয় করিতে হইলে তাহার সমালোচনা করা প্রয়োজন। সত্যাসত্য জ্ঞানমাত্রেরই যথাযথরূপ স্বরূপ নির্ণীত হওয়া আবশ্যক। সুতরাং সমালোচনা অবশ্যম্ভাবী। মনুষ্যের চিন্তা-শক্তি তাহার জ্ঞানলাভের মৌলিক কারণ। সমালোচনা চিন্তা-শক্তি-পরিচালনের নামান্তর মাত্র। জ্ঞান-মাত্রেরই মূলে সমালোচনা স্বতঃ-নিহিত। সমালোচনা রূপ সোপান-পরম্পরায় মনুষ্য জ্ঞান রূপ উচ্চ শৈলে আরোহণ করিতে সমর্থ হয়। সমালোচনা আনুমানিক জ্ঞান সম্ভূত। বস্তু হইতে অবস্থা বা অবস্থা হইতে বস্তু-জ্ঞান জন্মে। বস্তু কি জানিতে হইলে অবস্থা কি, ইহা জানাও একরূপ অপরিহার্য, অর্থাৎ, উভয়ের স্বরূপ ও পারস্পরিক সম্বন্ধ কি, ইহা স্থির করার প্রয়োজন। এই স্বরূপ ও সম্বন্ধ-নির্দ্ধারণ-প্রক্রিয়াকেই সাধারণতঃ সমালোচনা বলি। সমালোচনা প্রক্রিয়া সাধারণতঃ কিরূপে সম্পাদিত হয় ও তাহার মৌলিক প্রকৃতি কি, পর্যায়তঃ তাহারই আলোচনা করিব।

পদার্থ-তত্ত্ববিৎ স্থির করিয়াছেন যে, পদার্থ (Matter) * আর কিছুই নয় —কতকগুলি স্বরূপ বা গুণের (Properties) সমবায়মাত্র। এই স্বরূপ

* বলা বাহুল্য যে, এ স্থলে পদার্থের সাধারণ ও স্থূল অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। পদার্থের সূক্ষ্ম তত্ত্ব-ঘটিত 'ম্যাক্সওয়েলে'র তর্কে প্রবৃত্ত হই নাই।

বা ধর্ম্ম দ্বিবিধ—স্থির ও অস্থির। স্থির ধর্ম্ম,—যথা, ভার, বিস্তার, স্থানরোধকত্ব, বিভাজ্যতা, স্থিতিস্থাপকত্ব ইত্যাদি। অস্থির ধর্ম্ম,—যথা, আকুঞ্চনীয়তা, প্রসারণীয়তা, ঘনতা, তরলতা, শীতলতা, উষ্ণতা, কাঠিন্য, কোমলতা ইত্যাদি।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, পদার্থের এই সকল স্বরূপ বা ধর্ম্ম মূলতঃ কিরূপে নির্ণীত হইল। ভারত্ব বা স্থানরোধকত্ব, বিভাজ্যতা বা স্থিতিস্থাপকত্ব, তরলতা বা কাঠিন্য—এবংবিধ এক-একটি স্বরূপের যে অস্তিত্ব আছে, বৈজ্ঞানিক কিরূপে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন? উত্তর—পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার দ্বারা। কিন্তু সেই পর্য্যবেক্ষণ বা পরীক্ষার প্রকৃতি ও প্রকরণ কিরূপ? সূক্ষ্মরূপ বিবেচনা করিলে অনুভূত হইবে যে, কোন একটি স্বরূপের ভাব উপলব্ধি বা নির্ণয় করার পূর্ব্বে বা অন্ততঃ সঙ্গে সঙ্গেই তাহার বিপরীত ভাবের কল্পনা করা অপরিহার্য্য। ভারত্ব কি জানিতে হইলে যুগপৎ ভারশূন্যত্বের কল্পনা করিয়া উভয়ের পার্থক্য অনুভব করি, নতুবা ভারত্বের ভাব কিরূপে বুঝিব? কোমলতার সহিত কাঠিন্যের বা কাঠিন্যের সহিত কোমলতার পার্থক্যানুভূতিই কোমলতা বা কাঠিন্যের ভাব হৃদয়ঙ্গম ও স্থিরীকরণের একমাত্র উপায়। এইরূপে, পদার্থের স্বরূপ বা ধর্ম্মের নিরূপণ করিতে তদ্বিপরীত স্বরূপের সহিত তাহার তুলনা করিয়া সম্বন্ধ স্থির করার প্রয়োজন হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, স্বরূপ-নির্দ্ধারণ সঙ্গে সঙ্গেই সম্বন্ধ-নির্ণয়-প্রক্রিয়ার আরম্ভ, অথবা স্বরূপ-নিরূপণ ও সম্বন্ধ-নির্ণয় উভয়ই পরস্পরের অনুগামী। একটির সহিত অপরটির স্বাভাবিক সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধ বা নিয়ম-প্রক্রিয়াই মূলতঃ সমালোচনা। কথাটা পরিষ্কার হইল না, একটি দৃষ্টান্ত উদাহরণ দেওয়া আবশ্যক।

১। বৈজ্ঞানিক গতির লক্ষণ স্থির করিতেছেন,—

'এক স্থান হইতে অপর স্থানে যাওয়ার নাম গতি (Motion)। মনে কর, যেন আমি কোনও স্থানে বসিয়া আছি, তখন তোমরা আমাকে স্থির বা গতিবিহীন বলিতে পার, কিন্তু তাহার পর যখন আমি ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে আরম্ভ করি, তখন আমার অবস্থার নাম 'গতি'। আর, এক স্থানে স্থির হইয়া বসিয়া থাকার নাম 'স্থিতি'। এই গতি ও স্থিতি নিরপেক্ষ ও সাপেক্ষ বা প্রত্যক্ষ উভয়ই হইতে পারে। গতি বা স্থিতি নিরপেক্ষ আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না। সচরাচর সাপেক্ষ গতি বা সাপেক্ষ স্থিতিই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি, সেই জন্য ইহাদিগকে প্রত্যক্ষও বলে। যখন কোন একটি বস্তু চলিতেছে, আর একটি স্থির রহিয়াছে দেখিতেছি, তখন তুলনায় বলি—এ চল, ও স্থির; সুতরাং একের গতি ও অপরের স্থিতি পরস্পরের সাপেক্ষ।' *

২। পরন্তু সাহিত্য-সমালোচক গীতিকাব্যের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতেছেন,—

'যখন হৃদয় কোন বিশেষ ভাবে আচ্ছন্ন হয়—স্নেহ, কি শোক, কি ভয়, কি যাহাই হউক, তাহার সমুদয়াংশ কখনও ব্যক্ত হয় না। কতকটা ব্যক্ত হয়, কতকটা ব্যক্ত হয় না। যাহা ব্যক্ত হয়, তাহা ক্রিয়ার দ্বারা বা কথার দ্বারা। সেই ক্রিয়া এবং কথা নাটককারের সামগ্রী। যেটুকু অব্যক্ত থাকে,

* পদার্থবিজ্ঞান, প্রথম ভাগ, শ্রীকানাইলাল দে, রায় বাহাদুর প্রণীত। ১৮৭৪।

পারম্পরিক সম্বন্ধ হইতেই যাবতীয় পদার্থের বৈজ্ঞানিক শ্রেণীবিভাগ হইয়াছে। অতএব সেই 'সম্বন্ধ'এর পর্য্যালোচনা দ্বারা সমালোচনার মৌলিক প্রকৃতির আরও কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা করিতে এবং তদ্দ্বারা সমালোচন প্রক্রিয়া সাধারণতঃ যেরূপে সম্পাদিত হয়, তাহা আরও বিস্তৃতপরিমাণে দেখাইতে চেষ্টা করা যাইতেছে।

পার্থক্য ও সাদৃশ্য সম্বন্ধেরই অন্তর্গত, এবং বৈজ্ঞানিক শ্রেণীবিভাগের ও জাতি-নির্ব্বাচনের মূল ভিত্তি। অপিচ পার্থক্য ও সাদৃশ্যানুভূতি হইতেই মনুষ্য-জ্ঞানের প্রাথমিক বিকাশ। অতএব পদার্থগত অন্যান্য সম্বন্ধের উল্লেখ করিবার পূর্ব্বে পার্থক্য ও সাদৃশ্যের কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক।

পার্থক্য। সংসারে যত প্রকার দ্রব্য আছে, অর্থাৎ যত প্রকার দ্রব্য এ পর্য্যন্ত মনুষ্যের জ্ঞানাধীনে আসিয়াছে, তাহাদিগের সকলেরই এক একটি স্বতন্ত্র নাম আছে। সকলগুলিই এক একটি স্বতন্ত্র নামে অভিহিত হওয়ার কারণ কি? কারণ—তাহাদিগের পারস্পরিক পার্থক্য বা বিভিন্নতা। আলোক ও অন্ধকার বিভিন্ন পদার্থ, এই কারণেই উভয়েরই স্বতন্ত্র নাম। আলোককে আলোক বলা যায়, কারণ উহা অন্ধকারের প্রতিদ্বন্দ্বী। আলোক ও অন্ধকার একই পদার্থ হইলে উহাদিগের স্বতন্ত্র নাম দিবার কিছুমাত্র আবশ্যকতা হইত না। আলোক অন্ধকার হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, এই কারণেই অন্ধকার ও আলোকের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব। রাম শ্যাম হইতে বিভিন্ন, এই কারণেই শ্যামের নাম রামেরও স্বতন্ত্র থাকিল। ক্ষুধা তৃষ্ণা হইতে বিভিন্ন, এই কারণেই ক্ষুধা তৃষ্ণা দুইটি স্বতন্ত্র নাম। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, পার্থক্য বা বিভিন্নতা দ্বারাই পদার্থসমূহের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বা ব্যক্তিত্ব স্থিরীকৃত হয়। ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন নাম দেওয়া হয়।

অনেক বস্তু আছে, যাহাদিগের পরস্পরের মধ্যে বিভিন্নতা সুস্পষ্ট ও প্রবল। আবার অনেক বস্তু আছে, যাহাদিগের বিভিন্নতা অতি অল্প ও ক্ষীণ। অল্প বা অধিক পরিমাণে হউক, বস্তুমাত্রেরই কোনও না কোনরূপ পারস্পরিক বিভিন্নতা আছে; তন্নিবন্ধনই তাহাদিগের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও ব্যক্তিত্ব।

দ্রব্যনিচয়ের পারস্পরিক বিভিন্নতার আধিক্য ও অল্পতানুসারে তাহাদিগকে তুলনা-করণোপযোগী পর্য্যবেক্ষণের তারতম্য হয়। সূর্য্য কিংবা চন্দ্রের সহিত নক্ষত্রগুলির যাহাতে যে বিভিন্নতা, তাহা উপলব্ধি করা অপেক্ষাকৃত সহজ ও অনায়াস-সাধ্য, কিন্তু নক্ষত্রগুলির পারস্পরিক পার্থক্যানুভব করিতে হইলে কিঞ্চিদধিক পর্য্যবেক্ষণ ও চিন্তা-শক্তি পরিচালন করা আবশ্যক। একটি হস্তীর সহিত একটি পিপীলিকার সাধারণতঃ যে যে অংশে বিভিন্নতা, তাহার নির্ণয় করা যেরূপ সহজ, দুইটি পিপীলিকার আকৃতিগত পারস্পরিক পার্থক্য স্থির করা অবশ্য সেরূপ সহজ নহে। তিক্ত ও মধুরের যে আস্বাদগত পার্থক্য, তাহা অতি অল্প আয়াসেই স্থিরীকৃত হইতে পারে, কিন্তু দুইটি 'মধুর'এর কোনটি কতটুকু মধুর, ইহা প্রভেদ করিতে অপেক্ষাকৃত অধিক বিচক্ষণতা আবশ্যক হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, যে সকল স্থলে পার্থক্যের অল্পতা, সেই

করা মনুষ্য-ক্ষমতার অতীত। বহিঃপ্রকৃতিগত ও অন্তঃপ্রকৃতিগত যে সকল সম্বন্ধ দর্শন-বিজ্ঞানাদি শাস্ত্রকর্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাও বহুবিধ, অতএব সে সমুদায়ের আলোচনা বা উল্লেখ করা এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। কেবল সমালোচনার প্রকৃতি কিরূপ, আর একটু বিশদ করিবার জন্য সম্বন্ধ-ঘটিত কয়েকটি মূল বিষয়ের উল্লেখ করিব।

সম্বন্ধ মোটের উপর দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা—নিত্য ও পরিবর্ত্তনশীল। অগ্নির সহিত উত্তাপের নিত্য-সম্বন্ধ, কেন-না, অগ্নির সহিত উত্তাপ থাকিলেই থাকিবে উত্তাপবিহীন অগ্নির অস্তিত্ব অসম্ভব। কিন্তু অগ্নির সহিত তাহার বর্ণের সম্বন্ধ পরিবর্ত্তনশীল, যে হেতু অবস্থা-ভেদে অগ্নির বর্ণ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হইতে পারে। প্রথমে নিত্যসম্বন্ধ বিষয়ে একটু আলোচনা করিব। কেহ কেহ বলেন, নিত্যসম্বন্ধ জ্ঞান মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা কতদূর সম্ভব বলা যায় না। জ্ঞানমাত্রই মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ, তাহাতে সন্দেহ নাই কিন্তু কেবল 'স্বভাবসিদ্ধি বা আত্মপ্রত্যয়' জ্ঞানের কারণ হইতে পারে না। অগ্নিতে ও উত্তাপে নিত্যসম্বন্ধ,—ইহা প্রথমতঃ পরীক্ষা ভিন্ন মাত্র 'আত্মপ্রত্যয়'-দ্বারা স্থিরীকৃত হওয়া কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?

একটু সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিলে বুঝা যায় যে, নিত্যসম্বন্ধজ্ঞান একমাত্র স্বতঃসিদ্ধ-প্রত্যয়-জনিত নহে—পরীক্ষা ও অভিজ্ঞতা তাহার অন্যতম কারণদ্বয়। প্রথমতঃ পরীক্ষা-দ্বারা অগ্নিতে তাপানুভূতি হইল এবং সকল সময়ে সকল অবস্থায় ও সর্ব্বত্র অগ্নি হইতে উত্তাপের বিচ্ছিন্নতা কখনই লক্ষিত হইল না। পুনঃপুনঃ পরীক্ষা-দ্বারা অভিজ্ঞতা জন্মিল যে অগ্নি ও উত্তাপে নিত্যসম্বন্ধ। এইরূপ পৌনঃপুনিক পরীক্ষা-দ্বারাই ধর্ম্ম-পরম্পরার সমবায়ে নিত্যসম্বন্ধ-বিষয়ক প্রত্যয় জন্মে। সোডা ও ক্লোরিণের সংমিশ্রণে লবণ প্রস্তুত হয়। ইহাদিগের প্রকৃতিগত এই সম্বন্ধ কখনই বিপর্য্যস্ত হয় না। যত বার সোডা ও ক্লোরিন একত্র করিলাম, সর্ব্বত্র, সকল সময়ে ও সকল অবস্থাতেই লবণ প্রস্তুত হইল, সুতরাং সোডা ও ক্লোরিন একত্র হইলেই লবণ প্রস্তুত হইবে, ইহা স্বভাবতঃই প্রত্যয় জন্মিল। অপিচ, ইহাও প্রতীত হইল যে, লবণের পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা সোডা ও ক্লোরিন এবং উহাদিগের সংমিশ্রণের পরবর্ত্তী ফল লবণ। এইরূপে আমরা বুঝিতে পারি যে বিশেষ বিশেষ পদার্থ বা ঘটনা-পরম্পরার সমবায়-দ্বারা অন্যবিধ কতকগুলি পদার্থ বা ঘটনার উৎপত্তি হয়। বলা বাহুল্য যে, পূর্ব্ববর্ত্তী পদার্থ বা ঘটনাগুলি কারণ, আর পরবর্ত্তী পদার্থ বা ঘটনা-পরম্পরা কার্য্য। এইরূপ কার্য্য-কারণ-নিহিত সম্বন্ধানুসন্ধান হইতেই মনুষ্যের সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞান কারণমাত্রই কার্য্যোৎপাদন-শক্তিসম্পন্ন এবং কার্য্যমাত্রেরই কারণ থাকা একান্ত আবশ্যক, মনুষ্যের এই সংস্কার পৌনঃপুনিক পরীক্ষা, পর্য্যবেক্ষণ বা সংক্ষেপতঃ সমালোচনা-দ্বারা লব্ধ। আর কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ পরম্পরার প্রকার-ভেদমাত্র।

দার্শনিকেরা চারি প্রকার কারণ নির্দ্দেশ করেন। বস্তুৎ-সম্বন্ধে একটি দৃষ্টান্ত আছে। দৃষ্টান্তটি অতি পুরাতন হইলেও কারণ-চতুষ্টয়ের বিশেষ ব্যাখ্যা-উপযোগী, এ কারণ, নিম্নে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে।—

কার্য্য—মৃন্ময় কলস।

১ম কারণ—মৃত্তিকা, অর্থাৎ যে উপাদানে কলসটি গঠিত।

২য় কারণ—চক্র, দণ্ড প্রভৃতি, অর্থাৎ যে সকল যন্ত্রের দ্বারা কলসটি বর্ত্তমান আকার প্রাপ্ত হইয়াছে।

৩য় কারণ—কুম্ভকার, অর্থাৎ যে ব্যক্তি কলস নির্ম্মাণ করিয়াছে।

৪র্থ কারণ—কলসের উদ্দেশ্য, অর্থাৎ জলাদি রক্ষা করা।

একটু অনুধাবন করিলে প্রতীত হইবে যে, এই চারি প্রকার কারণ কলসের চারিটি লক্ষণমাত্র।

যে কোনও বস্তু বা বিষয় সমালোচিত হউক না কেন, তাহার আকৃতি প্রকৃতি, উৎপত্তি-মূল ও উদ্দেশ্য—এই চারিটি বিষয় সাধারণতঃ নির্দ্দেশ্য।

[পাক্ষিক সমালোচক, ১২৯০]

সুকুমার সাহিত্যের প্রকৃতি

ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়

মনুষ্য স্বভাবের সহিত সংগ্রাম করে, অথচ স্বভাবেরই অনুকরণ করে। স্বভাবের সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে স্বভাবের অনুকরণ করে। প্রকৃতির উপকরণ লইয়া, প্রকৃতির উপর আধিপত্য করে, বা প্রকৃতির আজ্ঞা পালন করে, অথবা প্রকৃতির প্রয়োজন সাধন, সম্পাদন বা পূরণ করে। প্রকৃতির সহিত সংগ্রাম করা অর্থে প্রকৃতির আজ্ঞা পালন করা, প্রকৃতির উপর আধিপত্য করা অর্থে প্রকৃতির অনুকরণ করা, অনুকরণ করিয়া প্রাকৃতিক প্রয়োজন সাধন বা পূরণ করা। প্রকৃতির উপকরণ লইয়াই প্রকৃতির প্রয়োজন পূরণ করা যায়। বাহ্য এবং আন্তর প্রকৃতি ভিন্ন মানুষ আর কোথায় কি পাইবে? অতি-প্রকৃতি তাহার আয়ত্ত নয়। একটু অনুধাবন করিলেই কথাটি পরিষ্কার হইবে।

জ্ঞান-বিজ্ঞান—প্রকৃতি-পর্য্যালোচনা, শিল্প-সাহিত্য সেই পর্য্যালোচনার সংক্ষিপ্তসার। গ্রন্থ অর্থে পুঁথি, চিত্র অর্থেও তাই* প্রকৃতি-পর্য্যালোচনার ফল, অনুধাবন, অনুকরণ ও বহু দর্শনের ফল, শিক্ষা-দীক্ষা-পরীক্ষার ফল গ্রন্থে '[illegible]'

স্বভাবের বিনাশ যেমন কখন সাহিত্যে হইতে পারে না। তবে কি সাহিত্য স্বভাবকে যথাযথরূপে প্রতিফলিত করে না? করে, কিন্তু সূক্ষ্মভাবে। সাহিত্য স্বভাবের 'সূক্ষ্মশরীর'। প্রকৃতির স্থূলতাও সাহিত্য প্রতিফলিত করে—যেমন মানুষের সূক্ষ্ম শরীরে তাহার স্থূল শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থাকার বিষয় কথিত আছে। পরন্তু সূক্ষ্ম শরীর যেমন স্থূল শরীরের অন্তর্ভুক্ত অথচ অতিরিক্ত, সেইরূপ সাহিত্য স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত অথচ স্বভাবাতিরিক্ত।

যাহা পরিচিত প্রত্যক্ষ, যাহা প্রাত্যহিক, তাহা মনুষ্য-চক্ষে পুরাতন, সাধারণতঃ আকর্ষণশক্তি বর্জিত, কাজেই অধিক পরিমাণে অগ্রাহ্য। তাহাতে নবীনত্ব নাই, বিশেষত্বও নাই, কাজেই মানবমন বা চিত্ত আকর্ষণ করে না। এই জন্য সাহিত্য প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ প্রাত্যহিক নবীনত্ব ও বিশেষত্ববিবর্জিত সাধারণ প্রকৃতির সকল উপাদান মাত্র সংগ্রহ করিয়া লয়েন এবং তৎসহযোগে বিশেষত্ব-নবীনত্ব-সমন্বিত চিত্ত-আকর্ষণ ও মনোমোহন-কর আদর্শ প্রকৃতির সৃষ্টি করেন। প্রকৃতির প্রত্যক্ষ পদার্থের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া, তাহার উলঙ্গ 'প্রতিমাটি' সাহিত্য গ্রহণ করেন না, যাহা করেন—বিজ্ঞান, তাও বিশেষ বিশেষ স্থলে। প্রকৃতির প্রত্যক্ষ পদার্থ উঁকি ঝুঁকি দিয়া খুঁজিয়া খুঁজিয়া তাহার ফিরিস্তি-নির্ণয় করা, সাহিত্যের কাজ নয়। অন্ততঃ সে কাজ সাহিত্য এত কাল করেন নাই। করিবার আবশ্যকতা বুঝেন নাই। আদর্শ চিত্র বা চরিত্র আঁকিয়াই সাহিত্য নিশ্চিন্ত, সে চিত্র বা চরিত্রকে স্বাভাবিক অথচ স্বভাবাতিরিক্ত করিতে সচেষ্টিত। মধুমক্ষিকার মত সৌন্দর্য্য-মধু আহরণ করতঃ, ভাব-বৈচিত্র্য সংগ্রহ করতঃ, নিজ-বক্ষে ধারণ করিয়া সাহিত্য সৌন্দর্য্যান্বিত; শব্দচয়ন-বিনিহিত, শব্দসম্পদ্-সুসজ্জিত একটি উপমা বা দুইটি অলঙ্কার দ্বারা, সাহিত্য অসংখ্য শব্দ, ভূরি ভূরি ভাব, প্রকৃতির অনেকটা অংশ প্রকাশ করেন ও করিবেন। সাহিত্য এই নিয়মে এতকাল চলিয়া আসিয়াছেন ও এখনও আসিতেছেন। কাব্য কবিতা, সঙ্গীত বক্তৃতা, নাটক নভেল, কাহিনী উপন্যাস-আদি সূক্ষ্ম স্থূল সাহিত্য, সমস্ত রসময় শাস্ত্র, প্রত্যেক দেশের সকল দেশেই, উক্ত নিয়মে চলিয়াছে। এখনও যে না চলিতেছে, তা নয়। এখনও চলিতেছে এবং পরেও বোধ করি চলিবে। তবে নিয়মটি সম্বন্ধে ইদানীং একটা কথা উঠিয়াছে, প্রতিকূল সমালোচনাও একটা চলিতেছে। বড় কালের এই পুরাতন নিয়মের পরিবর্ত্তে আর একটি নূতন নিয়ম, অভিনব প্রণালী—অবলম্বন করিয়া সাহিত্যক্ষেত্রে কিছু কিছু কার্য্যও আরম্ভ হইয়াছে। পুরাতন সুরের উপর বসিয়া একটা নূতন সুর-প্রস্তর অর্থ নিজের উদ্ভাবন হইতেছে। উদ্ভাবনটা অবশ্য হইতেছে ইয়ুরোপে। তবে ইয়ুরোপই নাকি আজিকার সকল পৃথিবীর পৃথিবী, সকল দিক্-দেশের অধিনেত্রী; আর ইয়ুরোপীয় সাহিত্যের "ধাঁচ" নাকি আমাদের এখনকার সাহিত্যের গায়ে বিশেষ রূপে লাগিয়াছে, লাগিতেছে, লাগিবে,—আর সে "ধাঁচ" গুলি আমরা এড়াইতে পারি না, এড়াইতে চাহি না, তাই অদ্যকার এই আলোচনা। নভেলের ইয়ুরোপীয়

মাণিকলালের অনুরাগ লক্ষ্য করিল। তখন লেখক কোথায় তাঁহার স্বরচিত পাত্রগুলির এইরূপ অপূর্ব ব্যবহারে কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইবেন তাহা না হইয়া উল্টিয়া তিনি বিস্মিত পাঠকবর্গের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া বলিয়াছেন

"বোধ হয় কোমলপ্রকৃতি পাঠকের বড়ো ভাল লাগিল না। আমি কি করিব? ভালোবাসা-বাসি কথা একটাও নাই। বহুকাল সঞ্চিত প্রণয়ের কথা কিছু নাই। [illegible] পাগলামি [illegible]। সে-সব কিছুই নাই—ছিঃ!"

এই প্রকরণীত পাত্রগণের চরিত্রের বিশেষতঃ স্ত্রীচরিত্রের মধ্যে বড়ো একটা দ্রুততা আছে। তাহারা বড়ো বড়ো সাহসের এবং নৈপুণ্যের কাজ করে অথচ তৎপূর্বে যথেষ্ট ইতস্ততঃ অথবা চিন্তা করে না। সুন্দরী বিদ্যুৎরেখার মতো এক নিমেষে মেঘাবরণের ছিন্ন করিয়া লক্ষ্যের উপর গিয়া পড়ে, কোনো প্রস্তরভিত্তি সেই প্রলয়গতিকে বাধা দিতে পারে না।

স্ত্রীলোক যখন কাজ করে তখন এমনি করিয়াই কাজ করে। তাহার সমস্ত মনপ্রাণ লইয়া বিবেচনা চিন্তা বিসর্জন দিয়া একেবারে প্রধাবিত হইয়া উদ্দেশ্যসাধনে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু যে অন্ধবৃত্তি প্রবল হইয়া তাহার স্বাভাবিক সুকোমলসীমার বাহিরে তাহাকে অনিবার্য বেগে আকর্ষণ করিয়া আনে পাঠককে পূর্ব হইতে তাহার একটা পরিচয় একটু সংবাদ দেওয়া আবশ্যক। বঙ্কিমবাবু তাহা পুরাপুরি দেন নাই।

সেইজন্য রাজসিংহ প্রথম পড়িতে পড়িতে মনে হয় সহসা এই উপন্যাস জগৎ হইতে মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির প্রভাব যেন অনেকটা হ্রাস হইয়া গিয়াছে। আমাদিগকে যেখানে কষ্টে চলিতে হয় এই উপন্যাসের লোকেরা সেখানে লাফাইয়া চলিতে পারে। সংসারে আমরা চিন্তা শঙ্কা সংশয়ভারে ভারাক্রান্ত কার্যক্ষেত্রে সর্বদাই বিনাপরাধে মনের বোঝাটা বহিয়া বেড়াইতে হয়—কিন্তু রাজসিংহ-জগতে অধিকাংশ লোকের যেন আপনার ভার নাই।

যাহারা আজকালকার ইংরাজি নভেল বেশি পড়ে তাহাদের কাছে এই লঘুতা বড়ো বিস্ময়জনক। আধুনিক ইংরাজি নভেলে পদে পদে বিশ্লেষণ—একটা সামান্যতম কার্যের সহিত তাহার নূতনতম কারণপরম্পরা গাঁথিয়া দিয়া সেটাকে বৃহদাকার করিয়া তোলা হয়—ব্যাপারটা হয় তো ছোটো কিন্তু তাহার নথীটা বড়ো নির্দয়। আজকালকার নভেলিস্টরা কিছুই বাদ দিতে চান না, তাঁহাদের কাছে সকলই গুরুতর। এইজন্য উপন্যাসে সংসারের ওজনে ওজন বাড়িয়া উঠিয়াছে। ইহার ভালোমন্দের কথা জানি না, কিন্তু আমাদের মতো পাঠককে তাহাতে অত্যন্ত ক্লিষ্ট করে।

এইজন্য আধুনিক উপন্যাস আরম্ভ করিতে ভয় হয়। মনে হয় কর্মক্লান্ত মানব-হৃদয়ের পক্ষে বাস্তব-জগতের চিন্তাভার অনেক সময়ে যথেষ্টের অপেক্ষা বেশী হইয়া পড়ে, আবার যদি সাহিত্যও নির্দয় হয় তবে আর পলায়নের পথ থাকে না। সাহিত্যে আমরা জগতের সত্য চাই কিন্তু জগতের ভার চাহি না।

মধ্যে অনাবৃত হইয়া অজস্র-চিত্রিত মর্ম্মরের উপরে অজস্র চিত্রিত পক্ষী-খচিত পুত্ত-পুত্তলখচিত কারুকার্য্য-করা পুরু গালিচায় বসিয়া নর্ত্তকীগণের হাসিবিদ্রূপকারী-পরিবৃত হইয়া মানলোলায় তাহার নিভৃত সেই পুষ্পপেলব সুকুমার হৃদয় বালিকাটির মধ্যে কি এক দুর্ব্বার দুর্জ্জয় পাশবশক্তি জাগ্রত হইয়া উঠিল, সে আজ বাধামুক্ত বন্যার একটি সর্ব্ববিপ্লাবী প্রবল তরঙ্গের ন্যায় দিল্লির সিংহাসনে গিয়া আঘাত করিল। কোথায় ছিল মোগল রাজপ্রাসাদের রত্নখচিত রঙমহলে সুন্দরী জেবুন্নিসা—সে সুখের উপর সুখ, বিলাসের উপর বিলাস বিকীর্ণ করিয়া আপনার অন্তরাত্মাকে আদ্যন্ত পুষ্পরাশির মধ্যে আচ্ছন্ন অচেতন করিয়া রাখিয়াছিল, সে-দিনের সেই মুহূর্ত্তলীলায় হঠাৎ তাহার অন্তরশয্যা হইতে জাগ্রত হইয়া তাহাকে কোন মহাপাপী এমন নিষ্ঠুর কঠিন বাহুবন্ধনে পীড়ন করিয়া গেল? সম্রাটদুহিতাকে কে সেই সর্ব্বত্যাগী দুঃখের হাতে সমর্পণ করিল, যে-দুঃখ প্রাসাদের রাজরাজেশ্বরীকেও কুটিরবাসিনী কৃষককন্যার সহিত এক বেদনাশয্যায় শয়ন করাইয়া দেয়। তখন রাত্রিকাল হইল দীর্ঘ, রূপমুগ্ধ মোগলের মুক্ত-সাগরে আত্মবিসর্জ্জন করিল, উদিপুরের নির্ম্মলকুমারী বিদ্যুতের মত মেঘাকাশে উড়িয়া আসিল এবং নৃত্যকুশলা পরচঞ্চলা দরিয়া সহসা উচ্ছ্বাসময় নৃত্যকোলাহলে থাকিয়া থাকিয়া যোগ দিল।

অর্দ্ধরাত্রির এই বিশ্বব্যাপী ভয়ঙ্কর তাণ্ডবের মধ্যে কি মনোহর কুঞ্জবাসী পুষ্পের করুণ কপোতকূজন প্রত্যাশা করা যায়?

রাজসিংহ দ্বিতীয় বিষবৃক্ষ হয় নাই বলিয়া আক্ষেপ করা সাজে না। বিষবৃক্ষের তৃতীয় সুখদুঃখের পাকগুলা প্রথম হইতেই পাঠকের মনে কাটিয়া কাটিয়া বসিতেছিল। অবশেষে শেষ কয়টা পাকে ভয়ঙ্কর পাঠকের একেবারে কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসে। রাজসিংহের প্রথম দিকের পরিচ্ছেদগুলি মনের উপর সেরূপ নিষ্ঠুর সুগভীর চিহ্ন দিয়া যায় না। তাহার কারণ রাজসিংহ স্বতন্ত্র জাতীয় উপন্যাস।

পুনশ্চ লিখিতে বসিয়াছি বলিয়াই মিথ্যা কথা বলিবার আবশ্যক দেখি না। কাল্পনিক পাঠক খাড়া করিয়া তাঁহাদের প্রতি দোষারোপ করা আমার উচিত হয় না। আসল কথা এই যে, রাজসিংহ পড়া আরম্ভ করিয়া আমারই মনে প্রথম প্রথম খটকা লাগিতেছিল। আমি ভাবিতেছিলাম, বড়ই বেশী তাড়াতাড়ি দেখিতেছি—কাহারো যেন নিজ মুখে দুটো ভালোর কথা বলিয়া যাইবারও অবসর নাই। মাঝে মাঝে ভিতরে এমন খোঁচড় দিয়া না গিয়া আর একটু গভীরতররূপে কর্ষণ করিয়া গেলে ভালো হইত।—যখন এই সকল কথা ভাবিতেছিলাম তখন রাজসিংহের ভিতরে গিয়া প্রবেশ করি নাই।

পর্ব্বত হইতে প্রথম বাহির হইয়া যখন নির্ঝরগুলা পাগলের মতো ছুটিতে আরম্ভ করে তখন মনে হয় তাহারা খেলা করিতে বাহির হইয়াছে—মনে হয় না তাহারা কোনো কাজের। পৃথিবীতেও তাহারা গভীর চিহ্ন অঙ্কিত করিতে পারে না। কিন্তু তাহাদের পশ্চাতে অনুসরণ করিলে দেখা যায় নির্ঝরগুলা নদী হইতেছে—ক্রমেই

গভীরতর হইয়া ক্রমেই প্রশস্ততর হইয়া পর্বত ভাঙিয়া পথ কাটিয়া জয়ধ্বনি করিয়া মহাবলে অগ্রসর হইতেছে—সমুদ্রের মধ্যে মহাপরিণাম প্রাপ্ত হইবার পূর্বে তাহার আর বিশ্রাম নাই।

রাজসিংহেও তাই। ইহার এক একটি খণ্ড এক একটি নির্ঝরের মতো দ্রুত ছুটিয়া চলিয়াছে। প্রথম প্রথম তাহাতে কেবল আলোকের ঝিকিমিকি এবং চঞ্চল লহরীর তরল কলধ্বনি—তাহার পর ষষ্ঠখণ্ডে দেখি স্রোত গভীর, স্রোতের পথ গভীর এবং জলের বর্ণ ঘনকৃষ্ণ হইয়া আসিয়াছে। সপ্তম খণ্ডে দেখি কতক বা নদীর স্রোত, কতক বা সমুদ্রের তরঙ্গ, কতক বা অমোঘ পরিণামের মেঘগর্জন গর্জন, কতক বা তীব্র বেদনাপূর্ণ হৃদয়ের সুগভীর ক্রন্দনোচ্ছ্বাস, কতক বা ব্যক্তিবিশেষের মজ্জমান তরণীর প্রাণপণ হাহাধ্বনি। সেখানে নৃত্য অতিশয় বেগ, ক্রন্দন অতিশয় তীব্র এবং ঘটনাবলী ভারত-ইতিহাসের একটি যুগাবসান হইতে যুগান্তরের দিকে ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে।

রাজসিংহ ঐতিহাসিক উপন্যাস। ইহার নায়ক কে কে? ঐতিহাসিক অংশের নায়ক ঔরংজেব, রাজসিংহ এবং বিধাতাপুরুষ—উপন্যাস অংশের নায়ক আছে কি না জানি না, নায়িকা জেবউন্নিসা।

রাজসিংহ, চঞ্চলকুমারী, নির্মলকুমারী মাণিকলাল প্রভৃতি ছোটো বড়ো অনেকে মিলিয়া সেই মোগলক্ষয়ের মধ্যাহ্ন দিনে ভারত-ইতিহাসের রথচক্র আকর্ষণ করিয়া দুর্গম সঙ্কুল পথে চলিয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে লেখকের কল্পনাপ্রসূত হইতে পারেন, তথাপি তাঁহারা এই ঐতিহাসিক অংশেরই অন্তর্গত। তাঁহাদের জীবন-ইতিহাসের তাঁহাদের সুখদুঃখের স্বতন্ত্র মূল্য নাই—অন্তত এ গ্রন্থে প্রকাশ পায় নাই।

জেবউন্নিসার সহিত ইতিহাসের যোগ আছে বটে কিন্তু সে যোগ গৌণভাবে। সে যোগটুকু না থাকিলে এ-গ্রন্থের মধ্যে তাহার কোনো অধিকার থাকিত না। যোগ আছে কিন্তু বিপুল ইতিহাস তাহাকে গ্রাস করিয়া আপনার অঙ্গীভূত করিয়া লয় নাই, সে আপনার জীবন-কাহিনী লইয়া স্বতন্ত্রভাবে দীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছে।

সাধারণ ইতিহাসের একটা গৌরব আছে। কিন্তু স্বতন্ত্র মানবজীবনের মহিমাও তদপেক্ষা ন্যূন নহে। ইতিহাসের উচ্চচূড় রথ চলিয়াছে, বিস্মিত হইয়া দেখ, সসম্ভ্রমে হইয়া থাকিয়া উঠ, কিন্তু সেই রথচক্রতলে যদি একটি মানবহৃদয় পিষ্ট হইয়া ক্রন্দন করিয়া মরিয়া যায় তবে তাহার সেই মর্মান্তিক আর্তধ্বনিও—রথের চূড়া যে গগনতল স্পর্শ করিতে স্পর্ধা করিতেছে—সেই গগনপথে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, হয় তো সেই রথচূড়া ছাড়াইয়া চলিয়া যায়।

বঙ্কিমবাবু সেই ইতিহাস এবং মানব উভয়কেই একত্র করিয়া এই ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করিয়াছেন।

তিনি এই বৃহৎ জাতীয় ইতিহাসের এবং তীব্র মানব-ইতিহাসের পরস্পরের মধ্যে কিরূপ পরিমাণে ভাবেরও যোগ রাখিয়াছেন।

মোগল সাম্রাজ্য যখন সম্পদে এবং ক্ষমতায় স্ফীত হইয়া একান্ত স্বার্থপর হইয়া উঠিল, যখন সে সম্রাটের পক্ষে ন্যায়পরতা অনাবশ্যক বোধ করিয়া, প্রজার সুখদুঃখে একেবারে অন্ধ হইয়া পড়িল, তখন তাহার অধঃপতনের দিন উপস্থিত হইল।

বিলাসিনী জেবউন্নিসাও মনে করিয়াছিল সম্রাটদুহিতার পক্ষে প্রেমের আবশ্যক নাই, সুখই একমাত্র শরণ্য। সেই সুখে অন্ধ হইয়া যখন সে দয়াধর্মের মস্তকে আপন জরি-জহরৎ-জড়িত পাদুকাখচিত সুন্দর বামচরণখানি দিয়া পদাঘাত করিল তখন কোন্ অজ্ঞাত গুহাতল হইতে কুণ্ডলী-প্রেম জাগ্রৎ হইয়া তাহার বক্ষস্থলে দংশন করিল। বিলাস শিবিরে শিরায় সুখসম্ভোগশায়ী রক্তস্রোতের মধ্যে একেবারে আগুন বহিতে লাগিল। আরামের পুষ্পশয্যা চিতাশয্যার মত তাহাকে দগ্ধ করিল। তখন সে দুনিয়া বাহির হইয়া উপেক্ষিত প্রেমের কণ্ঠে বিনীত দীনভাবে সমস্ত সুখসম্পদের বরমাল্য সমর্পণ করিল—দুঃখকে স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া হৃদয়াসনে অভিষিক্ত করিল। তাহার পরে আর সুখ পাইল না কিন্তু আপন সচেতন অন্তরাত্মাকে ফিরিয়া পাইল। জেবউন্নিসা সম্রাট্-প্রাসাদের অবরুদ্ধ অচেতন আরামগর্ভ হইতে দীন মরুস্থানের পথধূলায় ভূমিষ্ঠ হইয়া উদার জগতীতলে জন্মগ্রহণ করিল। এখন হইতে সে প্রকৃত জগৎ-বাসিনী রমণী।

ইতিহাসের মহাকোলাহলের মধ্যে এই মন্দভাগ্য হতভাগিনী নারীর বিদীর্ণপ্রায় হৃদয় মাঝে মাঝে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া রাজসিংহের পরিণাম অংশে বড়ো একটি শোকের অনিবার্য করুণা ও ব্যাকুলতা বিস্তার করিয়া দিয়াছে। দুর্যোগের রাত্রে একদিকে মোগলের ঐশ্বর্যতরী পাষাণপ্রাসাদ ভাঙিয়া ডুবিয়া পড়িতেছে, আর এক দিকে সর্বত্যাগিনী নারীর অনাবৃত ক্রন্দন ফাটিয়া ফাটিয়া উঠিতেছে, সেই বৃহৎ ব্যাপারের মধ্যে কে তাহার প্রতি দৃকপাত করিবে—কেবল যিনি অন্ধকার রাত্রে অদৃশ্য থাকিয়া সমস্ত ইতিহাস-প্রবাহকে নীরবে নিয়মিত করিতেছেন, তিনি এই ধূলি-লুণ্ঠ্যমান ক্ষুদ্র মানবীকেও অনিমেষ লোচনে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন।

এই ইতিহাস এবং উপন্যাসকে এক সঙ্গে চালাইতে গিয়া উভয়কেই এক রাশের দ্বারা বাঁধিয়া সংযত করিতে হইয়াছে। ইতিহাসের ঘটনাবহুলতা এবং উপন্যাসের হৃদয়বিশ্লেষণ উভয়কেই কিছু খর্ব করিতে হইয়াছে—কেহ কাহারও অনুবর্তী না হয় এ-বিষয়ে গ্রন্থকারের বিশেষ লক্ষ্য ছিল দেখা যায়। লেখক যদি উপন্যাসের পাত্রগণের সুখদুঃখ এবং হৃদয়ের লীলা বিস্তার করিয়া দেখাইতে বসিতেন তবে ইতিহাসের গতি অচল হইয়া পড়িত। তিনি একটি প্রবল স্রোতস্বিনীর মধ্যে দুটি একটি নৌকা ভাসাইয়া দিয়া নদীর স্রোত এবং নৌকা উভয়কেই একসঙ্গে দেখাইতে চাহিয়াছেন। এই জন্য চিত্রে নৌকার আয়তন অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হইয়াছে, তাহার প্রত্যেক সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম অংশ দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। চিত্রকর যদি নৌকার ভিতরের ব্যাপারটাই বেশী করিয়া দেখাইতে চাহিতেন তবে নদীর অধিকাংশই তাঁহার চিত্রপট হইতে বাদ পড়িত। হইতে পারে কোনো কোনো অতিকৌতূহলী পাঠক ঐ নৌকার অভ্যন্তরভাগ দেখিবার জন্য অতিমাত্র ব্যগ্র, এবং সেই জন্য করযোড়ে লেখককে তাঁহারা

নিন্দা করিবেন। কিন্তু সেরূপ বৃথা চপলতা পরিহার করিয়া দেখা কর্ত্তব্য লেখক পুস্তকবিশেষে কি করিতে চাহিয়াছেন এবং তাহাতে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন। পূর্ব্ব হইতে একটি মনগড়া প্রত্যাশা করিয়া বসিয়া তাহা পূর্ণ হইল না বলিয়া লেখকের প্রতি দোষারোপ করা বিবেচনাসঙ্গত নহে। গ্রন্থ পাঠারম্ভে আমি নিজে এই অপরাধ করিবার উপক্রম করিয়াছিলাম বলিয়াই এ কথাটি বলিতে হইল।

[১৩০০]

মানসী

প্রিয়নাথ সেন

সৌন্দর্য্য-উপভোগে আমরা যে আনন্দ লাভ করি, তাহা এক দিকে যেমন বিশুদ্ধ, অপর দিকে তেমনি প্রখর। প্রখরতা নিবন্ধন সে আনন্দ আমরা নিজের ভিতর বদ্ধ রাখিতে না পারিয়া জগৎ-সংসারকে তাহার ভাগ লইতে আহ্বান করি, এবং বিশুদ্ধ বলিয়া পরের সহিত উপভোগে সে আনন্দ কমিয়া না গিয়া বরং বাড়িয়াই থাকে। ইংরেজ কবি Shelley লিখিয়াছেন প্রেমের বিভাগে অর্দ্ধ এমন নহে যে কাহারও প্রাপ্য অংশ হইতে তাহাকে কিঞ্চিন্মাত্র বঞ্চিত করা। এ কথায় অনেকেই আপত্তি করিতে পারেন—কিন্তু সুন্দর বস্তুর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া সকলে মিলিয়া আনন্দ ভোগ করিলে আনন্দ যে বাড়ে বই কমে না তাহা আমরা প্রতিদিন দেখিতেছি। সৌন্দর্য্য-উপভোগ-প্রবৃত্তির মূলে যে পরার্থপরতা আছে, ইহা তাহার একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ। এবং তাহা হইলেই আমরা বলিতে পারি যে, এই বৃত্তি মঙ্গলময় এবং ইহার পরিচালনা শুভাভিমুখী।

আমাদের সৌন্দর্য্যস্পৃহা নানা উপায়ে চরিতার্থ হয়। কিন্তু বোধ হয় সুন্দর কাব্য হইতে আমরা যে আনন্দ পাই, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। চিত্র-বিদ্যা, সঙ্গীত বিদ্যা প্রভৃতি অপরাপর কলা-বিদ্যাও উৎকৃষ্ট সৌন্দর্য্যের পরিতৃপ্তি করে কিন্তু কাব্যে যেমন বাহ্য এবং অন্তর্জগতের সৌন্দর্য্য স্থায়ী, এবং সর্ব্বাঙ্গীণ বিকাশ প্রাপ্ত হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না। কাব্যামোদী পাঠক তাই কোনও সুন্দর কাব্যের সন্ধান পাইলে সুখে অধীর হইয়া অপরকে তাহার রসাস্বাদনে সুখী করিতে উৎসুক হন। সম্ভবতঃ, সমালোচনার জন্ম ইহা হইতেই।

আমরা "মানসী"-পাঠে যে তীব্র এবং নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ পাইয়াছি সচরাচর কোন কবিতা-পুস্তক-পাঠে তাহা ঘটিয়া উঠে না। সেই আনন্দ উচ্ছ্বাসে প্রণোদিত

সমস্ত জীবন তাহাদের অন্তরের প্রদীপ। পাঠকালে এই শব্দমন্ত্রে আহুত হইয়া পাঠকের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়। কখন বা অতীতের উদার, কখনও বা কক্ষ, কখনও বা বিস্ময়কর দিব্য মূর্ত্তি। কেবল তাহাই নহে, প্রকৃতির সৌন্দর্য্যরাশি দেখিলে হৃদয় যে অব্যক্ত মধুরভাবে চঞ্চল হইয়া উঠে, তাহাদের চিত্রে সেই অব্যক্ত মধুর ভাবটুকুও ব্যক্ত হইয়াছে। তাহারা কেবল বাহ্যজগতের সৌন্দর্য্যরাশি আনিয়া পাঠককে উপহার দিয়া ক্ষান্ত হয় না—কবির অন্তর্জগতের আনন্দ মুকুলের মাধুরী আনিয়া দেয়—আনন্দ-উন্মুখ পাঠকের প্রাণে কবির উপভোগের পবিত্র উপহার দিয়া দেয়। এক কথায়, তাহাদের চিত্রে যেমন নিসর্গের চিরমধুর সৌন্দর্য্যরাশি বর্ত্তমান, তেমনই তাহারই সঙ্গে সঙ্গে কবি হৃদয়ের মুগ্ধ উপভোগও বর্ত্তমান।

নিকৃষ্ট কবিদের নিকটে ছন্দ ভাব-প্রকাশের বিঘ্ন বা ব্যাঘাত হইতে পারে, এবং হইয়াও থাকে। কিন্তু প্রকৃত কবির হাতে ছন্দ ভাষা অপেক্ষা ভাব বিকাশের শ্রেষ্ঠতর সোপানের অবলম্বন। ভাষা যাহা করিতে পারে না, ছন্দ তাহা অনায়াসে করিয়া থাকে। ভাষা যেখানে যাইতে পারে না, ছন্দের স্বর্গীয় রাগিণী সেখানে ভাব প্রকাশের পথ অতি প্রশস্ত করিয়া দেয়। পরন্তু যদি ছন্দ আদর্শ রচনা হয় এবং গীতিকাব্য যদি প্রাণের উচ্ছ্বাস হয়, তবে সে উচ্ছ্বাস আর কিছুতেই তেমন প্রকাশ পায় না যেমন ছন্দের আকুল হিল্লোলে। পূর্ব্ব শ্রেণীর কবিগণেরই ছন্দের উপর আশ্চর্য্য ক্ষমতা। ছন্দের উপর ক্ষমতা অর্থে আমি বুঝিতেছি না—যাত্রা দিন বা রাত্রি অক্ষর-সম্বন্ধে শাস্ত্রের শাসন মানিয়া চলা। এমন অনেক পদ্য আছে, যাহাতে সকল নিয়মই সুন্দর রক্ষিত হইয়াছে—পড়িতে শুনিতেও যাহা বেশ সুমধুর, অথচ ছন্দের যে সৌন্দর্য্যের কথা আমি বলিতেছি, তাহাতে তাহার কিছুই নাই। সে সৌন্দর্য্য নিয়মের অধীন নয়, শিক্ষারও আয়ত্ত নয়, গায়কের কণ্ঠের ন্যায় তাহা নিতান্ত স্বভাবের সামগ্রী। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসকে লইয়া যে পুরাতন বিবাদ আছে, এখানে তাহার মীমাংসা হইতে পারে। বিদ্যাপতির ছন্দের উপর এই আশ্চর্য্য ক্ষমতা আছে—বিদ্যাপতির গলা আছে। চণ্ডীদাসের নাই। চণ্ডীদাসের ছন্দ বেশ সুন্দর এবং মধুর, বেশ তাল-লয়-বিশিষ্ট, কিন্তু তাহাতে বিদ্যাপতির অপূর্ব্ব মোহ নাই। মলয়-সমীরণের ন্যায় তাহা হঠাৎ হৃদয়কে উৎফুল্ল করে না, প্রাণকে ভাসাইয়া দেয় না। বিদ্যাপতির বংশীর রবে প্রাণ শিহরিয়া উঠে, চিত্ত চমকিত হয়, বর্ত্তমান ভুলিয়া গিয়া কোথায় কোন্ দিকে ভাসিয়া যাই।

"কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ।"

চণ্ডীদাসের এই কয়টি কথায় বিদ্যাপতির সুমধুর কণ্ঠধ্বনি অতি সুন্দররূপেই বর্ণিত হইয়াছে, এবং ইহাতে বিদ্যাপতির ছন্দের ঘোরও একটু আসিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু পূর্ণ মাত্রায় নহে; ইহাতেও কেমন একটু আকুলতা আছে, কিন্তু দেখ, সে আকুলতা

এবং বিশ্বচরাচরের সুন্দর উদার বিপুল পদার্থের সহিত আপনার স্মৃতি বিজড়িত রাখিয়া প্রেমাস্পদের নিকট ভবিষ্যৎ চিরবিদায় গ্রহণের কথা উত্থাপন করিতেছেন। প্রকৃতির হৃদয়ের সহিত এক সূত্রে গ্রথিত এমন কবিতা খুবই বিরল। ইহাতে যেন জড়-জগতের অনন্ত ছায়া পড়িয়া রহিয়াছে। পড়িলে বোধ হয় যেন প্রকৃতির কোন মহান্ বিশাল প্রাঙ্গণের ভিতর দিয়া চলিতেছি যেন উদার বিস্তৃত সাগর-বক্ষে ক্ষুদ্র দৈনিক জীবনের অবসাদ বিদূরিত করিতেছি,—যেন সংসারচক্রঘূর্ণমান ক্লান্ত ম্লান হৃদয় প্রসারিত নিরবচ্ছিন্ন বিজনতার মধ্যে কি এক পবিত্র অথচ বিষাদপূর্ণ শান্তি উপভোগ করিতেছি, যেন হৃদয়ের সম্মুখে অনন্তের মহাবাতায়ন খুলিয়া দিয়া, কোথা হইতে এক মহান্ অথচ নিরুদ্দেশ উদ্বেগ আসিয়া প্রাণকে ব্যস্ত করিয়া তুলিতেছে।

এইবার দেখিতেছি, আমার কাজ কঠিন হইয়া উঠিল, এইবার আমি মানসীর প্রেম-কবিতাগুলির উল্লেখ করিব। সকল দেশেরই সাহিত্যে প্রেম-কবিতার দৌরাত্ম্য একটু বাড়াবাড়ি। আমাদের দেশের ত কথাই নাই। এখানে বাগ্দেবীর বন্দনা শেষ না হইতেই, পঞ্চবাণের ষোড়শোপচারে পূজা। কিন্তু শুধু সুন্দর সরল কৃত্রিমতাহীন অথচ প্রেমের মধুর উন্মাদনায় পরিপূর্ণ, এমন কবিতা কয়টি আছে? বৈষ্ণব কবিদিগের মধ্যে প্রকৃত প্রেমের আকুলতা ও গভীরতা পূর্ণমাত্রায় থাকিলেও, তাঁহাদের ভিতর অসীম বিস্তৃতির ভাব নাই তাঁহাদের গান প্রায় একই কথায় পরিপূর্ণ, কিন্তু এক কথা হইলেও তাহা হৃদয়ের কথা এবং প্রগাঢ় অনুভব-শক্তির পরিচায়ক। তাহা ছাড়া, তাঁহাদের ভিতর অপ্রাকৃত কিছুই নাই, সেইজন্য 'একঘেয়ে' হইলেও তাঁহারা চিরজীবনে জীবিত। কিন্তু মানসীর প্রেম-কবিতাগুলি কতই বিচিত্রভাবে পরিপূর্ণ, কত দিক্ হইতে কত বিভিন্ন অবস্থায় কবি প্রেমকে ব্যক্ত করিয়াছেন। তাহারা না কেবলমাত্র শরীরের সকাম নিকৃষ্ট লালসায় কলুষিত বা পীড়িত, না অপ্রেমিকের মিথ্যা আধ্যাত্মিকতার আড়ম্বরময় অস্বাভাবিক স্ফীত বা বিকৃত-দেহ। তাহাদের ভিতর 'ছিব্‌লেমি' চটুলতা কিছুই নাই, কিন্তু অতল মানব-হৃদয়ের মর্ম্মোচ্ছ্বাস আছে। মানব-জীবনের পূর্ণ প্রদীপ্ত আকাঙ্ক্ষায় তাহারা জীবিত, উন্মত্ত, আকুল। বাস্তবিক, মানুষের সমুদয় হৃদয়বৃত্তির মধ্যে প্রেমের যেমন শ্রেষ্ঠতা তেমনই সকল কবিতা বা গানের মধ্যে প্রেম-কবিতার শ্রেষ্ঠতা। সর্ব্বতোভাবে সুন্দর প্রেম-গীতি বড়ই বিরল। আমাদের বাঙ্গালা সাহিত্যে বৈষ্ণব কবিরাই উহার চরম সৌন্দর্য্য দেখাইয়াছেন, এবং তাঁহাদের পরিসর ক্ষুদ্র হইলেও তাঁহারা তাহারই মধ্যে কবিত্বের যথেষ্ট উৎকর্ষ প্রদর্শিত করিয়াছেন। ইংরেজ কবিদিগের মধ্যে বর্ত্তমান শতাব্দীর পূর্ব্বে একা Shakespeare-ই যেমন অপরাপর সকল বিষয়ে সেইরূপ এ বিষয়েও তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। তারপর এই বর্ত্তমান শতাব্দীতেই আমরা যাহা কিছু উচ্চদরের প্রেম কবিতা দেখিতে পাই। রবীন্দ্রবাবুর কিন্তু শৈশব হইতেই প্রেম কবিতায় অদ্ভুত অসাধারণ ক্ষমতা। তাঁহার রচিত প্রায় সকল প্রেম-কবিতাই সর্ব্বতোভাবে সুন্দর, সেই ছেলেবেলার "বলি ও আমার গোলাপ-বালা" হইতে

আজিকার এই মানসীর "আমার সুখ" পর্য্যন্ত, তাহাদের কোথাও ভাব, ভাষা বা ছন্দে একটুও খুঁত নাই। আবার তাহাদের মধ্যে দু-একটির তুলনা নাই। একটির উল্লেখ করি,—"আজু সখি মুহু মুহু"।* বাঙ্গালা, ইংরাজী বা ফরাসী সাহিত্যে মিলন এবং উপভোগের এমন স্বর্গীয় সঙ্গীত কেহ কখন শুনে নাই। ইহাতে সমস্ত বসন্তের কুসুম-সুষমা, শারদ জ্যোৎস্নার সমস্ত মোহ, এবং মলয়-সমীরণের সমস্ত উন্মাদনা বর্ত্তমান।

মানসীর গোড়ার দিকের প্রেম কবিতাগুলির ভিতর নবীন প্রেমের প্রথম বিলাস ও বিরহের সুন্দর মোহ এবং আশা উপভোগ এবং অধীরতা—হর্ষ এবং বিষাদ, কি মধুর ছন্দেই বর্ণিত হইয়াছে। বিরহানন্দ, ক্ষণিক মিলন প্রভৃতির ছন্দ, বিহারীলালের নিকট কবি ধার করিয়াছেন বটে—কিন্তু প্রথম দুইটি কবিতার অমৃত-মধুর ছন্দ তাঁহার নিজের রচিত। তাহাদের কি সুমিষ্ট ঝঙ্কার—কি সুন্দর গুঞ্জন—প্রতি শ্লোকের শেষ ভাগে মাত্রা এবং মিলনের কি অপূর্ব্ব ছটা। কিন্তু এ সকল কবিতার ও মধ্যে মিথ্যা কিছুই নাই, চটুল ছিবলেমি বা ন্যাকামি নাই—প্রণয়ীর বিরহের হা-হুতাশ নাই "যাও তুমি," "কই দিব" নাই। এখানে কোকিল অভিসম্পাত বা নির্ব্বাসনের ভয় না মানিয়া তাহার আনন্দ-বিকশিত কণ্ঠস্বরে ডাকিতেছে, এবং জ্যোৎস্নাও মল্লিকা-পঙ্ক্তি দর্শন করিতে বিরত নাই। এখানেও কবির নিজ-হৃদয় সত্য এবং স্বভাবের চির-সুন্দরতার ভিতর আছে বলিয়াই আর সকলই প্রকৃতিস্থ। আমাদের দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র Byronদিগের বোধ হয় ইহা ভাল লাগিবে না।

গ্রন্থের শেষের দিকের কবিতাসমূহে যে প্রেম ব্যক্ত হইয়াছে তাহা পূর্ণ, উন্নত এবং গভীর। সে প্রেম পরিণত মানব জীবনের প্রেম — ইহাকে মানুষকে পরিপূর্ণ এবং পবিত্র করে। জীবনের সম্যক্ স্ফূর্ত্তি এবং বিকাশ আনিয়া দেয়। এ প্রেম জীবনের একটি ক্ষুদ্র অংশ বা পরিচ্ছেদ নয়—সমস্ত মানব জীবনই এই প্রেমের। যেখানে এ প্রেম নাই, সেখানে মানব জীবনের পূর্ণতাও নাই। সূর্য্যালোক যেমন দিবসের শূন্য হৃদয়কে পরিপূর্ণ করিয়া রাখে, এ প্রেমও সেইরূপ মানব হৃদয়কে পরিপূর্ণ করে। ইহাতে সঙ্কীর্ণ হৃদয় বিস্তীর্ণ হয়, ক্ষুদ্র হৃদয় উন্নত হয়, অলস হৃদয় উৎসাহে জাগ্রত হয়। এক কথায়, ইহা প্রেমিক এবং প্রেমাস্পদ, উভয়েরই মুক্তি সাধন করে।

গ্রন্থের দুই দিকের প্রেম-কবিতাগুলির ভিতর যেমন ভাবগত বৈষম্য লক্ষিত হয়, তেমনই আবার তাহাদের ছন্দ ও গঠনের বিভিন্নতা আছে। পূর্ব্বদিকের কবিতা-গুলির ছন্দের বেশ চটক আছে। তাহাদের মাধুর্য্য অবিরতাবিশিষ্ট, তাই পাঠককে ক্রমশঃ ক্লান্ত করিয়া আনে। অপরার্দ্ধের কবিতাগুলির মধুরতার ভিতর নিসর্গের মহৎ বস্তুর উদারতা ব্যাপ্ত রহিয়াছে। ইহাদের সৌন্দর্য্য উপভোগে প্রাণ উদ্বেলোদ্ভব

* ভানুসিংহের কবিতা দেখ।

বিকশিত হয়। পূর্ব্বার্দ্ধ বসন্তের উৎফুল্ল কোলাহলে ব্যস্ত, অপরার্দ্ধ সাগরোর্ম্মির মধুর, উদার নির্ঘোষে ধ্বনিত হইতেছে।

এই সকল কবিতা আবার কলা-কৌশলে ইউরোপীয় প্রধান কবিদিগের রচনা অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে, কিন্তু ভাবের ঔদার্য্যে এবং রসের গভীরতায় তাহাদিগের অপেক্ষা অনেক গুণে উচ্চ। সেই ইউরোপীয় হৃদয়েও প্রেমের এতদূর মৌলিকতা এবং গভীরতা নাই, সুতরাং ইউরোপে এরূপ কবিতা এখনও জন্মে নাই। কই, আমি ত ইংরেজী বা ফরাসী কবিদিগের গ্রন্থাবলীর ভিতর "পূর্ব্বকালে" বা "অনন্ত প্রেম" প্রভৃতির ন্যায় কবিতা দেখি নাই। এই দুইটী কবিতারই মর্ম্ম-কথা—যাহাকে ভাল বাসিয়াছি, তাহাকে কি শুদ্ধ এই বারে এই জন্মে ভাল বাসিলাম? আমার হৃদয়ে এই যে প্রেমের প্রগাঢ় দুরন্ত নিবিড় অনুভব ইহা কি আজিকার? এই চিরবিরহী প্রেমের স্রোত কি একদিনে জন্মিয়াছে না অনাদিকালের হৃদয়-উৎস হইতে ভাসিয়া আসিয়াছে? আমরা যে আজ উভয়ের প্রেমে আত্মহারা, ইহার কি পূর্ব্বাপর নাই? সুদূর অতীতে আমাদের মত যাহারা ভালবাসিয়াছিল, তাহাদের সেই মহান্ অনুভবের ভিতর কি আমরা ছিলাম না? এবং ভবিষ্যতে কি এই মহান্ অনুভব নিভিয়া যাইবে? সকল প্রেমিকের মাঝে আমরা ছিলাম আছি, এবং থাকিব। বর্ত্তমানে নিখিল জগতের সমস্ত প্রেম আমাদের দুই জনের মধ্যে পুঞ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে। Walt Whitman-এ এই ধরণের কথা মাঝে মাঝে দেখা যায় বটে, কিন্তু Walt Whitman আত্মজ্ঞানহীন এবং অনেকটা প্রাচ্যভাবে ভাবিত। "ধ্যান" নামক কবিতাটির সুন্দর ভাব কেবলমাত্র আমাদেরই দেশের ভিতর বদ্ধ না থাকিলেও, অনুভবের গভীরতায় Hugo বা Shelley-র শ্রেষ্ঠতম রচনার সমান ("তোমার পাইলে ভুলি তুমি আমি একাকার" প্রভৃতি—মানসী)। Hugo বা Shelley-র ভিতর এমন সুন্দর পরিপূর্ণ কবিত্বের আকুল উচ্ছ্বাস দেখি নাই। মানসীতে এখনও নানাবিষয়ক কত কবিতা আছে যাহাদের এ পর্য্যন্ত নাম উল্লেখ করিতে পারি নাই। তাহাদের ভিতর অনেকগুলিই উপরে সমালোচিত কবিতা-সমূহের ন্যায় সুন্দর। যে-সকল পাঠক মানসীর অপর কোন অংশ বুঝিতে বা তাহার সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে পারেন নাই তাঁহারাও "নব বঙ্গদম্পতির প্রেমালাপে"র রহস্যে মুগ্ধ হইয়াছেন।

"নিষ্ফল উপহারে"র বাঁধাবাঁধি ছন্দ, নিয়ন্ত্রিত রচনা এবং ভাবের গৌরব, বঙ্গ-সাহিত্যে অদ্বিতীয়। "দুরন্ত আশা"র তীব্র দুরন্ত কশাঘাতে সকল জাতির মনে লজ্জা ও ঘৃণার উদ্রেক হইতে পারে। তাহাতে যে বেদুইনের বর্ণনা আছে তাহা কোন্ শ্রেষ্ঠ কবির না উপযুক্ত? "শূন্য ব্যোম অপরিমাণ মদ্যসম করিতে পান"—ওমর খাইয়ামের লেখা—সহসা শুনিলে তাহারই কথা বলিয়া ভ্রম হয়। "সুরদাসে"র প্রার্থনায় সৌন্দর্য্য বিমুগ্ধ প্রেমবিহ্বল কবি-হৃদয়ের কি সুন্দর কাতর চিত্রই প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহাতে তিনি হৃদয়-উচ্ছ্বাসের সহিত এমন জমাট বিশ্লেষণ করিয়াছেন যে যেন Browning ও Shelley একত্র মিলিত হইয়াছে। ইহার উপান্ত্য Stanza-র

সুন্দর কবিত্বময় বর্ণনা একবারমাত্র পাঠে মনে চিরকাল রহিয়া যায়। কেমন অল্প কথায়, উজ্জ্বল উপমার গুণে, "ভীষণ সমুদ্রে"র প্রদীপ্ত চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে,—

"উজ্জ্বল যেন দেব রোষানল"
"উদ্যত যেন বাজ"

দুইটি বন্ধুকে লিখিত দুখানি পত্রের ভিতর বন্ধু-হৃদয়ের অকৃত্রিম স্নেহশীলতা কবিতার স্রোতের সঙ্গে কেমন সুন্দর মিলিয়া মিশিয়া গিয়াছে। ইহাদের ও ভিতর প্রভাত-বর্ণনে কবির স্বাভাবিক মোহনশ্রী পরিস্ফুট —

"কেন যে নয়ন টুটে কুসুম আর না ফুটে
কেতকী শিহরি উঠে কবে না আকুল"।

এই কয়টি কথায় যেন ভরা শরতের মেঘ স্নিগ্ধ হৃদয়ের আলোক ও ছায়া সৌন্দর্য্য এবং শান্তকান্তি, প্রাণে আসিয়া পড়ে।

"নারীর উক্তি" এবং "পুরুষের উক্তি" ভাল হইলেও আদর্শের উৎকর্ষতা লাভ করিতে পারে নাই। প্রথমটির ধরণ অবিকল Browning-এর মতন হইলেও পদে তাঁহার অসাধারণ বিশ্লেষণ শক্তির কিছুই দেখিলাম না। Browning-এর কথার ধারই ইহাতে নাই, এবং ইহার ভিতর মানব জীবনের কোন সমস্যাও উদ্ভাবিত হয় নাই। "পুরুষের উক্তি"তে কিন্তু একটি বেশ গভীর সত্য প্রকটিত হইয়াছে।—

"কেন তুমি মূর্ত্তি হয়ে এলে,
রহিলে না ধ্যান-ধারণার!
সেই মায়া উপবন, কোথা হল অদর্শন,
কেন হায় ঝাঁপ দিতে শুকাল পাথার।"

তাই পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর গদ্য কাব্যের নায়কের সহিত কেবলমাত্র এক রাত্রি প্রেম-সম্ভোগের পর চিরকালের জন্য অদৃশ্য হইয়া নায়িকা বলিয়াছেন—"তোমার অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা আমার নিকট আসিবার জন্য নিয়তই তাহার পক্ষ সঞ্চালন করিবে। আমি তোমার চির-বাঞ্ছিত হইয়া রহিব। তোমার লুব্ধ কল্পনা আমাকে পাইবার জন্য অনুদিন উৎসুক থাকিবে।'—(Mademoiselle de Maupin).

"শূন্য গৃহে" এবং "জীবন-মধ্যাহ্ন" দুইটিই আমার বড় ভাল লাগিয়াছে। তাহাদের ভাষা ও ছন্দের পারিপাট্য এবং ভাবের গাম্ভীর্য্য বড়ই হৃদয়গ্রাহী। নিম্নলিখিত শ্লোকের করুণ রস কি সরল সুন্দর ভাষাতেই ব্যক্ত হইয়াছে।— "কাল ছিল প্রাণ জুড়ে * * * * যেন বজ্রপাত" (৭৬ পৃঃ) 'তারায় তারায় ভাব বাঁধা গিয়ে লাগে"—সৌন্দর্য্যে Tennyson-এর 'Star to star vibrates light"-এর অপেক্ষা ইহা কোন অংশে ন্যূন নহে। 'জীবন-মধ্যাহ্ন'র ন্যায় দ্বিতীয় কবিতা বাঙ্গালা ভাষায় দেখি নাই। ইহা সুন্দর ধর্ম্মভাবে পরিপূর্ণ, এবং পূর্ণ

প্রাণের উক্তি। ইহাতে কোনরূপ ভান বা আড়ম্বর, কোনরূপ ভঙ্গী বা ভেজাল নাই। হৃদয়ের যথার্থ ভাবই যথাযথ চিত্রিত হইয়াছে। ইহার এক একটি উপমা অতি মনোহর ;—

" নয়না বর ঝর্ণ শতধারে "
' ————————অশ্রুনির্ঝরিণী
যথায় মঞ্জুলতর ছবি "

আর দুইটি কবিতার উল্লেখ করিয়াই এই দীর্ঘ প্রবন্ধ শেষ করিব।

"নিষ্ফল কামনা" একটি নিতান্ত অভিনব পদার্থ। আমাদের ধারণা ছিল যে, বাঙ্গালা ভাষায় অমিত্র ছন্দে এমন কবিতা রচিত হইতে পারে না। বিশেষ মাত্রাকে তাহা নিতান্ত শোভাহীন ও শুনিতে নিতান্ত শ্রুতিকঠোর বোধ হইবে। কিন্তু রবিবাবু দেখাইলেন যে, এইরূপ মাত্রাবিভাগে বেশ সুন্দর অমিত্র ছন্দ রচিত হইতে পারে।

'উচ্ছৃঙ্খল' নামক কবিতাটির কি চমৎকার, কি সুন্দর কি করুণাপূর্ণ ভাব ব্যক্ত হইয়াছে। উচ্ছৃঙ্খলের কি নূতন, কি পরিপূর্ণ চিত্রই অঙ্কিত হইয়াছে! ইহার ভাবে কি গভীরতা! ছন্দে কি ব্যাকুলতা! ভাষায় কি ছটা! ইহার ভাষা ও ছন্দ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গীতিকবিদিগের ভাষা ও ছন্দের ন্যায় উৎকৃষ্ট এবং উদার। Shelley বা Swinburne-এর ইংরাজী, Hugo বা Leconte de Lish-এর ফরাসী প্রভৃতি বা জয়দেবের সংস্কৃত ইহা অপেক্ষা কোন অংশে বেশী গৌরবান্বিত নহে।

উপসংহারে কি বলিতে হইবে যে মানসীর কবিতাগুলি ভাবপ্রধান না বস্তুপ্রধান? তাহারা কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের অন্তর্গত এবং তাহাদের ভিতর কবি কি গূঢ় তত্ত্ব নিহিত করিয়াছেন? যদি আলোচনার সহিত বলিতে হয়, আমরা এ সকল বিষয়ে কিছুই জানি না, এবং জানিতেও চাহি না। কেবল এই মাত্র জানি যে সৌন্দর্য্যানুভবে তাহাদের জন্ম, সুন্দর অভিব্যক্তিতে তাহাদের বিকাশ। যেখানে এই দুইটি আছে, সেখানে অপর সকলই আছে বা আর কিছুরই প্রয়োজন নাই। কাব্য-সম্বন্ধে —আর কেবলই কাব্য-সম্বন্ধে কেন?—সমস্ত কলাবিদ্যা সম্বন্ধে প্রথম এবং শেষ কথা এই যে, সমালোচ্য বিষয়টি সৌন্দর্য্যাত্মক কিনা? যদি তাহাতে সৌন্দর্য্যের পূর্ণ বিকাশ থাকে, তবে তাহার অপর হাজার কেন অভাব থাকুক না, তাহাতে কিছুমাত্র আসিয়া যায় না—তাহাতে তাহার নিজ উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছে, কিন্তু হাজার অপর গুণের আধার হইয়াও যদি তাহাতে সৌন্দর্য্যের স্ফূর্ত্তি বা বিকাশ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা একেবারে অপদার্থ। তাহার নিজ উদ্দেশ্য তাহাতে সাধিত হয় নাই। পৃথিবীতে তাহার স্থান বা প্রয়োজন নাই। আমার যতটুকু রসাস্বাদন-শক্তি আছে, তাহাতে আমি নিঃসংশয়ে নির্দ্দেশ করিতে পারি যে, মানসীতে সৌন্দর্য্যের সর্ব্বাঙ্গীণ বিকাশ হইয়াছে। সুতরাং ইহার জাতি বা সম্প্রদায়-নির্ব্বাচনের প্রয়োজন দেখি না। ইহা প্রথম শ্রেণীর কাব্য। প্রথম শ্রেণীর কাব্যের এই এক অসাধারণ

গুণ যে, তাহার সহিত কাহারও কোন বিবাদ বিসংবাদ থাকিতে পারে না, সকল শ্রেণীর লোক তথায় স্থান পাইতে পারে। তাহাতে কোন সাম্প্রদায়িকতা নাই বলিয়া, সকল সম্প্রদায় তাহার উদার সৌন্দর্য্যের অসীমতার ভিতর মিলিত হইতে পারে। সে কবিতা বিষয়-অনুসারে বস্তুগত বা ভাবগত। তাহার সৌন্দর্য্য যেমন অনুভবে, তেমনি অভিব্যক্তিতে—যেমন কল্পনায়, তেমনি রচনায়—যেমন অন্তর্দৃষ্টিতে, তেমনি বহির্দৃষ্টিতে। তাহা যেমন ভরিবার তেমনি ঢালিবার এবং ছড়াইবার। বাণীর ভিতর এমন অনেক কথা আছে, যাহা পাঠে হৃদয় তাহার বদ্ধ রুদ্ধ গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বিশ্ব-চরাচরে ছড়াইয়া পড়ে—সমস্ত সৃষ্টির ভিতর ব্যাপ্ত হইয়া যায়। ব্যাকুল প্রাণ জগতের মাঝখানে আসিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচে। আপনাতে আপনি থাকিতে না পারিয়া জগৎ-সংসারের মাঝে সংসার রচনা করে এবং সমস্ত মানব-হৃদয়ের সহিত মিলিত হয়। আবার এমনও কথা আছে যে হৃদয় নিজের প্রচ্ছন্নতর অন্তঃপুর মধ্যে সেই একই কথার ধ্যানে নিমগ্ন হয়। বিশ্ব তখন বিলুপ্ত—জগৎ শূন্য। প্রাণ—প্রাণেরই ভিতর প্রবিষ্ট ও আপনাতে আপনই বিভোর। এইরূপে বাণীতে পূর্ণতম সৌন্দর্য্য, উচ্চতম কাব্য এবং শ্রেষ্ঠতম আদর্শ রক্ষিত হইয়াছে। সত্যই ইহা শ্রেষ্ঠতম প্রাণের বিকাশ।" বাঙ্গালা সাহিত্যের অমর রত্ন এবং কাব্যামোদী বাঙ্গালী মাত্রেরই আদরের বস্তু।

[সাহিত্য, ১৩০০]

প্রাচীন সাহিত্যালোচনা

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

ভাষার প্রবাহ নদীর গতির সহিত তুলনীয়। কোন অজ্ঞাত অধিত্যকায়, কোন্ অজ্ঞাত শৈলোৎস হইতে নদীর উৎপত্তি। কত ক্ষুদ্র-বৃহৎ, স্বচ্ছ-পঙ্কিল, ক্ষার-স্বাদু জলস্রোতে নদীর কলেবর পুষ্ট। সমবেত সলিল-সমষ্টির কেমন উচ্ছলিত বক্র খর ভঙ্গীময় গতি। শেষে, সাগরসঙ্গমে নদীর কেমন মহান্ আয়ত গম্ভীর ভাব। ভাষা-প্রবাহও নদী-গতির তুল্য।

কোন্ সাধকের দীর্ঘধ্যানে, কোন্ প্রণয়ীর প্রেমোচ্ছ্বাসে, কোন্ বীরের উদ্দীপনায়, কোন্ ভক্তের ভক্তি-সাধনায় ভাষার উদ্ভব, কে স্থির করিবে? কত কবি, গায়ক, লেখক, ভাবুকের কাব্য-স্রোত, গীত-স্রোত, রচনা-স্রোত, চিন্তা-স্রোতে ভাষার কলেবর-পুষ্টি সাধিত হয়। জাতির মধ্যজীবনে সুপুষ্ট ভাষায় কেমন গদ্য-পদ্য-নাটক-কাব্য-উপন্যাসের নব রস-রুচির অভিনব প্রবাহ লক্ষিত হয়। শেষে,

ভাষার চরম উন্নতির কালে জাতীয় সাহিত্যের কেমন প্রশান্ত, গভীর সর্ব্বতোমুখ প্রবাহ। তাই বলিতেছিলাম, ভাষার প্রবাহ নদীর গতির সহিত তুলনীয়।

সকল নদীই জলস্রোত, কিন্তু নদীতে নদীতে কত প্রভেদ। এই প্রভেদ বুঝিতে হইলে, নদীর এই বিশেষত্ব বুঝিতে হইলে, নদীর উৎপত্তি ও অঙ্গপুষ্টি বুঝা চাই। সিন্ধুনদে বর্ষায় বন্যা না হইয়া শীতকালে কেন বন্যা হয়, আর গঙ্গানদীতে শীতে বন্যা না হইয়া বর্ষাকালে কেন বন্যা হয়—এ প্রভেদ, নদনদীর এই বিশেষত্ব, তাহাদিগের উৎপত্তি ও অঙ্গপুষ্টি না বুঝিলে বুঝা যায় না। ভাষারও এইরূপ। সকল ভাষাই বাক্যস্রোত। কিন্তু ভাষাতে ভাষাতে কত প্রভেদ! এই প্রভেদ বুঝিতে হইলে, ভাষাগত এই বিশেষত্ব বুঝিতে হইলে, ভাষার উদ্ভব ও কলেবর-পুষ্টি বুঝা চাই। গ্রীসে হোমর কেন, ইতালীতে দান্তে কেন, ভারতে কালিদাস কেন, ইংলণ্ডে সেক্সপীয়র কেন—এ প্রভেদ, গ্রীক ইতালীয় সংস্কৃত ও ইংরাজি ভাষার এই বিশেষত্ব, তাহাদিগের উদ্ভব ও কলেবর-পুষ্টি না বুঝিলে বুঝা যায় না।

নানা কারণে কয়েক শতাব্দী ধরিয়া নদীর উৎপত্তি ও অঙ্গপুষ্টি বুঝিবার জন্য সভ্য জগৎ সচেষ্ট হইয়াছেন। ব্রহ্মপুত্রনদ কি মানসসরোবরজাত, ইহার অঙ্গ কি সান্পু নদে পুষ্ট, নীলনদী কি নায়সন্জা হ্রদ হইতে উদ্ভূত, ইহার অঙ্গ কি অল্বিনার সলিলে পুষ্ট,—এই সকল কথার মীমাংসার জন্য কত ভূগোলবিদ্ কত নৌ-যাত্রায় শ্রম, ব্যয়, বিপদ্ ও অধ্যবসায় স্বীকার করিয়াছেন। বোধ হয়, সভ্য জগতের এই শ্রম, ব্যয়, বিপদ্, অধ্যবসায়ের মূলে জাতীয় স্বার্থান্বেষণ নিহিত আছে। বোধ হয়, তাঁহারা বুঝিয়াছেন, জাতীয় স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য নদীর গতি বুঝা আবশ্যক। আর নদীর গতি বুঝিবার জন্য তাহার উৎপত্তি ও অঙ্গপুষ্টি বুঝা আবশ্যক। তাই তাঁহাদিগের নৌ-যাত্রায় এত শ্রম, ব্যয়, বিপদ্ ও অধ্যবসায়-স্বীকার। ভাষার উদ্ভব ও কলেবর-পুষ্টি বুঝিবার জন্যও ভাষা-স্রোতে নৌ-যাত্রা আবশ্যক। এই নৌ-যাত্রার জন্য প্রয়োজন-মত শ্রম, ব্যয়, বিপদ্ ও অধ্যবসায় স্বীকার করা আবশ্যক। অন্যথা ভাষায় প্রভেদ, ভাষার বিশেষত্ব—ভাষা-প্রবাহের স্বরূপ বুঝা যাইবে না।

নদীর স্রোতের মত ভাষার স্রোতেও কয়েক বৎসর হইতে সভ্য জগৎ নৌ-যাত্রা আরম্ভ করিয়াছেন। জননী লাটিন ভাষার কোন্ 'প্রাকৃত' প্রভাব হইতে ফরাসীর উৎপত্তি, বর্ত্তমান যুগের ইংরাজি আদি কবি চসারের সহিত ফরাসী রোমান্স্-লেখকদিগের কি সম্বন্ধ, লুথরের বাইবেলের অনুবাদ কি পরিমাণে জর্ম্মন ভাষার শিশু-অঙ্গ পরিপুষ্ট করিয়াছিল,—এই সকল কথার মীমাংসার জন্য কত ভাষাতত্ত্ববিদ্ কত শ্রম, ব্যয়, আয়াস, অধ্যবসায় স্বীকার করিয়াছেন। অবশ্য সভ্য-জগতের এই শ্রম, ব্যয়, আয়াস, অধ্যবসায়ের মূলেও জাতীয় স্বার্থান্বেষণ নিহিত আছে। তাঁহারা অবশ্য বুঝিয়াছেন যে, ভাষাগত জাতীয় স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য ভাষার প্রবাহ বুঝা আবশ্যক। আর ভাষার প্রবাহ বুঝিবার জন্য তাহার উদ্ভব ও কলেবর-পুষ্টি বুঝা আবশ্যক। তাই তাঁহাদিগের ভাষা-স্রোতে নৌ-যাত্রায় এত শ্রম, ব্যয়, আয়াস ও অধ্যবসায়।

ভাষার এই উদ্ভব কোথায়? ভাষার এই কলেবর-পুষ্টি কোথা হইতে? দেশ কাল ও অবস্থাভেদে ভাষার উদ্ভব কোথায়ও আর্তের দীর্ঘশ্বাসে, কোথায়ও প্রণয়ীর প্রেমোচ্ছ্বাসে, কোথায়ও বীরের উদ্দীপনায়, কোথায়ও ভক্তের ভক্তি-সাধনায়। ভাষা-প্রবাহের যে অংশ আমাদিগের নয়নের সম্মুখে প্রবাহিত হইতেছে, সে অংশ উদ্ভব-স্থান হইতে এত যোজন দূরে যে বহু আয়াসেও ভাষাতত্ত্ববিদের গবেষণা-নৌকা তত দূর পঁহুছিতে পারে না। সুতরাং অনেক ভাষার উদ্ভব-স্থান আজিও স্থির হয় নাই; কখনও হইবে কি না, বিশেষ সন্দেহ।

কবি, গায়ক, লেখক ও ভাবুকের কাব্য-স্রোত, গীত-স্রোত, রচনা-স্রোত এবং চিন্তা-স্রোত মিলিয়া ভাষার কলেবর পুষ্টি সাধিত হইয়াছে। ভাষাতত্ত্ববিদের গবেষণার লক্ষ্য এই প্রাচীন কবি গায়ক লেখক ভাবুকের কাব্য-গীত-রচনা-চিন্তার সংগ্রহ। তাঁহার আলোচনার বস্তু এই প্রাচীন কাব্য-গীত-রচনা-চিন্তার প্রকৃতি, গতি, স্থিতি, বিকাশ ও বিনাশ। ভাষাতত্ত্ববিদ্ বুঝেন যে, এ সকল না বুঝিলে ভাষার কলেবর-পুষ্টি বুঝা যাইবে না। আর ভাষার কলেবর পুষ্টি না বুঝিলে ভাষার প্রবাহ বুঝা যাইবে না। সেই জন্যই প্রাচীন কাব্য গীত রচনা চিন্তা বুঝিবার জন্য ভাষাতত্ত্ববিদের এত শ্রম, ব্যয়, আয়াস ও অধ্যবসায় স্বীকার।

প্রয়োজন-সিদ্ধির উদ্দেশ্যেই কার্য্যে প্রবৃত্তি হয়, অন্যথা হয় না। অবশ্যই কোন প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্য, কোন উচ্চ জাতীয় স্বার্থসাধনের জন্য ভাষাতত্ত্ববিদ্ এই শ্রম, ব্যয়, আয়াস, অধ্যবসায় স্বীকার করিতেছেন। এই প্রয়োজন কি? প্রাচীন কাব্য-গীত-রচনা চিন্তার অনুশীলনের প্রয়োজন কি? প্রয়োজন বিশেষই আছে। আর প্রয়োজন এক নহে অনেক। কয়টীর একটু অনুধাবন করা আবশ্যক।

প্রথমতঃ নবীন সাহিত্যের আলোচনায় যে ফল, প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনায়ও সেই ফল অনেক পরিমাণে সাধিত হয়। এ ফল কি, কাব্যামোদী মাত্রেরই বিদিত আছে। এ ফল জ্ঞানের একটী প্রসার, জ্ঞানের একটী বিশুদ্ধি, চিত্তের একটী গভীরতা, সুখের একটী পরাকাষ্ঠা, একটী ব্রহ্মানন্দ-লাভ। অধিকন্তু প্রাচীন সাহিত্যে প্রথম উচ্ছ্বাসের একটী আবেগ, একটী প্রথম উদ্দীপনার নব-ভাব, একটী সরলতা, স্বাভাবিকতা, অকপট ভাব আছে, যাহা নবীন সাহিত্যে প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনায় এইটুকু অধিক ফল।

দ্বিতীয় কথা, নবীন সাহিত্য সম্যক্‌রূপে বুঝিতে হইলে তাহাকে প্রাচীন সাহিত্যের বিবর্ত্তনরূপে বুঝা চাই। অর্থাৎ প্রাচীন সাহিত্যের কোন বীজ কিরূপে কত দিনে ক্রম-বিকশিত হইয়া নবীন সাহিত্যের শাখা কাণ্ডে পরিণত হইল, তাহা বুঝা চাই। অর্থাৎ এ সকল বিষয় ঐতিহাসিকের চক্ষে, ইতিহাসের আলোকে দেখা চাই। যেমন বাষ্পীয় যানের স্বরূপ বুঝিতে, আমরা চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আবিষ্কৃত বাষ্প-ক্রীড়নকের ক্রমোন্নতি ধারাবাহিকরূপে আলোচনা করি, যেমন শঙ্করের বেদান্ত-মত বুঝিতে আমরা ছয় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে প্রচলিত ঋগ্বেদোক্ত ক্রমবিকাশ ধারাবাহিকরূপে আলোচনা

করি, এইরূপ নবীন সাহিত্য সম্যক্ বুঝিবার জন্য প্রাচীন সাহিত্যেরও ধারাবাহিকরূপে আলোচনা করা চাই। এইরূপে আমরা নবীন সাহিত্যের স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব, অন্যরূপে নহে। এ বিষয়ে একজন বিজ্ঞ ফরাসী সমালোচক কয়েকটি সারগর্ভ কথা বলিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। সমালোচক ঐতিহাসিকের চক্ষে মহাকাব্যাদি না পড়িয়া স্তাবক বা উপাসকের চক্ষে ঐ সকল গ্রন্থ-পাঠের নিন্দা করিয়াছেন —"এরূপ পাঠে আলোচনা হয় না, ইহাতে অযথা উপাসনারই প্রশ্রয় দেওয়া হয়। ইহাতে আমাদের সম্মুখে একটা আদর্শ স্থাপিত হয়, কিন্তু আদর্শের উদ্ভব কিরূপে তাহা আমরা জানিতে পাই না। বিশেষতঃ ঐতিহাসিকের পক্ষে মহাকবির কাব্যাদির একপক্ষের আলোচনা বড় অসঙ্গত। এরূপ আলোচনা কবিকে কালের সম্বন্ধ হইতে অপসৃত করিয়া লয়, কবির প্রকৃত জীবন, কবির ঐতিহাসিক সম্বন্ধ হইতে বিযুক্ত করিয়া লয়। এরূপ সমালোচনা প্রচলিত অযথা আদরের অনুবর্ত্তী হয় এবং সাহিত্যের বিকাশক্রমের আলোচনা-বিষয়ে অসঙ্গত হয়।"*

ফরাসী সমালোচক মহাকবির কাব্য-সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিলেন, নবীন সাহিত্য সম্বন্ধেও ঐ সকল কথা বলা যায়। নবীন সাহিত্যও ঐতিহাসিক সম্বন্ধবিহীন করিয়া সাহিত্যের বিকাশক্রমের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া রীতিমত আলোচিত হইতে পারে না। নবীন সাহিত্যের ভাব ভাষা, ছন্দোবন্ধ, শব্দ-বিন্যাস, রচনা-প্রণালী বুঝিতে হইলে প্রাচীন সাহিত্যের ভাব ভাষা ছন্দোবন্ধ, শব্দ-বিন্যাস, রচনা-প্রণালীর পরিজ্ঞান থাকা আবশ্যক। অতএব প্রাচীন কাব্য-গীত-রচনা-পদ্ধতির আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন আছে। আর এই প্রয়োজন এক মাত্র নহে, অনেক।

দ্বিতীয় কথা, ব্যষ্টি মানুষের যেমন জীবনের একটা ইতিহাস আছে, সমষ্টি মানব-সমাজেরও তেমনি জীবনের একটা ইতিহাস আছে। আর সমাজের যে প্রধান সম্পত্তি — ভাষা, যাহাতে বাগ্-জড়িত বালুকণার মত ব্যষ্টি মানুষ সব দিকে বিক্ষিপ্ত না হইয়া সমাজে মিলনবদ্ধ থাকে সেই ভাষারও একটা ইতিহাস আছে। সজীব মানুষের ন্যায় ভাষাও সজীব। ভাষাও অন্যান্য জীবের মত অবিশেষ হইতে বিশেষ, অসম্পূর্ণ হইতে সম্পূর্ণ, অবিকাশ হইতে বিকাশ প্রাপ্ত হয়। যেমন বিশিষ্ট বৃক্ষ বিকশিত হইবার পূর্বে অঙ্কুর হইতে পল্লব, পল্লব হইতে শাখা, শাখা হইতে কাণ্ড, কাণ্ড হইতে মহামহীরুহের প্রকাশ লক্ষিত হয়। এই প্রকাশের ক্রমই তাহার ইতিহাস। ইতিহাসই তাহার ঠিক পরিচয়। পাঠক জানেন যে ধ্বনি হইতে সাঙ্কেতিক, সাঙ্কেতিক হইতে অর্দ্ধসাঙ্কেতিক, অর্দ্ধসাঙ্কেতিক

* "It (a classic) claims not study but veneration; it does not show us how the thing is done, it imposes upon us a model. Above all for the historian this creation of classic personages is inadmissible; for it withdraws the poet from his time, from his proper life, it breaks historical relationships, it blinds criticism by conventional admiration and renders the investigation of literary origins unacceptable."

— M. Charles d'Héricault quoted in M. Arnold's *Essays in Criticism*.

হইতে আদ্য ইংরাজি, আদ্য ইংরাজি হইতে মধ্য ইংরাজি, মধ্য ইংরাজি হইতে পুরাতন ইংরাজি, পুরাতন ইংরাজি হইতে আধুনিক ইংরাজির প্রকাশ হইয়াছে। এই প্রকাশের ক্রমই ইংরাজি ভাষার ইতিহাস।* এইরূপ বাঙ্গালা ভাষার।

বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাসজ্ঞ পাঠক জানেন যে বৈদিক সংস্কৃত হইতে ভাষা-সংস্কৃত, ভাষা-সংস্কৃত হইতে গাথা, গাথা হইতে পালী, পালী হইতে প্রাকৃত মাগধী, মাগধী হইতে আদ্য বাঙ্গালা, আদ্য বাঙ্গালা হইতে মধ্য বাঙ্গালা, মধ্য বাঙ্গালা হইতে আধুনিক বাঙ্গালার প্রকাশ হইয়াছে। এই প্রকাশের ক্রমই বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস। এই ভাষার ইতিহাস-জ্ঞান প্রাচীন সাহিত্যের জ্ঞানসাপেক্ষ। অতএব ভাষার ইতিহাস-জ্ঞানের জন্য প্রাচীন কাব্য গীত রচনা-চিহ্নের আলোচনার প্রয়োজন।

আর এক কথা। কোন ভাষার ব্যাকরণ সঙ্কলন করিতে হইলে সেই ভাষার প্রাচীন সাহিত্যের জ্ঞান থাকা চাই। ব্যাকরণ ভাষার শব্দ-প্রয়োগের বিশ্লেষণ, অথবা সংক্ষেপে বলিতে গেলে ভাষা-প্রকৃতির পরীক্ষা। এই পরীক্ষার সুসিদ্ধির নিমিত্ত প্রাচীন সাহিত্যের পরিজ্ঞান আবশ্যক। এ বিষয়ে পাণিনির দৃষ্টান্ত গ্রহণ করুন। এ সম্বন্ধে পণ্ডিত মোক্ষমূলরের মত এই — "ব্রাহ্মণজাতির প্রাচীনতর কালের বেদ অধ্যয়নের ফলে সংস্কৃত ব্যাকরণের সৃষ্টি। বেদ-ব্রাহ্মণ ভাষা এবং পরবর্ত্তী কালের রচনার ভাষা এই উভয়ের প্রভেদ সম্বন্ধে লিখিত ও বর্ণিত হইতে ব্যাকরণশাস্ত্রে প্রথম উদাহরণ নিদর্শন প্রাতিশাখ্য। ঐ সকল গ্রন্থের উপর ভিত্তি করিয়া বৈয়াকরণের পর বৈয়াকরণ যে অদ্ভুত প্রণালিকা নির্ম্মাণ করেন তাহা পাণিনির ব্যাকরণে সম্পূর্ণতা লাভ করে।"†

এইরূপ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে রচিত যে কোন ভাষার ব্যাকরণ অধ্যয়ন করুন, দেখিবেন, পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় সেই ভাষার প্রাচীন সাহিত্য পাঠের লক্ষণ সুস্পষ্ট রহিয়াছে; কারণ কোন ভাষার প্রাচীন কাব্য-গীত-রচনা চিহ্নের পরিজ্ঞান না থাকিলে সে ভাষার ব্যাকরণ-সঙ্কলন সর্ব্বথা অসম্ভব।

আর যাহাকে ভাষা-বিজ্ঞান বলে, সে বিজ্ঞানের অস্তিত্ব প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত। যে একই আর্য্য ভাষা সংস্কৃত, গ্রীক, লাটিন, গথিক, কেলটিক ও স্লাভনিক, এ সকল ভাষার জননী, ইহারা যে পরস্পর ভগিনী-স্থানীয়া, এ তত্ত্ব উদ্ভাবন ও মীমাংসা কেবল ঐ সকল ভাষার প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনা-বলে সম্পাদিত হয়। এইরূপ যদি আমরা সংস্কৃতের দুহিতৃভূতা বাঙ্গালা,

* "The grammar of modern English is not the same as the grammar of Wycliffe. Wycliffe's English again may be traced back to what we may call Middle English from 1500 to 1330; Middle English to Early English from 1330 to 1230; Early English to Semi Saxon from 1230 to 110; and Semi Saxon to Anglo Saxon."

Max Müller, *Science of Language*, First Series, p. 132.

† Max Muller, *Science of Language*, First Series, p. 126

হিন্দী, গুজরাথী, মহারাষ্ট্রী, উড়িয়া, আসামী প্রভৃতি প্রচলিত ভাষার ভগিনী-সম্বন্ধ বুঝিতে ইচ্ছা করি, যদি একটী ভারতীয় ভাষা-বিজ্ঞান রচনা করিবার প্রয়াস করি, তবে আমাদিগকে ঐ সকল ভাষার প্রাচীন কাব্য-গীত-রচনা-চিন্তার বহুল আলোচনা করিতে হইবে।

চতুর্থ কথা, কোন ভাষার প্রণালী-বিশুদ্ধ অভিধান সঙ্কলন করিতে হইলে সেই ভাষার প্রাচীন সাহিত্যের পরিজ্ঞান থাকা চাই। অভিধান বলিলে শুধু প্রচলিত শব্দ-সকলের প্রচলিত অর্থ-সংগ্রহ বুঝিতে হইবে না। প্রণালী-বিশুদ্ধ অভিধানে অধুনা-প্রচলিত বা ইতঃপূর্ব্বে প্রচলিত সকল শব্দের অর্থ, উৎপত্তি এবং ইতিহাসের বিশিষ্ট বিবরণ থাকা চাই। এ বিষয়ে মারের নূতন ইংরাজি অভিধানের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাইতে পারে; এই অভিধান ভাষা বিজ্ঞান-বিষয়ে ইংরাজজাতির আয়াস ও অধ্যবসায়ের চরম উদাহরণ। এই অভিধান-সংকলন-বিষয়ে সহস্র সহস্র মনীষী পরিশ্রম করিতেছেন, লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়িত হইতেছে। অভিধান-সংকলনের উদ্দেশ্য-নির্ণয়ে সম্পাদক মারে সাহেব এইরূপ* লিখিয়াছেন — "এই অভিধানে প্রত্যেক শব্দ-সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি দেখাইবার চেষ্টা হইয়াছে — কবে কিরূপে কি আকারে কি অর্থে ঐ শব্দের প্রথম প্রয়োগ হয়, কালে কালে উহার আকার ও অর্থের কি বিকাশ হইয়াছে, ঐ আকার ও অর্থের কোন্‌গুলি প্রচলিত, কোন্‌গুলি অপ্রচলিত। কি প্রণালীতে, কত দিন হইল, কি নূতন প্রয়োগ আরম্ভ হইয়াছে। ঐ বিষয়গুলি আবার দৃষ্টান্তসহ দেখাইবার জন্য সেই শব্দের প্রথম প্রয়োগ হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ প্রয়োগ বা আজ-কালকার প্রয়োগ পর্য্যন্ত উদাহরণ উদ্ধৃত করা হইয়াছে। এইরূপে সেই শব্দের ইতিহাস ও অর্থ ক্রম প্রকটিত হইয়াছে, এবং ঐতিহাসিক নিয়মে, আধুনিক শব্দ-বিজ্ঞানের প্রণালী-অনুসারে সেই শব্দের ব্যুৎপত্তি সিদ্ধ করা হইয়াছে।" বলা বাহুল্য, এই রীতি-অনুসারে অভিধান-সংকলন হওয়া উচিত। আর এইরূপে অভিধান সংকলিত করিতে হইলে প্রাচীন সাহিত্যের প্রচুর আলোচনা আবশ্যক। মারের অভিধান-গত একটী শব্দের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে এ কথা বেশ হৃদয়ঙ্গম হইবে। নিড শব্দের প্রতি লক্ষ্য করুন। ঐ শব্দের অর্থ বুঝাইতে প্রাচীন ও নবীন সাহিত্য হইতে অন্ততঃ দেড়শত প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে। প্রাচীন কাব্যাদি হইতে উদ্ধারের

* "It endeavours (1) to shew with regard to each individual word when how in what shape and with what signification it became English; what development of form and meaning it has since received; which of its uses have in the course of time become obsolete and which still survive; what uses have since arisen by what processes and when; (2) to illustrate these facts by a series of quotations ranging from the first known occurrence of the word to the latest or down to the present day; the word being thus made to exhibit its own history and meaning; and (3) to treat the etymology of each word strictly on the basis of historical fact and in accordance with the methods and result of modern philological science." Murray's *New English Dictionary*, Preface.

সপ্তদশ শতাব্দীর ইংলণ্ডের ইতিহাস লিখিতে তাৎকালিক গাথিকাদি হইতে বিশেষ সাহায্য পাইয়াছেন। অতএব অতীত যুগের জাতীয় জীবন, সেই কালের সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থা বুঝিবার জন্য তখনকার রীতি-নীতি, আচার বিচার, প্রণালী-পদ্ধতি জানিবার জন্য প্রাচীন সাহিত্যের অনুশীলন—কাব্য-গীতি-রচনা-চিহ্নের বহুল আলোচনার প্রয়োজন।

সেই জন্য বলিতেছিলাম, প্রয়োজন যথেষ্টই আছে, আর প্রয়োজন এক নহে, অনেক। প্রথম, প্রাচীন কাব্যাদির অকপট রস ও স্বাভাবিকতার আস্বাদ, দ্বিতীয়, নবীন সাহিত্যে প্রাচীন সাহিত্যের বিকাশের ঐতিহাসিক ক্রমনির্ণয়, তৃতীয়, ভাষার ইতিহাস ও ব্যাকরণ সংকলন এবং ভাষা-বিজ্ঞান রচনা, চতুর্থ, প্রণালী বিশুদ্ধ অভিধান-প্রণয়ন, পঞ্চম, প্রাচীন ও নবীন সাহিত্যের অবিচ্ছিন্ন সংযোগ, শেষ, জাতীয় অতীত জীবনের ইতিবৃত্ত-জ্ঞান। এই সকল প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্য প্রাচীন কাব্য-গীতি-রচনা-চিহ্নের আলোচনা অপরিহার্য। বলা বাহুল্য, এই সকল অতি উচ্চ প্রয়োজন, এবং ইহাদিগের সমান্ সাধনেই জাতীয় সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি এবং উর্দ্ধগতি।

[বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩০১]

মহাকাব্যের লক্ষণ

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

ইংরাজি এপিক্-শব্দের অনুবাদে মহাকাব্য শব্দের প্রয়োগ চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু এপিকের সমস্ত লক্ষণের সহিত মহাকাব্যের সমস্ত লক্ষণ মিলে কি না, তাহা বলিতে পারি না। সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে আমার বিন্দুমাত্র জ্ঞান নাই, কিন্তু শুনিয়াছি যে, আলঙ্কারিকেরা মহাকাব্যের লক্ষণ যেরূপ সূক্ষ্মভাবে বাঁধিয়া দিয়াছেন, তাহাতে মহাকবিগণের চিন্তার কারণ কিছুই রাখেন নাই। কালিদাস ভারবি, মাঘ প্রভৃতি কবিগণের রচিত মহাকাব্য এ দেশে চলিত আছে এবং ঐ সকল মহাকাব্য সম্ভবতঃ অলঙ্কারশাস্ত্রসম্মত মহাকাব্য। রামায়ণ ও মহাভারত, এই দুই পুস্তক মহাকাব্য বলা চলে কি না, তাহা লইয়া একটা তুমুল সমস্যা গোড়াতেই দাঁড়ায়। ইংরাজি পুস্তকে রামায়ণ ও মহাভারত এপিক্ বলিয়া নির্দিষ্ট হয়, কিন্তু আমাদের পণ্ডিতেরা উহাদিগকে মহাকাব্য বলিতে সর্ব্বদা সম্মত হন না। প্রথমত, এ দুই গ্রন্থ অলঙ্কারশাস্ত্রের নিয়মাবলি অত্যন্ত উৎকটরূপে

গ্রন্থ দুইখানি ব্যতীত আর কোন কাব্যকে রামায়ণ-মহাভারতের সমান পর্য্যায়ে স্থান দেওয়া যাইতে পারে না। পাশ্চাত্ত্যদেশে সভ্যতাবৃদ্ধির সহিত কবিত্বের অবনতি হইয়াছে, এ কথা কেহই বলিতে পারিবেন না। কিন্তু সেক্‌স্পীয়রের নাম মনে রাখিয়াও স্বচ্ছন্দে বলা যাইতে পারে, ইউরোপ-মহাদেশেও একজনের বেশী হোমারের জন্ম হয় নাই।

বস্তুতই পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাসে ও সভ্যতার ইতিহাসে কোন্ প্রাচীনকালে বাল্মীকি, ব্যাস ও হোমারের উদ্ভব হইয়াছিল, তাহার পর কত-হাজার বৎসর অতীত হইয়া গেল, কিন্তু মহাকাব্যের আর উৎপত্তি হইল না। কেন এরূপ হইল, তাহার কারণ চিন্তনীয়। কিন্তু সেই কারণ আবিষ্কারে লেখকের ক্ষমতা নাই। তবে এক একবার মনে হয়, মনুষ্যসমাজের বর্ত্তমান অবস্থাই বোধ করি আর সেই-শ্রেণীর মহাকাব্য উৎপাদনের পক্ষে অনুকূল নহে।

রামায়ণ-মহাভারতে ও হোমারের মহাকাব্যে আমরা মনুষ্যসমাজের যে চিত্র অঙ্কিত দেখি, তাহাকে সেই সমাজের আধুনিক চিত্রের সত্য বলিতে পারা যায় না। মনুষ্য-সমাজের সে অবস্থা আবার কখনও ফিরিয়া আসিবে কি না, তাহা জানি না। কিন্তু তাৎকালিক সমাজে যে সকল ঘটনা প্রতিদিন সংঘটিত হইত, সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা ঘটিতে পারে না। আমরা এখন কল্পনায় আনিতে পারি না যে, আমেরিকার যুক্তরাজ্যের সভাপতি কোন ইউরোপের রাজসভায় আতিথ্যস্বীকার করিয়া অবশেষে রাজমহিষীকে টানিয়া তুলিয়া প্রস্থান করিয়াছেন, ও তাহার প্রতিশোধগ্রহণার্থ ইউরোপের নরপালবর্গ ওয়াশিংটন অবরুদ্ধ করিয়া দশ বৎসরকাল বসিয়া আছেন। ডিলারী বন্দীকৃত লর্ড মেথুয়েনকে গাড়ির চাকায় বাঁধিয়া দক্ষিণ আফ্রিকার বন্ধুর উপত্যকায় ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইয়াছেন, ইহা কোন দিনের টেলিগ্রামে দেখিবার কেহ আশা করেন নাই। সিডানক্ষেত্রে বিসমার্ক লুই নেপোলিয়নকে হস্তগত করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার বুক চিরিয়া নেপোলিয়ন-বংশের শোণিতপানে আস্ফালন আবশ্যক বোধ করেন নাই। [illegible] অবরোধের বহুদিন পরে [illegible] তুমুল ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু কোন বিজয়ী মহাবীরকে তুরঙ্গের লাঙ্গুলের ব্যবহার করিতে হয় নাই।

সেকালের এই অসভ্যতা আমাদের চোখে বড়ই বীভৎস ঠেকে, সন্দেহ নাই, কিন্তু সেকালের সামাজিকতার আর একটা দিক্ আছে, একালে সে দিক্‌টাও তেমন দেখিতে পাই না। বার্ক একসময় আপনার মহাপ্রাণতার ঝোঁকে বলিয়াছিলেন, শিভালরির দিন গত হইয়াছে। শিভালরি-নামক অনির্ব্বচনীয় বস্তু নব্য সর্ব্বজনের সহিত নিরাকরণ মনুষ্যত্বের অপূর্ব্ব বিশুদ্ধ সমুৎপন্ন। একালে মানুষ মানুষের বক্ষঃস্থল করিয়া শোণিতপানে তৃপ্তি করিতে চাহে না বটে, কিন্তু অবলার শোভাযাত্রার কটাক্ষপাত-প্রসঙ্গে, পত্নীর অপমান স্বচক্ষে দেখিয়াও, আত্মসংযমে সমর্থ হয় কি না, বলা যায় না। একালের রাজারা মালকোঁচা মারিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে গদাহস্তে অবতীর্ণ হন না সত্য বটে,

কিন্তু তাঁহারা পিতৃভক্ত পিতার একটা কথা রাখিবার জন্য বিজন দ্বীপে নির্ব্বাসন গ্রহণ করিতে প্রস্তুত থাকেন কি না, বলিতে পারি না. অশ্বত্থামা ঘোর নিশাকালে সুখসুপ্ত বালক-বৃন্দের হত্যাসাধন করিয়া ভীষণ ক্রূরতা দেখাইয়াছিলেন, সন্দেহ নাই, কিন্তু সভা ডাকিয়া ও খবরের কাগজে পত্র লিখিয়া সেই ক্রূরতার সমর্থন তাঁহার নিতান্তই আবশ্যক হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণসহায় পাণ্ডবগণ যখন জয়বিষয়ে নিতান্ত হতাশ হইয়া নিশাকালে শত্রুশিবিরে ভীষ্মের নিকট দীনভাবে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহারা ভীষ্মকে তাঁহার জীবনটুকু দান করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহাদের লৌহবর্ম্মের অন্তরালে কালেন্ড্রি বোতলের বোঝা লইয়া যাওয়া আবশ্যক বোধ করেন নাই।

গত চারি-হাজার বৎসরের মধ্যে মনুষ্যসমাজের বাহিরের মূর্ত্তিটা অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে সত্য কথা, কিন্তু তাহার আভ্যন্তরিক প্রকৃতির কতটা পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা বলা দুষ্কর। মনুষ্যের বাহিরের পরিচ্ছদটা সম্পূর্ণ বদলাইয়াছে, কিন্তু মনুষ্যের ভিতরের গঠন অনেকটা একরূপই আছে। সেকালের রাজারাজড়াও বোধ করি সময়মত কৌপীনধারী হইয়া সভামধ্যে বাহির হইতে লজ্জিত হইতেন না, কিন্তু এখনকার বস্ত্রহীন শ্রমজীবীরাও সমস্ত অঙ্গের মালিন্য ও বিরূপতা পোষাকের আচ্ছাদনে আবৃত রাখিতে বাধ্য হয়। সেকালে ক্রূরতা ছিল, বর্ব্বরতা ছিল, পাশবিকতা ছিল, এবং তাহা নিতান্ত নগ্ন, নিরাবরণ অবস্থাতেই ছিল। তাহার উপর কোনরূপ আচ্ছাদন, কোনরূপ পালিশ, কোনরূপ রঙ-ফলান ছিল না। একালেও ক্রূরতা, বর্ব্বরতা ও পাশবিকতা হয় ত ঠিক তেমনি বর্ত্তমান আছে, তবে তাহার উপর একটা কৃত্রিম ভণ্ডামির আবরণ স্থাপিত হইয়া তাহার বীভৎস চেহারা আচ্ছন্ন রাখিয়াছে। সম্প্রতি চীনদেশে সভ্য ইউরোপের সম্মিলিত সেনা যে পরাক্রম প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছে, তাহাতে আতিলা ও জঙ্গিস্‌খাঁর প্রেতাত্মার আর লজ্জিত হইবার কোন কারণই নাই।

বস্তুতঃই চারি-হাজার বৎসরের ইতিহাস সূক্ষ্মভাবে তলাইয়া দেখিলে বুঝা যায়, মনুষ্যচরিত্র অধিক বদলায় নাই, তবে সমাজের মূর্ত্তিটা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। এবং মনুষ্যসমাজের অবস্থা যে কাব্যগ্রন্থে প্রতিফলিত হইয়া থাকে, সেই কাব্যের মূর্ত্তিও যে তদনুসারে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে, তাহাতে বিস্ময়ের কারণ নাই। বিস্ময়ের কারণ থাকুক আর নাই থাকুক, আধুনিক কালের সাহিত্যে বাল্মীকি, ব্যাস ও হোমারের আর আবির্ভাব হয় নাই, এবং আর যে কখনও হইবে, তাহা আশা করাও দুষ্কর। সাহিত্যে মহাকাব্যের যুগ বোধ হয় অতীত হইয়া গিয়াছে। কালের যখন অবধি নাই ও পৃথ্বী যখন বিপুলা, তখন বড় কবির ও বড় কাব্যের অসদ্ভাব কখন হইবে না, কিন্তু মনুষ্যসমাজের সেই প্রাচীন অবস্থা ফিরিয়া আসিবার যদি সম্ভাবনা না থাকে, তাহা হইলে মহাকবির ও মহাকাব্যের বোধ করি আবির্ভাব আর হইবে না।

বস্তুতই আর আবির্ভাবের আশা নাই। মহাকাব্যের মধ্যে একটা উন্মুক্ত অকৃত্রিম স্বাভাবিকতা আছে, তাহা বোধ করি আর কখনও ফিরিয়া আসিবে না। সুনিপুণ শিল্পী এক্ষণে তাজমহল গড়িতে পারেন, কিন্তু পিরামিডের দিন বুঝি একেবারে চলিয়া গিয়াছে। মহাকাব্যগুলিকে আমরা মহাকায় অদ্ভুত পিরামিডের সঙ্গে তুলনা করিতে পারি। এক-একবার মনে হয়, উহাদিগকে কোন মানবহস্তনির্মিত কৃত্রিম কারুকার্যের সহিত তুলনা না করিয়া প্রকৃতির হস্তনির্মিত নৈসর্গিক পদার্থের সহিত উপমিত করা উচিত।

আমাদের ভারতবর্ষের মহাভারতকে এক-একবার ভারতবর্ষের হিমাচলের সঙ্গে তুলনা করিতে ইচ্ছা হয়। হিমাচল যেমন তাহার বিপুল পাষাণ কলেবরের অন্তরালে ভারতবর্ষকে রক্ষা করিতেছে, মহাভারতের বিপুল কলেবর তেমনি ভারতীয় সাহিত্যকে কত সহস্র বৎসর কাল অঙ্কে রাখিয়া লালনপালন ও পোষণ করিয়া আসিতেছে। হিমাচলের বিশাল বক্ষোদেশ হইতে নিঃসৃত সহস্র উৎস হইতে সহস্র স্রোতস্বিনী অমৃতরসপ্রবাহে ভারতভূমিকে আর্দ্র ও সিক্ত করিয়া সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা পুণ্যভূমিতে পরিণত করিয়াছে—সেইরূপ মহাভারতের মধ্য হইতে সহস্র উপাখ্যান, সহস্র কাহিনী, সহস্র কথা সমগ্র জাতীয় সাহিত্যের মধ্যে সহস্র ধারা প্রবাহিত করিয়া প্রাণের রসপ্রবাহে জাতীয় সাহিত্যকে চিরহরিৎ রাখিয়া শতকোটি লোকের জাতীয় জীবনে পুষ্টি ও কান্তি প্রদান করিয়া আসিতেছে। ভূতত্ত্ববিৎ যেমন হিমাচলের স্তর বিন্যস্ত স্তূপ-পরম্পরা পর্যবেক্ষণ করিয়া তাহার মধ্য হইতে কত বিলুপ্ত জীবের অস্থি-কঙ্কাল উদ্ধার করিয়া অতীতের লুপ্তস্মৃতি কালের কুক্ষি হইতে উদ্ঘাটিত করেন, সেইরূপ প্রত্নতত্ত্ববিৎ এই বিশাল গ্রন্থের স্তর-পরম্পরা হইতে প্রাচীন সমাজের অতীত ইতিহাসের বিলুপ্ত নিদর্শনের চিহ্ন ধরিয়া ইতিহাসের অতীত অধ্যায় আবিষ্কার করেন।

ভূতত্ত্ববিৎ তাহার মানসচক্ষু অতীতকালের পরপারে প্রসারিত করিয়া দেখিতে পান বসুন্ধরার ইতিহাসে এমন একদিন আসিয়াছিল, যখন রত্নাকর স্বয়ং আপনার ঊর্মিবাহু প্রসারণ করিয়া উত্তপ্ত ধরাগর্ভে বিপুল শক্তিরাশি কেন্দ্রীভূত করিতেছিলেন, দেখিতে দেখিতে সেই পুঞ্জীকৃত শক্তিরাশি আপনাকে প্রসারিত করিয়া ভূবক্ষ বিদারণ করিয়া বহির্গত হইল; ভীষণ ভূকম্পে ধরাপৃষ্ঠ মুহুর্মুহু আলোড়িত হইল; সাগর-বক্ষ উদ্বেলিত হইয়া পুনরায় ভীতিভরে অপসরণ করিল। পূর্বসাগরের বেলাভূমি হইতে পশ্চিমসাগরের বেলাভূমি পর্যন্ত ভূপৃষ্ঠ বিদারণ করিয়া মহাকায় পাষাণকলেবর হিমাচল গাত্রোত্থান করিল। তাহার তুহিনমণ্ডিত সূর্যকিরণোজ্জ্বল শৃঙ্গসমূহ বেষ্টিত করিয়া ঝঞ্ঝাবায়ু সবেগে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। ঘনবর্ণা কাদম্বিনীর বক্ষোদেশে সৌদামিনী স্ফুরিত হইতে লাগিল। শৃঙ্গের উপর শৃঙ্গ আসিয়া ভাঙিয়া পড়িল; দ্রোণিদেশ অধিত্যকায় উত্থিত হইল ও অধিত্যকা দ্রোণিদেশে নামিয়া গেল, অরণ্যানী

তাহাদিগকে ক্লান্ত ও অবসন্ন করিয়া দেয়, তাঁহাদের ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় পরাস্ত হইয়া যায়। তবে যিনি সৌভাগ্যক্রমে কোন একটী পুষ্করিণী কোন একটী অঙ্গের শোভা দর্শনে সফল হন তিনি সেই শোভা বর্ণনা করিয়াই আপনার কাজ শেষ হইল, মনে করেন। মহাভারতের অন্তর্গত শকুন্তলার উপাখ্যান, নলোপাখ্যান, সাবিত্রীর উপাখ্যান প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অলঙ্কার, সৌন্দর্য্য গৌরবে খাঁটি, সন্দেহ নাই, ইউরোপীয় সমালোচকেরা ঐ সকল উপাখ্যানের প্রশংসা করেন। কিন্তু আমরা জানি ঐ সকল অলঙ্কারের যতই সৌন্দর্য্য থাক, মহাকাব্যের বিশাল সৌন্দর্য্যের নিকট তাহা স্থান পায় না। কিন্তু ইউরোপীয় সমালোচকের লেখনী এই সকল অলঙ্কারের সমালোচনায় যেমন উদার হইয়া পড়ে মূল মহাকাব্যের প্রশংসায় তেমন উদারভাব দেখাইতে পারে না।

যাহা পড়িতে হয় না, তাহাই মহাকাব্য। মহাকাব্যের এই লক্ষণ-নির্দ্দেশের মর্ম্ম বোধ করি এতক্ষণে অনেকটা স্পষ্ট হইয়া থাকিবে। মহাকাব্য না পড়িলে চলিতেও পারে, কিন্তু যাহা মহাকাব্য নহে তাহা না পড়িলে একেবারেই চলে না। কালিদাস খুব বড় কবি, হয় ত ব্যাস বাল্মীকি হইতেও বড় কবি, কিন্তু তিনি মহাকাব্য লেখেন নাই। কুমারসম্ভব বুঝিতে হইলে তাহার নাম শুনিলে চলিবে না, তাহার অনুবাদ পড়িলে চলিবে না, তাহা হইলে যাহা কুমারসম্ভব তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া তাহার সহ টীকাটিপ্পনীসহ পড়িতে হইবে। নহিলে কুমারসম্ভব পড়াই হইল না। কালিদাসের ভাষা, কালিদাসের ছন্দ, কালিদাসের বর্ণন, কালিদাসের নিকটে না গেলে শুনিতে পাইবে না, দূর হইতে তাহার কিছুই বুঝিবে না। কালিদাস শিল্পী, তিনি পাথরের উপর পাথর বসাইয়া সৌধনির্ম্মাণ করিয়াছেন, সাদা ধপ্‌ধপে মার্ব্বেলের ইটের উপর ইট বসাইয়া দেয়াল তুলিয়াছেন, সেই দেয়ালের গায়ে মণিমাণিক্য মরকত-প্রবালের লতাপাতা কাটিয়া তাহাকে বিচিত্র শোভায় অলঙ্কৃত করিয়াছেন। তিনি তাজমহল গাঁথিয়াছেন, আল্‌হাম্‌রা গাঁথিয়াছেন, সেই সকল কারুশিল্পের শোভা দেখিতে হইলে নিকটে যাইতে হইবে। সকলেও সে শোভা দেখিবে না, সমজদারের চোখ লইয়া ও সমালোচকের রুচি লইয়া সেখানে যাইতে হইবে। নতুবা দেখিতে পাইবে না ও বুঝিতে পারিবে না।

শেক্সপীয়র হয় ত আরও বড় কবি, তাঁহার স্থান হয় ত হোমারেরও অনেক উচ্চে, কিন্তু তিনিও মহাকাব্য লেখেন নাই। গ্রীক কবির হেলেনকে আমরা চোখে দেখি নাই, তাঁহার নাম শুনিয়াছি মাত্র, কিন্তু যে রূপের আগুনে ট্রয়-নগর ভস্মীভূত হইয়াছিল, তাহা আমাদের কল্পনার নেত্রকেও অদ্যাপি ঝলসিয়া দিতেছে। কিন্তু শেক্সপীয়রের নায়িকাগণের সৌন্দর্য্য বুঝিতে হইলে কেবল নাম শুনিলে বা অনুবাদ পড়িলে চলিবে না, তাহাদিগকে নিকটে গিয়া স্বচক্ষে দেখিতে হইবে, সমজদারের চোখ লইয়া দেখিতে হইবে। শেক্সপীয়রের ভাষা, তাঁহার ছন্দ, তাঁহার ধ্বনি হইতে দূরে থাকিয়া শেক্সপীয়রকে চিনিবার আশা করা যায় না। এক-একবার মনে হয় বটে, শেক্সপীয়রের

তাহার বিপুল সৌন্দর্যের উপভোগের অবকাশ থাকে না। সেইজন্যই বোধ হয়, মহাসমারোহে শেক্‌স্‌পীয়ার জন্মিয়াছেন, কালিদাস জন্মিয়াছেন, কিন্তু হোমার জন্মান নাই বা বাল্মীকি জন্মান নাই। ইহাতে মনুষ্যজাতির ক্ষতি কি লাভ, তাহা গণনার অবসর লেখকের নাই। আমরা যাহা পাইয়াছি, তাহাতেই আমাদিগকে তুষ্ট থাকিতে হইবে। সংসারের স্রোত উল্টাইবার ক্ষমতা আমাদের নাই। আমরা সহস্র চেষ্টা করিলেও মহাকবির উৎপাদন সমর্থ হইব না। তবে কাল নিরবধি ও পৃথ্বী বিপুলা; আবার যদি কখনও স্রোতে মহাকবির উৎপত্তি ঘটে, তাহাতেও আমরা বিস্মিত হইব না।

[বঙ্গদর্শন (নবপর্যায়), ১৩০৯]

সাহিত্য-সমালোচনা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঘরে বসিয়া আনন্দে যখন হাসি এবং দুঃখে যখন কাঁদি, তখন এ কথা কখনো মনে উদয় হয় না যে আরও একটু বেশি করিয়া হাসা দরকার বা কান্নাটা ওজনে কিছু কম পড়িয়াছে। কিন্তু পরের কাছে যখন আনন্দ বা দুঃখ দেখানো আবশ্যক হইয়া পড়ে, তখন মনের ভাবটা সত্য হইলেও বাহিরের প্রকাশটা সম্পূর্ণ তাহার অনুযায়ী না হইতে পারে।

এমন কি, মা-ও যখন সশব্দ বিলাপে পল্লীর নিদ্রা-তন্দ্রা দূর করিয়া দেয়, তখন সে যে কেবলমাত্র পুত্রশোক প্রকাশ করে তাহা নয়,—পুত্রশোকের গৌরব প্রকাশ করিতেও চায়; নিজের কাছে দুঃখ-সুখ প্রমাণ করিবার কোন প্রয়োজন হয় না—পরের কাছে তাহা প্রমাণ করিতে হয়। সুতরাং শোক প্রকাশের জন্য যেটুকু শব্দ স্বাভাবিক, শোক প্রমাণের জন্য তাহার চেয়ে সুর চড়াইয়া না দিলে চলে না।

ইহাকে কৃত্রিমতা বলিয়া উড়াইয়া দিলে অন্যায় হইবে। শোক-প্রমাণ শোক-প্রকাশের একটি স্বাভাবিক অঙ্গ। আমার ছেলের মূল্য যে কেবল আমারই কাছে বেশি, তাহার বিচ্ছেদ যে কতখানি সাংঘাতিক ব্যাপার, তাহা পৃথিবীর আর কেহই যে বুঝিবে না—তাহার অভাব-সত্ত্বেও পৃথিবীর আর সকলেই যে অনায়াসে স্বচ্ছন্দ-চিত্তে আহার-বিহার ও আপিস যাতায়াতে প্রবৃত্ত থাকিবে,—শোকাতুর মাতাকে তাহার পুত্রের প্রতি জগতের এই অবজ্ঞা আঘাত করিতে থাকে। তখন সে নিজের শোকের প্রবলতার দ্বারা এই ক্ষতির প্রাচুর্যকে বিশ্বের কাছে ঘোষণা করিয়া তাহার পুত্রকে যেন গৌরবান্বিত করিতে চায়।

যে অংশে শোক নিজের, সে অংশে তাহার একটি স্বাভাবিক সংযম থাকে; যে অংশে তাহা পরের কাছে ঘোষণা, তাহা অনেক সময়েই সঙ্গতির সীমা লঙ্ঘন করে। পরের অসাড় চিত্তকে নিজের শোকের দ্বারা বিচলিত করিবার স্বাভাবিক ইচ্ছায় তাহার চেষ্টা অস্বাভাবিক উদ্যম অবলম্বন করে।

কেবল শোক নহে, মানুষের অধিকাংশ হৃদয়-ভাবেরই এই দুইটা দিক্ই আছে,—একটা নিজের জন্য, একটা পরের জন্য। আমার হৃদয় ভাবকে সাধারণের হৃদয় ভাব করিতে পারিলে তাহাতে একটা সান্ত্বনা, একটা গৌরব আছে। আমি যাহাতে বিচলিত তুমি তাহাতে উদাসীন,—ইহা আমাদের কাছে ভাল লাগে না, কারণ, নানা লোকের কাছে প্রমাণিত না হইলে সত্যতার প্রতিষ্ঠা হয় না। আমিই যদি আকাশকে হলদে দেখি, আর দশ জনে না দেখে, তবে তাহাতে আমার ব্যাধিই সপ্রমাণ হয়। সেটা আমারই দুর্ব্বলতা।

আমার হৃদয়বেদনা পৃথিবীর যত বেশি লোক সমবেদনায় অনুভব করিবে, ততই তাহার সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হইবে। আমি যাহা একান্তভাবে অনুভব করিতেছি তাহা যে আমার দুর্ব্বলতা, আমার ব্যাধি, আমার পাগলামি নহে, তাহা যে সত্য, ইহা সর্ব্ব-সাধারণের হৃদয়ের মধ্যে প্রমাণিত করিয়া আমি বিশেষভাবে সান্ত্বনা ও সুখ পাই।

যাহা সাদা, তাহা দশ জনের কাছে সাদা বলিয়া প্রচার করা কঠিন নহে, কিন্তু যাহা আমার কাছে সুখ বা দুঃখ, প্রিয় বা অপ্রিয়, তাহা দশ জনের কাছে সুখ বা দুঃখ, প্রিয় বা অপ্রিয় বলিয়া প্রতীত করা দুরূহ। সে অবস্থায় নিজের ভাবকে কেবলমাত্র প্রকাশ করিলেই খালাস পাওয়া যায় না, নিজের ভাবকে এমন করিয়া প্রকাশ করিতে হয়, যাহাতে পরের কাছেও তাহা যথার্থ বলিয়া অনুভূত হইতে পারে।

সুতরাং এইখানেই বাড়াবাড়ি হইবার সম্ভাবনা। দূর হইতে যে জিনিষটা দেখাইতে হয়, তাহা কতকটা বড় করিয়াই দেখানো আবশ্যক। সেটুকু বড়, সত্যের অনুরোধেই করিতে হয়, নহিলে জিনিষটা যে পরিমাণে ছোট দেখায়, সেই পরিমাণেই মিথ্যা দেখায়। বড় করিয়াই তাহাকে সত্য করিতে হয়।

আমার সুখদুঃখ আমার কাছে অব্যবহিত, তোমার কাছে তাহা অব্যবহিত নয়। আমি হইতে তুমি দূরে আছ। সেই দূরত্বটুকু হিসাব করিয়া আমার কথা তোমার কাছে কিছু বড় করিয়াই বলিতে হয়।

সত্যরক্ষাপূর্ব্বক এই বড় করিবার ক্ষমতায় সাহিত্যকারের যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়। যেমনটি ঠিক, তেমনি লিপিবদ্ধ করা সাহিত্য নহে, কারণ প্রকৃতিতে যাহা দেখি, তাহা আমার কাছে প্রত্যক্ষ, আমার ইন্দ্রিয় তাহার সাক্ষ্য দেয়। সাহিত্যে যাহা দেখায়, তাহা প্রাকৃতিক হইলেও তাহা প্রত্যক্ষ নহে। সুতরাং সাহিত্যে সেই প্রত্যক্ষতার অভাব পূরণ করিতে হয়।

প্রাকৃত-সত্যে এবং সাহিত্য-সত্যে এইখানেই তফাৎ আরম্ভ হয়। সাহিত্যের মা যেমন করিয়া কাঁদে, প্রাকৃত-মা তেমন করিয়া কাঁদে না। তাই বলিয়া সাহিত্যের

মার কান্না মিথ্যা নহে। প্রথমত, প্রকৃত-রোদন এমন প্রত্যক্ষ যে, তাহার বেদনা আকারে, ইঙ্গিতে, কণ্ঠস্বরে, চারিদিকের দৃশ্যে এবং শোকঘটনার নিশ্চয় প্রমাণে আমাদের প্রতীতি ও সমবেদনা উদ্রেক করিয়া দিতে বিলম্ব করে না। দ্বিতীয়ত, প্রকৃত মা আপনার শোক সম্পূর্ণ ব্যক্ত করিতে পারে না, সে ক্ষমতা তাহার নাই, সে অবস্থাও তাহার নয়।

এই জন্যই সাহিত্য ঠিক প্রকৃতির আরশি নহে। কেবল সাহিত্য কেন, কোনো কলাবিদ্যাই প্রকৃতির যথাযথ অনুকরণ নহে। প্রকৃতিতে প্রত্যক্ষকে আমরা প্রতীতি করি, সাহিত্য এবং ললিতকলায় অপ্রত্যক্ষ আমাদের কাছে প্রতীয়মান। অতএব এ স্থলে একটি অপরটির আরশি হইয়া কোন কাজ করিতে পারে না।

এই প্রত্যক্ষতার অভাববশত সাহিত্যে ছন্দোবন্ধ ভাষাভঙ্গীর নানাপ্রকার কলবল আশ্রয় করিতে হয়। এইরূপে রচনার বিষয়টি বাহিরে কৃত্রিম হইয়া অন্তরে প্রাকৃত অপেক্ষা অধিকতর সত্য হইয়া উঠে।

এখানে 'অধিকতর সত্য' এই কথাটি ব্যবহার করিবার বিশেষ তাৎপর্য আছে। মানুষের জগৎ-সম্বন্ধে প্রাকৃত-সত্য জড়িত মিশ্রিত, ভগ্নখণ্ড, ক্ষণস্থায়ী। সংসারের ঢেউ ক্রমাগতই ওঠাপড়া করিতেছে—দেখিতে দেখিতে একটার ঘাড়ে আর একটা আসিয়া পড়িতেছে; তাহার মধ্যে প্রধান-অপ্রধানের বিচার নাই—তুচ্ছ ও অসামান্য গায়ে গায়ে ঠেলাঠেলি করিয়া বেড়াইতেছে। প্রকৃতির এই বিরাট রঙ্গশালায় যখন মানুষের ভাবাভিনয় আমরা দেখি, তখন আমরা স্বভাবতই অনেক বাদ-সাদ দিয়া বাছিয়া লইয়া, আন্দাজের দ্বারা অনেকটা ভর্তি করিয়া, কল্পনার দ্বারা অনেকটা গড়িয়া তুলিয়া থাকি। আমাদের একজন পরমাত্মীয়ও তাঁহার সমস্তটা লইয়া আমাদের কাছে পরিচিত নহেন। আমাদের স্মৃতি নিপুণ সাহিত্য-রচয়িতার মত তাঁহার অধিকাংশই বাদ দিয়া ফেলে। তাঁহার ছোটোবড়ো সমস্ত অংশই যদি ঠিক সমান অপক্ষপাতের সহিত আমাদের স্মৃতি অধিকার করিয়া থাকে, তবে এই স্তূপের মধ্যে আসল চেহারাটি মারা পড়ে ও সবটা রক্ষা করিতে গেলে আমাদের পরমাত্মীয়কে আমরা যথার্থভাবে দেখিতে পাই না। পরিচয়ের অর্থই এই যে যাহা বর্জন করিবার তাহা বর্জন করিয়া যাহা গ্রহণ করিবার তাহা গ্রহণ করা।

একটু বাড়াইয়াও লয়। আমাদের পরমাত্মীয়কেও আমরা কল্পনার উপরে অনেকটা গড়িয়া থাকি। তাঁহার জীবনের অধিকাংশ আমাদের অগোচর। আমরা তাঁহার ছায়া নহি, আমরা তাঁহার অন্তর্যামীও নহি। তাঁহার যে অনেকখানিই আমরা দেখিতে পাই না, সেই শূন্যতার উপরে আমাদের কল্পনা কাজ করে। ফাঁক পূরাইয়া লইয়া আমরা মনের মধ্যে একটা পূর্ণ ছবি আঁকিয়া তুলি। যে লোকের সম্বন্ধে আমাদের কল্পনা খেলে না, যাহার ফাঁক আমাদের কাছে ফাঁক থাকিয়া যায়, যাহার প্রত্যক্ষগোচর অংশই আমাদের কাছে বর্তমান, অপ্রত্যক্ষ অংশ আমাদের কাছে অস্পষ্ট—অগোচর, তাহাকে আমরা জানি না অল্পই জানি। পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষই এইরূপ আমাদের

বুঝিতেছি, কথাটা বেশ ঝাপসা হইয়া আসিয়াছে, আর একটু পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করিব কৃতকার্য হইব কি না, জানি না।

আমরা আমাদের অন্তরের মধ্যে দুইটি অংশের অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারি,—একটা অংশ আমার নিজত্ব আর একটা অংশ আমার মানবত্ব। আমার ঘরটা যদি সচেতন হইত তবে সে নিজের ভিতরকার খণ্ডাকাশ ও তাহারই সহিত পরিব্যাপ্ত মহাকাশ এই দুইটাকে খানিকের মত উপলব্ধি করিতে পারিত। আমাদের ভিতরকার নিজত্ব ও মানবত্ব সেই প্রকার। যদি দুয়ের মধ্যে দুর্ভেদ্য দেয়াল তোলা থাকে তবে আত্মা অন্ধকূপের মধ্যে বাস করে।

প্রকৃত সাহিত্যকারদের অন্তঃকরণে যদি তাহার নিজত্ব ও মানবত্বের মাঝখানে কোন ব্যবধান থাকে, তবে তাহা কল্পনার কাচের মত স্বচ্ছ ব্যবধান। তাহার মধ্য দিয়া পরস্পরের চেনাপরিচয়ের ব্যাঘাত ঘটে না। এমন কি এই কাচ দূরবীক্ষণ ও অণুবীক্ষণের কাচের কাজ করিয়া থাকে—ইহা অদৃশ্যকে দৃশ্য, দূরকে নিকট করে।

সাহিত্যকারদের সেই মানবত্বই অমরতা। লেখকের নিজত্বকে সে আপনার করিয়া লয় অনিত্যকে সে অমর করিয়া তোলে, খণ্ডকে সে সম্পূর্ণতা দান করে।

জগতের উপরে মনের কারখানা বসিয়াছে এবং মনের উপরে বিশ্বমনের কারখানা—সেই উপরের তলা হইতে সাহিত্যের উৎপত্তি।

পূর্বেই বলিয়াছি, মনোরাজ্যের কথা আসিয়া পড়িলে সত্যতা বিচার করা কঠিন হইয়া পড়ে। কালোকে কালো প্রমাণ করা সহজ, কারণ অধিকাংশের কাছেই তাহা নিশ্চয় কালো, কিন্তু ভালকে ভাল প্রমাণ করা তেমন সহজ নহে, কারণ এখানে অধিকাংশের একমত সাক্ষ্য সংগ্রহ করা কঠিন

এখানে অনেকগুলি মুস্কিলের কথা আসিয়া পড়ে। অধিকাংশের কাছেই যাহা ভাল, তাহাই কি সত্য ভাল—না, বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের কাছে যাহা ভাল, তাহাই সত্য ভাল?

যদি বিজ্ঞানের কথা ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তবে প্রাকৃতবস্তুসম্বন্ধে এ কথা নিশ্চয় বলিতে হয় যে, অধিকাংশের কাছে যাহা কালো, তাহাই সত্য কালো। পরীক্ষার দ্বারা দেখা গেছে এ সম্বন্ধে মতভেদের সম্ভাবনা এত অল্প যে, অধিক সাক্ষ্য সংগ্রহ করিবার কোন প্রয়োজন হয় না।

কিন্তু ভাল যে তাহাই এবং কত ভাল, তাহা লইয়া মতের এত অনৈক্য ঘটিয়া থাকে যে, সে সম্বন্ধে কিরূপ সাক্ষ্য লওয়া উচিত, তাহা স্থির করা কঠিন।

বিশেষ কঠিন এই জন্য, সাহিত্যকারদের শ্রেষ্ঠ চেষ্টা কেবল বর্তমান কালের জন্য নহে। চিরকালের মনুষ্য-সমাজই তাঁহাদের লক্ষ্য। যাহা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালের জন্য লিখিত, তাহার অধিকাংশ সাক্ষী ও বিচারক বর্তমান কাল হইতে কেমন করিয়া মিলিবে?

কিন্তু আপনি সেই ভিখারীই আছেন, এবং শ্মশানের ছাই অঙ্গে মাখিয়া থাকেন; আমার সমস্ত শক্তি আপনার নিকট পরাজিত।"

এই দেব মাহাত্ম্য, ত্যাগের এই উন্নত আদর্শ জনসাধারণ ততটা বুঝিতে পারে না; কিন্তু তাহারা ভোগের দেবতাদের প্রভাব ও ইঁহাদের প্রত্যক্ষ ঐশ্বর্য্যের মাহাত্ম্য অনুভব করিতে পারে। পরবর্ত্তী শিবায়নগুলিতেও শিব অপেক্ষা চণ্ডীর মাহাত্ম্য বিশেষরূপে পরিব্যক্ত হইয়াছে। সুতরাং তাহা খাঁটি শিব-সঙ্গীত নহে।

প্রাচীন সাহিত্যে বর্ণিত মনসা, চণ্ডী, শীতলা প্রভৃতি দেবতাদিগের কার্য্যকলাপ সর্ব্বত্র শোভনভাবে বর্ণিত হয় নাই। মনসা দেবী লক্ষ্মীন্দরের লৌহবাসরে সর্প-প্রবেশযোগ্য একটি ছিদ্র রাখিবার জন্য গৃহ নির্ম্মাতা কারিগরকে অনুরোধ করিতেছেন; কখনও বা চাঁদ সদাগরের সংগৃহীত ভিক্ষার ঝুলির তণ্ডুল-কণা নষ্ট করিবার জন্য গণেশের নিকট মূষিক ভিক্ষা করিতেছেন, চাঁদ সদাগরকে বিপদে ফেলিবার জন্য কখনও বা হনুমানকে সমুদ্রে ঝড় উঠাইবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন। চণ্ডীদেবীও নানা সূত্রে ধনপতি ও শ্রীমন্তকে বিপন্ন করিতেছেন। ভক্তের মঙ্গলার্থ উঁহারা যে সকল ক্রিয়া-কলাপে প্রবৃত্ত হইতেছেন, তাহা সর্ব্বত্র শোভন বা মর্য্যাদাযুক্ত হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

কিন্তু বিষয়টি অন্য ভাবেও আলোচনীয়। জনসাধারণের বিশ্বাস কতক পরিমাণে অনাহত থাকিবেই — ইঁহাদের জন্যই এই সকল পুস্তক লিখিত হইয়াছিল। এই জন্য এই সকল রচনার সর্ব্বত্র সুরুচি ও সুভাব রক্ষিত হয় নাই। পাঠক প্রাচীন রচনায় সর্ব্বত্র খাঁটি সোনার প্রত্যাশা করিবেন না। আকরের স্বর্ণে যেরূপ অন্য ধাতুর মিশ্রণ থাকে, খাদ বর্জ্জন করিয়া তবে খাঁটি সোনার উদ্ধার করিতে হয়, তেমনই এই দেব-উপাখ্যানের মধ্যেও একটি উজ্জ্বল সত্য আছে তাহা লক্ষ্য করিতে হইবে। চণ্ডী, মনসা প্রভৃতি দেবতার পূর্ব্বোক্ত ক্রিয়াকলাপের মধ্যে একটা সার্ব্বজনীন প্রাচুর্য্য আছে,— তাহা সন্তানের জন্য মাতৃ-হৃদয়ের ব্যাকুলতা। উপায় ও কার্য্যপ্রণালীতে উচ্চ নীতির সঙ্গতি থাকুক আর না থাকুক, সন্তান কষ্টে পড়িলে মাতা যেরূপ নানা উপায়ে তাহাকে রক্ষা করিতে উদ্যত হন, এই সকল দেবতার বিচিত্র কার্য্য সেই প্রকার সর্ব্বত্রই মাতৃ-ভাব-প্রণোদিত।

এক দিকে বেদান্ত-মূলক শৈবধর্ম্ম নির্গুণ উপাস্য তত্ত্ব। তাহা যতই উচ্চ হউক না কেন, সাধারণ লোকে তাহাতে প্রত্যক্ষ ও সগুণ দেবতার প্রতি অচলা ভক্তি, তৃপ্তি পায় নাই। অপর দিকে অশোভন প্রণালীতে পরিব্যক্ত হইলেও, বেদান্তের সূক্ষ্ম তত্ত্ব ও শৈবধর্ম্মের ত্যাগের মহিমা সকলের আয়ত্ত নহে; তাহার স্থলে ভক্ত দুর্ব্বল, অসহায় ও পাপী তাপী হইলেও, শরণ লইবামাত্র তাহার জন্য দেবতার ক্রোড় প্রসারিত হয়, এই বিশ্বাস সাধারণের চিত্তে এক অভূতপূর্ব্ব শান্তির সৃষ্টি করিয়াছিল। পদ্মাপুরাণ, শীতলা-মঙ্গল, হরিলীলা, চণ্ডী-মঙ্গল প্রভৃতি কাব্যোক্ত দেবতার উপাখ্যান এই ভাবে দেখিলে অনেক বিসদৃশ প্রশ্নের মীমাংসা হইতে পারে।

এই কথা-সাহিত্যের আলোচনা করিলে আর একটী বিষয়েও দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। অতি-প্রাচীন সাহিত্যে বরং পুরুষ চরিত্রগুলিতে কতকটা পৌরুষ দৃষ্ট হয়, কিন্তু তাহার উন্নতির সহিত এই কথা-সাহিত্যের অঙ্গ ও কাব্যগুলি যতই শ্রীবৃদ্ধি-সম্পন্ন হইতে লাগিল, ততই কাব্য নায়কগণের চরিত্র খর্ব্ব ও হীনতার বর্ণে চিত্রিত হইতে লাগিল। বঙ্গদেশে পৌরুষ ও চরিত্র-বলের যে অধোগতি হইয়াছে, প্রাচীন-সাহিত্যের আলোচনা করিলেও তাহা সপ্রমাণ হয়।

কবিগণ যে সকল উপকরণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তদ্দ্বারা কাব্যনায়কগণের চরিত্র অতি উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত করিতে পারিতেন। কিন্তু কাব্যে তাহার বিপরীত হইয়াছে।

মনসার ভাসানে চাঁদ সদাগরের চরিত্রের যে আভাস আছে তাহাতে ইহাকে পুরুষকারের জীবন্ত উদাহরণ বলিয়া মনে হয়। মনসাদেবীর ক্রোধে ইহার গুয়াবাড়ীর ধ্বংস হইল, একটি একটি করিয়া ছয়টি পুত্র সর্পদংশনে প্রাণত্যাগ করিল, সপ্ত ডিঙ্গা ও সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ 'মধুকর' জলযান দেবীর কোপে কালীদহে ডুবিয়া গেল,—চাঁদ সদাগর একটিবার বাম হস্তে মনসার পদে অঞ্জলি দিলেই এই সকল উৎপাতের অবসান হইত। তখনও যদি সদাগর সম্মত হইতেন, তাহা হইলে মনসার কৃপায় মৃত পুত্রগণের পুনর্জ্জীবন ও নষ্ট বৈভবের পুনরুদ্ধার হইত। কিন্তু চাঁদ সদাগরের পণ বজ্র-কঠিন। কালীদহের আবর্ত্তে পড়িয়া চাঁদ মৃতকল্প, সুবিস্তৃত-পত্র-সঙ্কুল পদ্ম-লতা দেখিয়া আশ্রয়ের জন্য চাঁদ হস্ত প্রসারণ করিয়াছেন, কিন্তু মনসার এক নাম পদ্মা, ইহা স্মরণ হইবামাত্র নামের সংস্রব-হেতু চাঁদ ঘৃণায় হস্ত প্রত্যাবর্ত্তিত করিয়া মরিতে প্রস্তুত হইলেন। তিন দিন অনাহারের পর চাঁদ শিশুবন্ধু চন্দ্রকেতুর গৃহে আহার করিতে বসিয়াছেন এমন সময়ে শুনিতে পাইলেন, চন্দ্রকেতুর গৃহে মনসাদেবীর ঘট স্থাপিত আছে, তখন কিছুমাত্র না খাইয়া সবেগে বন্ধুগৃহ হইতে প্রস্থান করিলেন। সর্ব্বাপেক্ষা কঠোর বিপদ উপস্থিত হইল। সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র, শোকসন্তপ্তা সনকা-রাণীর অঞ্চলের ধন লক্ষ্মীন্দরের সর্পদংশনে মৃত্যু হইল। কিন্তু চাঁদ সদাগরের সঙ্কল্প অটুট রহিল। এরূপ বীরপুরুষের মর্য্যাদাও প্রাচীন কবিগণ কিছুমাত্র রক্ষা করিতে পারেন নাই। বরং নারায়ণ দেব ও বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণে চাঁদ সদাগরের চরিত্রবলের সম্মান কথঞ্চিৎ প্রদর্শিত হইয়াছে, কিন্তু কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ প্রভৃতি পরবর্ত্তী কবিগণ এই তেজস্বী চরিত্রকে উপহাসাস্পদ করিয়া তুলিয়াছেন।—যখন তিনি কালীদহে পতিত হইয়াছেন, তখন তাঁর বর্ণনা করিয়াছেন,—"ঢোকে ঢোকে জল খায় চাঁদ অধিকারী।' চন্দ্রকেতুর আলয় হইতে যখন তিনি সবেগে উঠিয়া যাইলেন তখনকার বর্ণনা এইরূপ,—

"পাগল দেখিয়া ডাকে, কেহ ঢোকা ছুঁড়ি মারে,
কেহ মারে মাথায় ঠোকর।"

ফুল্লরার চরিত্রেও সেই উজ্জ্বল পবিত্রতা। দরিদ্র ব্যাধগৃহে ভেরাণ্ডার খাম, তাহা কাল-বৈশাখীর প্রতাপে ভাঙ্গিয়া পড়ে। গ্রীষ্মকালের দারুণ রৌদ্রে পথের বালি উত্তপ্ত হয়, পা পুড়িয়া যায়, ফুল্লরা মাংসের পসরা মাথায় করিয়া হাটে হাটে পর্যটন করে। শীতকালে পুরাতন খোসলাপাটানি গায়ে দিতে শত স্থান ছিন্ন হয়, বনে তখন শাক পাওয়া যায় না। ফুল্লরার তাল-পত্রের ছাউনী ভাঙ্গা কুঁড়েতে একখানি মাটিয়া পাথর পর্যন্ত নাই, গর্ত করিয়া আমানি রাখিতে হয়। কখনও পসরা মাথায় করিয়া পরিশ্রান্ত ফুল্লরা ক্ষুধায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, যদি বা কোথাও মাংসের পসরা নামাইয়া পুকুরের জল খাইতে গিয়াছে অমনই চিলে আধা আধি মাংস সাবাড় করিয়া ফেলিয়াছে। আশ্বিন মাসে যখন বঙ্গের ঘরে ঘরে উৎসব, তখন দুঃখিনী ফুল্লরার মাংসের বিক্রয় নাই, কারণ, সকলে দেবীর প্রসাদমাংস লাভ করিতে ফুল্লরার পসার কে কিনিবে? সেই সময়ে চতুর্দিকে আনন্দের চিত্র,—নববস্ত্র-পরিহিত নরনারী আমোদে মত্ত, ফুল্লরা তখন অভাবে হরিণের ছাল পরিয়া থাকিত। বসন্তকালে প্রেমাবেশে যুবক ও যুবতীরা সুখাভিলাষী, ফুল্লরা ক্ষুধার জ্বালায় কুঁড়ে-ঘরে ছট্‌ফট্‌ করিত। এই তাহার বার মাসের কথা। কিন্তু যে দিন ষোড়শীরূপিণী চণ্ডী অতুল ঐশ্বর্য্য প্রলুব্ধ করিয়া দুঃখিনী ব্যাধরমণীর স্বামিপ্রেমের পরীক্ষা প্রার্থনা করিলেন, সে দিন দেখা গেল, স্বামিপ্রেমের তুলনায় কুবেরের অতুল ঐশ্বর্য্যও অতি অকিঞ্চিৎকর। ফুল্লরা যে প্রেমের সৌভাগ্যে দুঃসহ দারিদ্র্য মাথায় বহন করিয়া লইয়াছিল তাহাতেই তাহার মনের বল ও সেই প্রেমের কণামাত্র হানি হইলে সে ক্ষীণবৃন্ত হইয়া পড়ে। এইরূপ নারী চরিত্র হিন্দু কবির কাব্য ভিন্ন অন্যত্র সুলভ নহে।

খুল্লনা অতি তরুণবয়স্কা। এই বয়সেই নারী প্রথম ভালবাসার আস্বাদ পাইয়া থাকে। কবিকঙ্কণ কেলি-বাগিচার মধ্যে যত্নে আনিয়া চম্পক ও কাঞ্চন কুসুমের পার্শ্বে এই কাঞ্চনপ্রতিমাকে স্থাপন করিয়া কাব্যের শোভা বাড়াইয়াছেন। সেখানে সে শুককে ভ্রমরকে বলিতেছে যে যদি ফিরিয়া গুঞ্জন করে তবে ননদীর মাথা খাইবে—এই শপথ। কোকিলকে বলিতেছে, দূরে গৌড় দেশ, সেখানে তাহার স্বামী আছে, সেইখানে যাইয়া কোকিল কেন ডাকে না? অশোকবৃক্ষকে লতাবেষ্টিত দেখিয়া সে লতাকে সৌভাগ্যবতী মনে করিতেছে, এবং 'সই' বলিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিতেছে। এই নায়িকা শুধু কাব্যের উপযোগিনী নহে, ইহাকে সুগৃহিণী ও সন্তানবৎসলা রূপে পরিণত করিয়া কবি ক্ষান্ত হইয়াছেন। যেখানে খুল্লনার ছেলে পাঠশালায় উৎপাত করিতেছে, এবং কৃষ্ণকর্ণ তাহাকে গালি দিতেছে সেই সময় ইহার দুঃখমলিন মুখখানি আমাদিগকে বেদনা প্রদান করে। আর যে দিন সর্বশী ছাগলকে শৃগালে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে লহনা জানিতে পারিলে তাহাকে মারিয়া খুন করিয়া ফেলিবে, এই আশঙ্কায় ও কষ্টে খুল্লনা চণ্ডীর শরণ লইতেছে, সেই দিন তাহার চিত্রখানি ভক্তিগঙ্গায় অবগাহন করিয়া উজ্জ্বলতর হইয়াছে, তাহার কষ্ট সত্ত্বেও সেদিন আর তাহাকে কৃপা করা যায় না। ইহার পরে আর এক দৃশ্য,—খুল্লনা স্বামী ও

জ্ঞাতিবর্গের ভোজনের জন্য রন্ধন করিতেছে, রন্ধনশালার খুল্লনা অন্নপূর্ণারূপিণী, এবং যখন স্বামী জ্ঞাতিবর্গকে নিরস্ত করিবার জন্য উৎকোচদানে উদ্যত, তখন গর্বিতা সাধ্বী স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া উৎকট পরীক্ষা দিতেছে, তখন খুল্লনা আমাদের নমস্যা হইয়াছে। তখন আর কৃপা করা যায় না।

অপর দিকে কাপাড়া ও কলিঙ্গার যুদ্ধে গর্ব্ব ও তেজ ফুটিয়া উঠিয়াছে। ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যগুলি বঙ্গেতিহাসের সুদূর অধ্যায়ের ইঙ্গিত করিতেছে, সে অধ্যায় ঐতিহাসিক যুগের পূর্ব্ববর্তী—তাম্রশাসন ও প্রস্তরলিপির যুগ। তখন বঙ্গীয় বীরগণ দিগ্বিজয়ী যোদ্ধা ছিলেন, গৌড়েশ্বর পালরাজন্যগণের আদেশে তখন এক দিকে কামরূপের ও অপর দিকে উড়িষ্যার [illegible] এক পতাকার নিম্নে সমবেত হইতেন। বঙ্গীয় মহিলাগণের তখন কবি-বর্ণিত কটাক্ষ-সন্ধানই একমাত্র উপজীব্য ছিল না। তাঁহারা ধনুর্ব্বাণ লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেন। কাপাড়ার যুদ্ধকে আমরা কেবল কাব্য-কথা বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারি না। দুর্গাবতী, ঝাঁসীর রাণী প্রভৃতির ছবি তখনও বঙ্গদেশ হইতে লুপ্ত হয় নাই।

সুতরাং প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য দেবলীলা ও অলৌকিকত্বের দ্বারা অভিভূত হইয়া পুরুষ-চরিত্রের গৌরব লুপ্ত হইলেও, রমণী-চরিত্রের মহিমা সুচিত্রিত হইয়াছিল। যাঁহারা সন্তুষ্টচিত্তে স্বামীর চিতানলে আত্মোৎসর্গ করিতেন, সীতা-সাবিত্রীর পবিত্র উপাখ্যান শ্রবণ করিতেন, এবং নানা প্রকার পারিবারিক দুঃখ ও অত্যাচার সহ্য করিয়া সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্ত্তিতে পরিণত হইয়াছিলেন, কবিগণ তাঁহাদের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই।

ক্রমে যখন কবিগণ হিন্দু অন্তঃপুরের আদর্শ ত্যাগ করিয়া মুসলমান কবির বর্ণিত জেনানার বিলাস ও লালসার সূচক চিত্রের দ্বারা অধিকতর অনুপ্রাণিত হইলেন, তখন হীরা মালিনী ও বিদ্যার ন্যায় উপনায়িকা ও নায়িকাগণের সৃষ্টি হইল। কিন্তু তখনও এ দেশের তেজস্বিনী সাধ্বীগণের প্রভাব বঙ্গসাহিত্য হইতে নির্বাসন গ্রহণ করে নাই। কৃষ্ণচন্দ্র ও রাজবল্লভের মুসলমানী দরবারের আদর্শে গঠিত রাজসভা হইতে দূরে পল্লী-কবিগণ ‘কবি’ ও যাত্রাসঙ্গীতে উমা, মেনকা, যশোদা প্রভৃতির চিত্রে এ দেশের অন্তঃপুরবাসিনীগণের ছায়া পুনঃপুনঃ প্রতিভাত করিয়াছেন। কিন্তু তাহা কথা-সাহিত্যের অন্তর্গত নহে।

[সাহিত্য, ১৩১৫]

নাট্যকার

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

মানব-হৃদয় স্পর্শ করা কলাবিদ্যার উদ্দেশ্য। কিন্তু ভিন্ন দেশে তাহার আকার কতক পরিমাণে ভিন্ন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কলাবিদ্যার পার্থক্য লইয়া আমরা আলোচনা করিয়া থাকি। অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারি যে, পাশ্চাত্যে বা প্রাচ্যে দেশ-ভেদে বিভিন্নতা। এমন কি, ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডে বিভিন্নতা দেখা যায়। কবিতা, চিত্রপট, সঙ্গীত সকলই কিঞ্চিৎ ভিন্ন। তাহার কারণ বোধ হয়, ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির ছবি। নির্জন মরু প্রান্তরবাসী ইস্মাইলবাদের হৃদয়-তার—কুজ্ঝটিকাবৃত ঝটিকা-আলোড়িত, তমাচ্ছন্ন পর্বত-গুহা-নিবাসী কণ্ঠ হইতে অবশ্যই ভিন্ন। স্কচের সঙ্গীতে বিষাদ-ছায়া নিশ্চয় পতিত হইবে। সেইরূপ ইটালিতে হর্ষোৎফুল্ল তান প্রতিফলিত হইতে থাকিবে। চিত্তবিনোদন কাশ্মীর-প্রকৃতি-শোভা কালিদাসের কবিতা সুললিত করিয়াছে—নাটকেও কাটাকাটি, হানাহানি নাই। কিন্তু সেক্সপিয়ার উচ্চ কবি হইলেও তাঁহার উৎকৃষ্ট নাটকসকল বিয়োগান্তমিশ্রিত ঘোর ভীষণতাপূর্ণ। এক দেশের নাটক অপর দেশের নাটকের সহিত তুলনায় সমালোচিত হইতে পারে না। দার্শনিক জার্ম্মান সিলার নাটকে ভাবের বিবিধ অবতারণা করিয়া উচ্চ "জোয়ান অফ্ আর্ক" নাটক রচনা করিয়াছেন, কিন্তু সে ভাবে সেক্সপিয়ারের নাটক রচিত নয়। পশুযুদ্ধ আনন্দপ্রিয় স্পেনের নাটক নিষ্ঠুরতাপূর্ণ। ফরাসী-বিপ্লবের অগ্রগামী ও পশ্চাদ্বর্ত্তী নাটকসকল প্রায়ই বিপ্লবের ভীষণতায় পরিপূর্ণ। সেক্স-পিয়ারের 'টেম্পেষ্ট' নাটকের সহিত কালিদাসের 'শকুন্তলা' নাটকের বার বার তুলনা হইয়া থাকে। কিন্তু 'টেম্পেষ্ট' বায়ু-বিহারী দেবী ও কুহক-আশ্রয়ে রচিত, 'শকুন্তলা' ঋষির অভিশাপ ও অঙ্গুরীর পুনঃ ভিত্তি-স্থাপিত। এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত সপ্রমাণ করা যায় যে, ভিন্ন দেশে ভিন্ন মস্তিষ্ক-প্রসূত নাটক ভিন্ন ভাবাপন্নই হইয়া থাকে; এবং এক দেশেই সময়-বিশেষে নাটকেরও বিশেষত্ব হয়। যথা—এলিজাবেথের সময়ের নাটকসকল দ্বিতীয় চার্লস-এর সমসাময়িক নাটক হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সকল বস্তুই দেশকাল-পাত্র উপযোগী। সেই হেতু ভিন্ন দেশের বা ভিন্ন সময়ের নাটক সুপাঠ্য হইলেও তাঁহার অনুকৃত রচনা আদরণীয় হয় না। যদি কোনও রঙ্গালয়ে 'শকুন্তলা' সুন্দররূপে অনুবাদিত হইয়া অভিনীত হয়, তবে তাহা দর্শকের মন কতদূর আকর্ষণ করিতে পারিবে তাহার স্থিরতা নাই। পাশ্চাত্য প্রদেশে অনুবাদিত 'শকুন্তলা' দর্শক আকর্ষণ করিয়াছিল সত্য, কাব্যেরও প্রশংসা হইয়াছিল, কিন্তু তাহা স্থায়ী-রূপে গৃহীত হয় নাই এবং হইতেও পারে না। অনেকেই বলেন, 'ওথেলো' অনুবাদিত হইয়া অভিনীত হউক, সর্ব্বত্র মানব-হৃদয়-সম্ভূত প্রদীপ্ত ঈর্ষার ছবি

দর্শকের মন স্পর্শ করিবে। কিন্তু কৃষ্ণবর্ণ যোদ্ধা মূরের প্রেমে অনিন্দ্যসুন্দরী ডেস্‌ডিমোনার পিতৃগৃহ ত্যাগ নিভৃতে পাঠ করিয়া বুঝিতে হইবে। উভয়ের পূর্ব্বরাগ-প্রসঙ্গে ভালবাসার কথা নাই, কেবল যুদ্ধ-বিক্রম ও কারাগার সঙ্কট হইতে কৌশল-ব্যবধানে উদ্ধার লাভ বর্ণিত। স্থির চিত্তে নিভৃত পাঠে তাহার সৌন্দর্য্য উপলব্ধি হয় কিন্তু সেক্সপিয়র-বর্ণিত ওথেলোর মুখে অনুরাগ চিত্র সহসা সাধারণের উপলব্ধি হয় না। বীর ও আকস্মিক সুন্দরী বর্ণনা সেক্সপিয়রের পূর্ব্বে লোকের পুনঃপুনঃ হইয়াছে, দর্শক ও তাহা পাঠ করিয়া ডেস্‌ডিমোনার অনুরাগ বুঝিতে পারেন। কিন্তু সেইরূপ নায়িকার প্রেমালাপ ভাবে যাহারা অভ্যস্ত নন, তাঁহাদের নিকট উপন্যাস ঘটনার যোগাযোগ-বিভূষিত স্থানে নায়ক নায়িকার প্রেমালাপ অধিকতর হৃদয়গ্রাহী হয়।

এজন্য যিনি নাটক লিখিবেন, তাঁহাকে দেশীয়ভাবে অনুপ্রাণিত হইতে হইবে। দেশীয় আচার-ব্যবহার, দেশীয় নায়ক-নায়িকা, দেশীয় অবস্থা, উপস্থিত কালের ও দেশীয় মানব হৃদয় স্রোত—তাঁহাকে সুন্দররূপে রঙ্গালয়ে অঙ্কিত করিতে হইবে। সর্ব্বপ্রাণ হিন্দু সর্ব্বপ্রাণ নায়কেরই স্থায়ী আদর করিবে। যাহাদের উচ্চ উচ্চ হিন্দু—রাম, শ্রীকৃষ্ণ, ভীম অর্জুন ভীষ্ম প্রভৃতি ছিলেন, সেই উচ্চ আদর্শ গঠিত নায়কই হিন্দুর হৃদয়গ্রাহী হওয়া সম্ভব। যেরূপ সীতা-চিত্র মুক্তিপ্রিয় দীনদরিদ্রের আদরের, সেইরূপ সত্যের আত্মত্যাগী ও ধর্ম্ম সংস্থাপনকারী নায়ক হিন্দু হৃদয়ে স্থান পাইবে। বাল্মীকির রামায়ণ আকর্ষণ করিতেছে বলিয়া স্থির বাল্মীকি যুধিষ্ঠিরের প্রতি হিন্দুর প্রিয়, কিন্তু দুঃশাসন দুঃশাসনের বক্ষচ্ছেদন পাশ্চাত্যপ্রিয় হইতে এদেশের হৃদয়গ্রাহী নিকট সমধিক হইবে। বক্ষণবিদ্ধ রাজা বাণিজ্যকারী হইলে সতীপ্রাণ হিন্দু তাহাকে ঘৃণা করিবে। শ্রীরামচন্দ্র স্বর্ণ-সীতা গঠিত করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাধা করেন, শ্রীরামচন্দ্র আদর্শ রাজা। যদি তাঁহারা সমীচি আদর্শ ত্যাগী ও সাত্ত্বিক-প্রেমিক। কিন্তু এরূপ ত্যাগ বা এরূপ নির্ভরতা কাহারো দেশে অতুলনীয় বলিয়া যদি উপস্থিত না হয় বাস্তবিক নাটক নাটকটি কেহ করিবে না। সতী নারীর অভিমান প্রত্যেক দেশেই হৃদয়গ্রাহী। কিন্তু পাশ্চাত্য পত্নীব্রতা-সুখী-পতনশীল অভিমান, পতি-অনুরাগ-পরিত্যক্তা অভিমানিনী হইতে অনেক প্রভেদ। সোহাগিনী নায়িকা— যেন প্রাণ আমার জন্ম-জন্মান্তরে স্বামী হন —একথা বলিয়া অভিমান করেন না। স্বামীকে দেখিলে বসনে বদন আচ্ছাদন করেন, বাক্যালাপ করেন না। এইরূপ প্রত্যেক দেশেই বিভিন্নতা দেখা যায়। এই জাতীয় অবস্থা নাটককারের প্রথম লক্ষ্য হওয়া উচিত। দ্বিতীয় লক্ষ্য —আত্মগোপন।

কবি বা ঔপন্যাসিক সকল স্থানে আসিয়া পাঠককে বুঝাইয়া দিতে পারেন। কঠিন সমস্যাস্থলে অবস্থা বর্ণনা করিয়া পাঠকের উপর মনোভাব বুঝিবার ভার দেওয়া তাঁহার চলে এবং ভার দেওয়া অনেক স্থলে উপন্যাসের সৌন্দর্য্য বলিয়া পরিগণিত হয়। যথা,—আয়েষা তিলোত্তমাকে আভরণ প্রদান করিয়া, ফুল-শয্যায় শয়ন করিতে বলিতেছে। যথায় দোষ ধরিবার সম্ভাবনা, তাহা তিনি স্বয়ং খণ্ডন করিয়া যান,—

সর্ব্বস্থানেই স্বয়ং উপস্থিত আছেন। এমন কি, সমালোচকের প্রতি কটাক্ষ করিয়া আপনার সমালোচনা আপনি করিতে পারেন। উপন্যাস-গুরু ফিল্ডিং-এর 'টম জোন্স' তাহার উদাহরণস্থল। ঔপন্যাসিকের আর এক সুবিধা, নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের ন্যায় তাঁহার উপন্যাসগত ব্যক্তিসকলের পরিচয় এককালে দিতে বাধ্য নহেন। পাঠকের কৌতূহল জন্মাইবার নিমিত্ত কাহাকেও বা অন্য সাজে রাখিতে পারেন, পাঠক তাহার পরিচয় পায় না, আগ্রহের সহিত কে সে ব্যক্তি অনুসন্ধান করে। ঔপন্যাসিক সুযোগ বুঝিয়া তাহার পরিচয় দিয়া পাঠককে চমৎকৃত করেন। স্যর্ ওয়াল্টার স্কটের 'পাইরেট' উপন্যাস এই ঔপন্যাসিক-কৌশলের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত-স্থল। নাট্যকার তাঁহার নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তির নিকট কাহাকেও গোপন রাখিতে পারেন, কিন্তু দর্শক তাহার পরিচয় পায়। তাঁহাকে অন্য নাটকীয় কৌশলে চমৎকারিত্ব উৎপাদন করিতে হইবে; যেমন 'মার্চেণ্ট অফ্ ভিনিস'-এ শাইলক বুকের মাংস কাটিতে পারিবে কিন্তু বুকের রক্ত যেন না পড়ে। নায়িকা বিচারালয়ে নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের নিকট আত্মগোপন করিয়াছে কিন্তু দর্শকের নিকট নয়। ঔপন্যাসিক এস্থলে দুই প্রকার ধাঁধা দিতে পারিতেন। আইনজ্ঞ-বেশে বিচারালয়ে কে আসিল তাহার পরিচয় দেওয়া তাঁহার আবশ্যক নয়, কিন্তু আইনজ্ঞ-বেশে পোর্সিয়া উপস্থিত, ইহা নাট্যকারকে বলিয়া দিতে হইবে। সুতরাং আকাঙ্ক্ষা ও চমৎকারিত্ব উৎপাদন করা নাট্যকারের এক স্বতন্ত্র কৌশল। এ কৌশল সাধারণ শক্তি-উদ্ভূত নয়। আত্মগোপনই নাট্যকারের জীবন।

ঔপন্যাসিক বা কবি শারদ নিশি বর্ণনা করিতে পারেন, সমস্ত অবস্থাই তাঁহার আয়ত্ত, কিন্তু নাট্যকারকে রঙ্গালয়ে ধাতুপ্রতিমার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। তুলিকা স্থান অধিকৃত করিয়া নাট্যকারকে সাহায্য করে, কিন্তু তাহা চিত্রপট বলিয়া অনুভূত হয়, শক্তি-চালিত-লেখনী চিত্রের ন্যায় সমস্ত ছবি স্বরূপভাবে প্রতিফলিত হয় না। তুলিকা-চিত্রিত দৃশ্যে ভ্রমর গুঞ্জন করিয়া কুসুমে বসিতে পায় না, কপোত-কপোতী পরস্পর পরস্পরকে আহ্বান করে না, বকুলে পাখী গায় না। এ সমস্ত লেখনী বর্ণনায় করে, কিন্তু নাট্যকারও পাখীর গান, ভ্রমর-গুঞ্জন দর্শককে শুনাইতে হইবে, বর্ণনায় নয়—ধাতু-প্রতিমায়। কেবল বর্ণিত হইলে নাট্যরস থাকিবে না। 'রোমিও-জুলিয়েট'-এ চন্দ্রালোক হইয়াছে তাহা বর্ণিত চন্দ্র নয়, জ্বলন্ত প্রতিভাতী চন্দ্র। তপোবনে বারি সিঞ্চন ভ্রমর গুঞ্জন বর্ণিত, নহে—জ্বলন্ত-প্রতিভাতকারী। সে তপোবনে, সে ভ্রমর-গুঞ্জনে—পার্ব্বতী পরমেশ্বরের বন্দনা করিয়া দীর্ঘ-শিখাধারী কবি কালিদাস নাই, আছেন—শকুন্তলা ও দুষ্মন্ত এবং নাট্য-কৌশলে অলঙ্কৃত মদন। সেই ভ্রমর তপোবনে গুঞ্জন করিয়া বিরহ-তাপিত দুষ্মন্তের কল্পিত চিত্রপটে আসিয়া আবার সজীব হইয়াছে, দুষ্মন্তের হৃদয়ে আঘাত দিয়াছে। নাট্যকারের দৃশ্যগুলি এইরূপ সর্ব্বস্থানে সজীব হইয়া দর্শকের হৃদয়ে আঘাত করিবে।

যথায় উৎকট সমস্যা-স্থল, তথায় নাটককারকে আবরণ খুলিয়া মনোভাব দেখাইতে হইবে। উপন্যাসের নায়িকার মত 'বিষপাত্র' পান করিলেই চলিবে না। 'হ্যামলেট আত্মহত্যা করিবে কিনা, তাহা বিরলে বসিয়া ভাবিতেছে' বলিলে চলিবে না। তাহার জড়িত মস্তিষ্কে কিরূপ জড়িত ভাব প্রসূত হইতেছে, তাহা দেখাইতে হইবে। 'দুঃখের সাগর বিরুদ্ধে অস্ত্র-ধারণ' (Take up arms against a sea of troubles)-রূপ জড়িত উপমা ব্যবহার প্রসূত হইবে। এই উপমা অনেকেই সর্ব্বাঙ্গীণ নয় বলিয়া দোষ দেন, কিন্তু নাট্যকার এরূপ সমালোচনার ভয় করিয়া উপমা সর্ব্বাঙ্গীণ করিতে পারিবেন না। তিনি যাহা মনুষ্যের বা প্রকৃতির দেখিয়াছেন, তাহাই নাটকে দেখাইবেন। অতি-নিকট সম্বন্ধ হইলেও যুবক-যুবতীর এক গৃহে বাস অসঙ্গত, এ কথা আত্ম-নির্ভরতাভিমানী সমাজে বলিতে ভয় পাইবেন না। তবে স্ত্রী চরিত্র যে অতি দুঃখের সময়ে চাটুকারের প্রতারণায় চঞ্চল হইতে পারে, যথা—তৃতীয় রিচার্ডের কাপট্যে অ্যানির ক্ষমা, তাহাও নির্ভীকচিত্তে প্রদর্শন করিবেন। ধর্ম্মের পুরস্কার—আর্থিক লাভ নয়। তাহা হইলে ধর্ম্ম একটি উচ্চ ব্যবসায় হইত। ধর্ম্মের পুরস্কারই ধর্ম্ম ইহা দেখাইয়া সাধারণের বিরক্তিভাজন হইয়াও তাঁহাকে অটল থাকিতে হইবে। সংসারের অবস্থা যেন তাঁহার কল্পনা-মুকুরে প্রতিফলিত হয়। ইহাতে সংসারের অপ্রিয় হইতে হইলেও তিনি তোষামোদী কথায় সংসারকে সন্তুষ্ট করিতে পারিবেন না। আঘাত দিতে হয়—আঘাত দিবেন, তাহাতে বিরাগভাজন হইতে পারেন, কিন্তু কর্ত্তব্য-পরায়ণ হইবেন, এবং কর্ত্তব্য পালন-ফলে অমরত্ব নিশ্চয়ই লাভ করিবেন।

[নাট্যমন্দির, ১৩১৭]

নাটকত্ব

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

মহাকাব্য, নাটক ও উপন্যাস, তিনটিই মনুষ্য-চরিত্র লইয়া রচিত। কিন্তু এই তিনটির মধ্যে বিশেষ প্রভেদ আছে।

মহাকাব্য—একটি বা একাধিক চরিত্র লইয়া রচিত হয়। কিন্তু মহাকাব্যে চরিত্র-চিত্রণ প্রসঙ্গমাত্র। কবির মুখ্য উদ্দেশ্য—সেই প্রসঙ্গক্রমে কবির কবিত্ব দেখানো। বর্ণনাই (যেমন প্রকৃতির বর্ণনা, ঘটনার বর্ণনা, মনুষ্যের প্রবৃত্তির বর্ণনা) কবির প্রধান লক্ষ্য। চরিত্র উপলক্ষ মাত্র, যেমন রঘুবংশ। ইহাতে কবি প্রসঙ্গক্রমে চরিত্রগুলির অবতারণা করিয়াছেন। তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য—ঋতুগুলির বর্ণনা।

অজ-বিলাপে ইন্দুমতীর মৃত্যু উপলক্ষ মাত্র। এ বিলাপ অজের সম্বন্ধে যেরূপ খাটে, যে কোনও প্রেমিক স্বামী-সম্বন্ধে সেইরূপ খাটে। কবির উদ্দেশ্য—চরিত্র-নির্বিশেষে প্রিয়জনের বিচ্ছেদে শোকের বর্ণনা করা ও সেই বর্ণনায় তাঁহার কবিত্ব দেখানো। উপন্যাসে, চরিত্রাবলি লইয়া একটা মনোহারী গল্পের রচনা করাই গ্রন্থকারের মুখ্য উদ্দেশ্য। উপন্যাসের মনোহারিত্ব সেই গল্পের বৈচিত্র্যের উপর প্রধানতঃ নির্ভর করে।

নাটক—কাব্য ও উপন্যাসের মাঝামাঝি, তাহাতেও কবিত্ব চাই, গল্পের মনোহারিত্ব চাই। তাহার উপরে ইহার কতকগুলি বাঁধাবাঁধি নিয়ম আছে।

প্রথমতঃ, নাটকে একটা আখ্যানবস্তুর ঐক্য (unity of plot) চাই। একটি মাত্র বিষয়ই একখানি নাটকের প্রধান বর্ণনীয় বিষয়। অন্যান্য ঘটনা তাহাকে ফুটাইবার জন্যই উদ্দিষ্ট।

উদাহরণতঃ—উপন্যাসের গতি বহমান নদী স্রোতগুলির মত, তাহাদের গতি একদিকে বটে, কিন্তু কোনটি কোনটির অধীন নহে। নাটকের গতি নদীর স্রোতের মত—অন্যান্য উপনদী তাহার উপর আসিয়া পড়িয়া তাহাকে পরিপুষ্ট করিতেছে মাত্র। অথবা উপন্যাসের আকার একটি গাছের মত,—চারিদিকে নানা শাখা বিস্তৃত হইয়া সেখানেই তাহাদের নিজস্ব পরিণতি হইয়াছে। কিন্তু নাটকের আকার মোচার মত, এক স্থান হইতে বাহির হইয়া পরে বিস্তৃত হইয়া একস্থানেই তাহা শেষ হইতে হইবে। প্রেম নাটকের মুখ্য বিষয় হইলে সেই প্রেমের পরিণামেই নাটক শেষ করিতে হইবে, যেমন রোমিও ও জুলিয়েট। লোভ মুখ্য বিষয় হইলে, সেই লোভের পরিণামেই নাটক শেষ করিতে হইবে, যেমন ম্যাকবেথ। উচ্চাশা নাটকের মুখ্য বিষয় হইলে তাহার পরিণামেই তাহার পরিণতি, যেমন জুলিয়স সিজার। নাটক প্রতিহিংসা-মূলক হইলে, প্রতিহিংসারই ফল দেখাইতে হইবে, যেমন হ্যাম্লেট।

তাহার উপরে, নাটকের আর একটি নিয়ম আছে। মহাকাব্যে বা উপন্যাসে এরূপ বাঁধাবাঁধি কোনও নিয়ম নাই। নাটকে প্রত্যেক ঘটনার সার্থকতা চাই। নাটকের মধ্যে অবান্তর বিষয় আনিয়া ফেলিতে পারিবে না। সকল ঘটনা বা সকল বিষয়ই নাটকের মুখ্য ঘটনার অনুকূল বা প্রতিকূল হওয়া চাই। নাটকে এমন একটি ঘটনা বা দৃশ্য থাকিবে না, যাহা নাটকে না থাকিলেও নাটকের পরিণতি অবিকৃতরূপ হইত। নাটককার নাটকে শত অবান্তর ঘটনার সমাবেশ করিতে পারেন, তাহাতে বিষয় তাঁহার ক্ষমতা প্রকাশ পাইতে পারে, আখ্যানবস্তু জটিল হইতে পারে। কিন্তু সেই ঘটনাগুলি সেই মূল ঘটনার দিকেই চাহিয়া থাকিবে, তাহাকেই আগাইয়া দিবে কিংবা পিছাইয়া দিবে। তবেই তাহা নাটক, নহিলে নয়। উপন্যাস এরূপ কোন নিয়মের অধীন নহে। মহাকাব্যে ঘটনাবলির একাগ্রতা বা সার্থকতা—কিছুরই প্রয়োজন নাই।

কবির নাটকের একটি অঙ্গ, তাহা উপন্যাসে না থাকিলেও চলে। চরিত্রাঙ্কন নাটকে থাকা চাই, কাব্যে তাহা না থাকিলেও চলে।

নাটকের আর একটি প্রধান নিয়ম আছে, যাহা নাটককে কাব্য ও উপন্যাস উভয় হইতেই পৃথক্ করে। ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে নাটকের গল্প অগ্রসর হয়। নাটকীয় মুখ্য চরিত্র কখনও সরল রেখায় যায় না। জীবন একদিকে যাইতেছিল, এমন সময়ে ধাক্কা পাইয়া তাহার গতি অন্য দিকে ফিরিল, পুনরায় ধাক্কা পাইয়া আবার অন্যদিকে অগ্রসর হইল—নাটকে এইরূপ দেখাইতে হইবে। উপন্যাসে বা মহাকাব্যে উহার কোনও প্রয়োজন নাই। অবশ্য প্রত্যেক মানুষের জীবন, যত সামান্যই হউক না কেন, কিছু না-কিছু ধাক্কা পায়ই, কোনও মনুষ্য-জীবন একেবারে সরল রেখায় চলে না। একজন বেশ লেখাপড়া করিতেছিল সহসা পিতার মৃত্যুতে তাহাকে লেখাপড়া ছাড়িয়া দিতে হইল। কেহ বা বিবাহ করিয়া বহু পুত্রকন্যা হওয়ায় বিব্রত হইয়া পড়িয়া, দাসত্ব স্বীকার করিল। এরূপ ঘটনা-পরম্পরা প্রায় প্রত্যেক মনুষ্যের জীবনে ঘটিয়া থাকে, সেইজন্য যে কোনও ব্যক্তির জীবনের ইতিহাস লিখিতে হইলে তাহা নাটকের আকার কতক ধারণ করেই। কিন্তু প্রকৃত নাটকে এই ঘটনাগুলি একটু প্রবল রকমের হওয়া চাই। ধাক্কা যত অধিক এবং যত প্রবল হইবে, ততই তাহা নাটকের যোগ্য উপকরণ হইবে।

অন্ততঃ নাটকের প্রধান চরিত্রগুলি—বাধা অতিক্রম করিতেছে, বা সে চেষ্টা করিতেছে, এরূপ দেখান চাই। কেন্দ্রীয় চরিত্র যেখানে বাধা অতিক্রম করে, সে নাটককে ইংরাজিতে comedy বলে। বাধা অতিক্রান্ত হইলেই সেইখানেই সেই নাটকের শেষ। যেমন দুই জনের বিবাহ যদি কোনও নাটকের মুখ্য ব্যাপার হয়, তাহা হইলে বহুরূপ নানাবিধ বিঘ্ন আসিয়া তাহাদের বিবাহ সম্পন্ন হইতে না দেয়, এরূপ নাটকে চিত্রিত হইবে। সেই বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেলে, সেইখানেই যবনিকা পড়িবে।

পরিণামে বাধা অতিক্রান্ত নাও হইতে পারে। বাধা অতিক্রম করিবার পূর্ব্বেই জীবনের বা ঘটনার শেষ হইতে পারে, দুঃখ দুঃখই রহিয়া যাইতে পারে। এরূপ স্থলে ইংরাজিতে যাহাকে tragedy বলে তাহার সৃষ্টি হয়। যেমন উপরি-উক্ত উদাহরণে কেবল—যদি নায়ক বা নায়িকার বা উভয়েরই মৃত্যু হয়, কিম্বা একজন বা উভয়েই নিরুদ্দেশ হয়। তাহার পরে আর কিছু বলিবার নাই। তখন সেইখানে যবনিকা পড়িবে।

ফলতঃ সুখের ও দুঃখের নানা ও শক্তি চরিত্র ও বহির্ঘটনার সংঘর্ষণে নাটকের জন্য যুদ্ধ চাই—তা সে বাহিরের ঘটনাবলির সহিতই হউক, কিংবা নিজের সঙ্গেই হউক।

অন্তর্দ্বন্দ্ব যে নাটকে দেখান হয়, তাহাই উচ্চ অঙ্গের নাটক। যেমন—হ্যাম্লেট বা কিং লিয়র। বহির্ঘটনার সহিত যুদ্ধ তদপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর নাটকের উপাদান

যেমন ওথেলো বা মাক্‌বেথ। ওথেলোকে ইয়াগো বুঝাইল যে তাহার স্ত্রী ভ্রষ্টা। মূর্খ অমনই তাহাই বুঝিল। তাহার মনে কোনও দ্বিধা হইল না। ওথেলোতে কেবল একস্থানে ওথেলোর মনের মধ্যে দ্বিধা আসিয়াছে। সে দ্বিধা স্ত্রীহত্যার সময়। সেখানেও কিন্তু যুদ্ধ প্রেমে ও ঈর্ষায় নহে, সেখানে যুদ্ধ—কারুণ্যে ও ঈর্ষায়। মাক্‌বেথে যেটুকু দ্বিধা আছে, তাহা এতদপেক্ষা অনেক উচ্চ অঙ্গের। ডাঙ্কানকে হত্যা করিবার পূর্ব্বে মাক্‌বেথের হৃদয়ে যে যুদ্ধ হইয়াছিল তাহা ধর্ম্মে ও অধর্ম্মে, আকাঙ্ক্ষা ও লোভে। কিন্তু লিয়রের যুদ্ধ অন্য প্রকারের। সে যুদ্ধ অজ্ঞানে ও জ্ঞানে, বিশ্বাসে ও সন্দেহে, অকৃতজ্ঞতায় ও প্রবৃত্তিতে। হ্যামলেটের মনে যে যুদ্ধ, তাহা আলস্য ও ইচ্ছায়, প্রতিহিংসায় ও সন্দেহে। এই যুদ্ধ নাটকের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত চলিয়াছে।

এই অন্তর্দ্বন্দ্ব সব মহানাটকে আছেই আছে। প্রবৃত্তি ও প্রবৃত্তির সংঘাতে উভয় না উঠাইতে পারিলে, বিপরীত বাহ্য সংঘাতে ফুটাইয়া না উঠাইতে পারিলে, কবি অমরকালো বড় নাটকের সৃষ্টি করিতে পারেন না।

অন্তর্বিরোধ না থাকিলে উচ্চ অঙ্গের নাটক হয় না। বাহিরের যুদ্ধ নাটকের বিশেষ উৎকর্ষ সাধন করে না। তাহা যে-সে নাটককারই দেখাইতে পারেন। যে নাটকে কেবল তাহাই বর্ণিত হয়, তাহা নাটক নহে—ইতিহাস। যে নাটক বাহিরের যুদ্ধকে উপলক্ষমাত্র করিয়া মনুষ্যের প্রবৃত্তিসমূহের বিকাশ করে, তাহা অবশ্য নাটক হইতে পারে, তথাপি তাহা উচ্চ অঙ্গের নাটক নহে। যে নাটক প্রবৃত্তিসমূহের যুদ্ধ দেখায়, তাহাই উচ্চ অঙ্গের নাটক।

প্রবৃত্তিসমূহের সামঞ্জস্য উচ্চ অঙ্গের নাটকে অল্প-পরিমাণে থাকে, যেমন সাহস, অধ্যবসায়, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, দয়া ইত্যাদি গুণের সমবায়। কিম্বা দ্বেষ, জিঘাংসা, লোভ ইত্যাদি প্রবৃত্তিসমূহের সমবায় একটি চরিত্রে থাকিতে পারে।

অনুকূল প্রবৃত্তিসমূহের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া নাটক লেখা তত শক্ত নহে। তাহাতে মনুষ্য-হৃদয় সম্বন্ধে নাটককারের জ্ঞানেরও বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। আদর্শ চরিত্র ভিন্ন প্রত্যেক মনুষ্য-চরিত্র দোষ গুণে গঠিত। দোষগুলি বাদ দিয়া কেবলমাত্র গুণগুলি দেখাইলে একটি সম্পূর্ণ মনুষ্য-চরিত্র দেখান হয় না। যে নাটককার একটি আদর্শ চরিত্র চিত্রিত করিতে বসিয়াছেন তাঁহার বিষয় স্বতন্ত্র কথা। তিনি মনুষ্য-চরিত্র দেখাইতে বসেন নাই। তিনি দেব-চরিত্র—মনুষ্য-চরিত্র কিরূপ হওয়া উচিত—তাহাই দেখাইতে বসিয়াছেন। বস্তুতঃ, তিনি নাটকাকারে ধর্ম্ম-প্রচার করিতে বসিয়াছেন। আমি এ গ্রন্থগুলিকে নাটক বলি না—ধর্ম্ম-গ্রন্থ বলি। তাহাতে তিনি যে চরিত্রের যতপ্রকার গুণরাশি একত্র একখানি নাটকে দেখাইতে পারেন, ততই তাঁহার গুণপনা প্রকাশ পায়। কিন্তু তাহাতে মনুষ্য-চরিত্রের চিত্র হয় না।

বিপরীত প্রবৃত্তিসমূহের সমবায় দেখান অপেক্ষাকৃত দুরূহ ব্যাপার, এখানে নাটককারের কৃতিত্ব বেশী। যিনি মনুষ্যের অন্তর্জগৎ উদ্ঘাটিত করিয়া দেখাইতে

পারেন, তিনি প্রকৃত দার্শনিক কবি। বল ও দৌর্বল্য, জিঘাংসা ও করুণা, জ্ঞান ও অজ্ঞান, গর্ব ও নম্রতা, ক্রোধ ও সংযম—এক কথায় পাপ ও পুণ্যের সমাবেশে প্রকৃত উচ্চ অঙ্গের নাটক হয়। ইহাকেই আমি তত্ত্বনিরোধ বলিতেছি। মানুষকে একটি শক্তি ধাক্কা দিতেছে, আর একটি শক্তি ধরিয়া রাখিতেছে, অশ্বচালকের ন্যায় কবি এক হস্তে চাবুক মারিতেছেন, অপর হস্তে রশ্মি ধরিয়া টানিয়া রাখিতেছেন, এইরূপ কবিই মহা-দার্শনিক কবি।

আর একটি গুণ নাটকে থাকা চাই। কি নাটক, কি উপন্যাস, কি মহাকাব্য, কোনটিই প্রকৃতিকে অতিক্রম করিতে পারিবে না। বস্তুতঃ, সকল সুকুমার কলাই প্রকৃতির অনুবর্তী। প্রকৃতিকে বাড়াইবার বা বর্ধিত করিবার অধিকার তাহার আছে। কিন্তু প্রকৃতিকে উপেক্ষা করিবার অধিকার তাহার নাই।

এখন আমরা দেখিলাম যে, নাটকে এই গুণগুলি থাকা চাই, যথা—(১) ঘটনার ঐক্য, (২) ঘটনার সার্থকতা, (৩) ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত-গতি (৪) কবিত্ব, (৫) চরিত্র-চিত্রণ, (৬) স্বাভাবিকতা।

[সাহিত্য, ১৩১৮]

কবিতার কষ্টিপাথর

বিপিনচন্দ্র পাল

কেবল ভাল লাগে বলিয়াই কোনও কবিতাকে শ্রেষ্ঠ, আর ভাল লাগে না বলিয়াই কোনও কবিতাকে নিকৃষ্ট বলা যায় না। আমরা যাহাকে ভাল-লাগা বলি, তাহা একটা মিশ্র অনুভূতি। কবিতা-বিশেষ লিখিয়া বা পড়িয়া যে আনন্দানুভব হয়, তাহাতে বর্তমানের প্রত্যক্ষ এবং অতীতের বহুতর স্মৃতি অতিশয় ওতপ্রোত হইয়া জড়াইয়া থাকে। কবির কাব্য ভালই হউক আর মন্দই হউক, স্বকীয় রচনাই যে একটা আনন্দ আছে কবি কবিতা রচনা করিতে সে আনন্দ অনুভব করেন। শিশু যখন বর্ণমালা শিখিয়া প্রথম দিন, সেটি বাবা " "মা " "কাকা " 'দাদা ' প্রভৃতি পরিচিত কথাগুলি লিখে সে দিন তার অপূর্ব আনন্দ হয়। ইহাতে তার নিজের কৃতিত্বের প্রমাণ পাইয়া সে আনন্দিত হয়। অক্ষরগুলোর ছাঁদের ভাল-মন্দের সঙ্গে এ আনন্দানুভূতির কোনও-ই সম্পর্ক নাই। কবিও কবিতা রচনা করিয়া আপনার একটা কৃতিত্বের পরিচয় পাইয়া আনন্দিত হন। কবিতার ভাল-মন্দের উপরে এ আনন্দ তখন নির্ভর করে না। সে বিচার অপরে করিবে সে কথা পরে উঠিবে। তখন লোকে মন্দ বলিলে তাঁর আনন্দের হানি হইবে, কারণ সে মন্দ বলাতে তাঁর কৃতিত্বের

শব্দ-সম্পদ্‌ এবং ভাব-সম্ভার—দু'এর কোনওটাই ইহাকে বাঁচাইতে পারে না। যাঁহারা টেনিসন্‌কে ভালবাসেন, তাঁহারা বহুল পরিমাণে তাঁর ঝঙ্কারেই মুগ্ধ হইয়া থাকেন; ব্রাউনিং-এর সে ঝঙ্কার নাই বলিয়া ব্রাউনিং-এর কবিত্ব তাঁদের মনঃপূত হয় না। আবার হুইট্‌ম্যানের টেনিসনের আভিজাত্যও নাই, কিপ্‌লিং-এর জনতাও নাই, ব্রাউনিং-এর মার্জিত রুচিও (refined culture) নাই, এই জন্য অতি অল্প লোকেই তাঁর কবিতার রস আস্বাদন করিয়া থাকে'। এইরূপ নানা লোকে নানা কারণে ভিন্ন ভিন্ন কবিতাকে বা ভিন্ন ভিন্ন কবিকে ভালবাসে। এই সকল কারণের মধ্যে কোন্‌টা সত্য রসানুভূতির প্রমাণ, আর কোন্‌টা অবান্তর বস্তুর উপরে প্রতিষ্ঠিত—ইহার দ্বারাই এগুলির কোন্‌টি কাব্য-বিচারে গ্রহণীয় আর কোন্‌টিই বা বর্জনীয়, ইহার মীমাংসা হইবে। কেবল ভাল-লাগার বা না-লাগার দ্বারা এ বিচার হইতে পারে না।

একটি দৃষ্টান্ত—

"নাচিছে কদম্বমূলে, বাজায়ে মুরলী রে,
রাধিকারমণ।
চল সখি ত্বরা করি, দেখিগে প্রাণের হরি,
ব্রজের রতন।"

আমার নিকটে মধুসূদনের এই ব্রজাঙ্গনা-গীতি অপূর্ব বোধ হয়। এমন মিষ্ট গীত, আমার মনে হয়, বাঙ্গালা ভাষায় কখনও ফোটে নাই, কখনও ফুটিবে না।

আর তোমার কাণে ও প্রাণে—

"যাই গো, ওই বাজায় বাঁশী
প্রাণ কেমন করে;
না গেলে, সে কেঁদে কেঁদে
চলে' যাবে বাস-ঘরে।"

বিপিন গোপের এই সঙ্গীতটি অনাস্বাদিতপূর্ব অমৃত বর্ষণ করে। তোমার বিবেচনায় এমন মিষ্ট গীত বাঙ্গালা ভাষায় কোনও দিন কেহ গাহে নাই, কোনও দিন কেহ আর গাহিতে পারিবে বলিয়াও মনে হয় না। মধুসূদনের ব্রজাঙ্গনাতে তুমি কোনও রস পাও না, বিপিন গোপের গানে আমিও কোনও রস পাই না। এ অবস্থায় এই দুইটির মধ্যে কোন্‌টি বাস্তবিকই মিষ্ট বাস্তবিকই কাব্যরসাত্মক, আর কোন্‌টি নয়, ইহার বিচার হইবে কিসে?

আমাকে যদি এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়, তবে বলিব যে, তোমার প্রশ্নের ভিতরেই আমার বিচারের সূত্রটিও রহিয়াছে। 'কোন্‌টি বাস্তবিকই মিষ্ট?' এই 'বাস্তবিক' কথাতেই বিচারের সূত্রটি নিহিত হইয়াছে। 'বাস্তবিক মিষ্ট' বলিবার সময়েই এটা তুমি মানিয়া লইয়াছ যে, যাহা মিষ্ট লাগে, তাহা এক নহে,—দুই জাতীয়। এক বাস্তবিক আর এক যাহা বাস্তবিক নহে, অর্থাৎ অ-বাস্তবিক। যাহার বস্তু আছে,

তাহাই বাস্তবিক, যাহার বস্তুত্ব নাই, তাহাই অবাস্তব। সুতরাং তোমার নিজের কথাতেই, কেবল মিষ্টত্বের দ্বারা কবিতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত বা প্রতিষ্ঠিত হয় না,—এই মিষ্টত্বের অন্তরালে বস্তু থাকা চাই। এই বস্তুত্বের দ্বারাও কবিতার বিচার হইবে, কেবল মিষ্টত্বের দ্বারা নহে। কেবল বস্তুকে কবিতা হয় না, কেবল মিষ্টত্বেও হয় না। বস্তুত্বের সঙ্গে মিষ্টত্বের, মিষ্টত্বের সঙ্গে বস্তুত্বের মিলন যেখানে, সেইখানেই সত্য কবিতা জন্মে, অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ কবিতামাত্রই রসাত্মক এবং বস্তুতন্ত্র।

সুতরাং কেবল মিষ্টত্বের দ্বারা কখনও কাব্যের ভাল-মন্দ বিচার করা চলে না। মিষ্টত্ব একটা অনুভূতি। অনুভূতি বলিলেই, যে অনুভব করে এমন কোনও ব্যক্তি, আর যাহা তার এই অনুভবের বিষয় এমন কোন বস্তু,—এ দুইটিই বুঝায়। আর এই অনুভবের বিষয় দুই জাতীয় হইতে পারে। এক—যাহা বর্তমানে আমাদের সমক্ষে উপস্থিত, দ্বিতীয়—যাহা অতীতে কোনও সময়ে উপস্থিত ছিল, এখন অনুপস্থিত হইয়াও ভাবসাম্য কিম্বা association of ideas-এর সাহায্যে মনোমধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছে। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ অথবা স্মৃতি, এই দুই সূত্র ব্যতীত কোনও-কিছু আমাদের সত্য অনুভবের বিষয় হইতেই পারে না। সত্য অনুভব যখন বলিলাম, তখন মিথ্যা অনুভব সম্ভব, ইহাও মানিয়া লইলাম। সে মিথ্যা অনুভব কি? তার উৎপত্তি কিসে ও স্থিতি কোথায়? ইহাও জানা প্রয়োজন, নতুবা সত্যমিথ্যার প্রভেদ করিব কিরূপে? সত্য অনুভব হয় বর্তমান প্রত্যক্ষ, না হয় পূর্ব প্রত্যক্ষের স্মৃতিকে লইয়া। সুতরাং যে অনুভবের মূলে বর্তমান প্রত্যক্ষও নাই আর পূর্ব প্রত্যক্ষের স্মৃতিও নাই, সেই অনুভবকেই মিথ্যা বলিব। এই মিথ্যা অনুভবও আবার কোনও কোনও স্থলে একান্ত মিথ্যা, আর কোনও স্থলে বা সত্যাভাস হইতে পারে। শিশু পুত্রের হাতপা-বন্ধন অথবা ভালবাসার অঙ্গভঙ্গি দেখিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে। শিশুর এ অনুভব সত্য নহে, কিন্তু সত্যাভাস। ভালবাসার অঙ্গভঙ্গি যে কি, সে এখনও জানে না—জানিবে, যখন আস্বাদন সে দিন পাইবে, সে দিন। এখন সে জানে মারামারিতেই কেবল অঙ্গভঙ্গি হয়। সুতরাং এখানে তাহাই সে সম্বন্ধে কল্পনা করিল, অর্থাৎ এখানে বাস্তবিক যে ভাবটী নাই, সে আপনার মন হইতে তাহাই তার উপরে চাপাইল। এ গেল এক প্রকারের মিথ্যা অনুভব। এ অনুভব একান্ত মিথ্যা নয়, আধখানা সত্য মাত্র। শিশুর নিজের অঙ্গের অনুভূতিটা সত্য, বাকি অর্ধ আরোপিত কল্পিত।

কিন্তু আর এক প্রকারের অনুভব আছে, যাহা আধখানা সত্য বা সত্যাভাসও নয়—যাহা সর্বৈব মিথ্যা, আগাগোড়া স্বকপোলকল্পিত। যে ব্যক্তি জন্মে কোনও দিন কলিকাতা ছাড়িয়া যায় নাই, বরফ-পড়া কাহাকে বলে, তাহা বা তার অনুরূপ কোনও-কিছু সে দেখে নাই, কেবল শুনিয়াছে যে, দুরন্ত শীতের দেশেই কেবল বরফ পড়ে, কোথাও পড়িয়াছে যে, এই বরফ যখন পড়িতে আরম্ভ করে, তখন আশমান-জমীন যেন টুকরা টুকরা ফেন-পুঞ্জ ভরিয়া যায়। এই শোনা কথার উপরে সে তার মনে মনে

না,—বাঁশী বাজাইতেন আর দুই নির্দ্দিষ্ট চিহ্ন লক্ষ্য করিতেন। শ্রীকৃষ্ণ রাধা-নামে সাধা বাঁশী বাজাইতেন আর সর্ব্বেন্দ্রিয়কে কেন্দ্রীভূত করিয়া শ্রীরাধিকা আসিতেছেন কি না, তাই দেখিতেন। ও বাঁশী বাজে বলিলে গোপী সমাধিস্থ। এ অবস্থায় কোনও নায়ক বাঁশী বাজাইয়া তার পাশে তুলে নাচে না।

"নাচিছে কদম্বমূলে, বাজায়ে মুরলী রে।"—

শুনিলেই রাধিকারমণকে মনে পড়ে না—মনে পড়ে এক সাঁওতাল যুবককে, যে একলা দিনে মাদলের উঠানে হাসিয়া বাঁশী বাজাইয়া নাচিছে। এক নাচিছে কথায়, মধুসূদন সব নষ্ট করিয়া দিয়াছেন। পাপীয়া কুঞ্জ-বনে নাচিয়া নাচিয়া আপনার প্রণয়ীকে ডাকে। কপোতী সন্ধ্যাকালে আপনার গোপন নদীতীরে নাচিয়া নাচিয়া আপনার সঙ্গীকে ডাকিয়া আনে—এ সকল সত্য। কিন্তু মানুষ ডাকে, নাচে না; সে ডাকে আর গেয়ায়, গেয়ায় আর ডাকে। মানব নয় তার বিলাসী। কিন্তু আমি যখন ব্রজাঙ্গনা পড়ি, তখন এ সকল ভাবি না। আমি দেখি তার সুর। আমি দেখি তার শব্দ-সম্পদ্। আমি দেখি তার ছন্দ। আমি মজিয়া যাই তার অপূর্ব্ব ঝঙ্কারে, এই ঝঙ্কারটি বড় মিষ্ট। সেইই জন্য ব্রজাঙ্গনাকে এমন মিষ্ট বলি। সুর যে তার শব্দ নয়, অর্থ। তুমি চাও ছন্দ নয়, রস। এই জন্যই আমার যাহা মিষ্ট লাগে তোমার তাহা তেমন মিষ্ট লাগে না।

তবে এ মীমাংসার একটা পথ হয়, যদি কবির ভাব-রসের বিচারটা তোমার রসের রাজ্যে যাইয়া হইবে না আমার ঝঙ্কারের রাজ্যে আসিয়া হইবে এই কথাটি একবার দুজনে মিলিয়া ঠিক করিয়া লইতে পারি।

[নারায়ণ, ১৩২২]

বাঙ্গলার গীতিকবিতা

চিত্তরঞ্জন দাশ

বাঙ্গলার জল, বাঙ্গলার মাটির মধ্যে একটা চিরন্তন সত্য নিহিত আছে। সেই সত্য, যুগে যুগে আপনাকে নব নব রূপে, নব নব ভাবে প্রকাশিত করিতেছে। শত সহস্র পরিবর্ত্তন, আবর্ত্তন ও বিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেই চিরন্তন সত্যই ফুটিয়া উঠিয়াছে। সাহিত্যে, দর্শনে, কাব্যে, যুদ্ধে, বিপ্লবে, ধর্ম্মে, কর্ম্মে, অজ্ঞানে অধর্ম্মে, স্বাধীনতায়, পরাধীনতায়, সেই সত্যই আপনাকে ঘোষণা করিয়াছে, এখনও করিতেছে। সে যে বাঙ্গলার প্রাণ,—বাঙ্গলার মাটি, বাঙ্গলার জল, সেই প্রাণেরই বহিরাবরণ। বাঙ্গলার

বাঙ্গলা তখন প্রাণের ভিতর ডুব দিয়া দেখিল, কত মণি, কত মাণিক্য তাহার সেই আঁধার প্রাণের স্তরে-স্তরে আলোক বিকিরণ করিতেছে। ভাবিল, আমার প্রাণে কে আছে? কি আছে? কে আমাকে বাহির হইতে রূপে, রসে, গানে, গন্ধে জড়াইয়া জড়াইয়া আকুল করে? আমার অন্তরের অন্তরে থাকিয়া এমন করিয়া স্পর্শ করে? কাহাকে ব্যক্ত করিতে চাই? কে বিনা চেষ্টায় আপনা-আপনি এমন করিয়া ব্যক্ত হইয়া উঠে? বাঙ্গলা প্রাণে প্রাণে বুঝিল, এ যে বাহিরের ও ভিতরের এক অপূর্ব মিলন। এই মিলন উপভোগ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। চাহিয়া দেখিল, অনন্ত সাগর দূরে যেখানে দিক্‌চক্রবালের পরিধি-প্রান্ত মিলিয়াছে, সেখানে শুধু এক রেখার মত সরল, শান্ত নিবিড়, যেন মিলাইয়াও মিলায় নাই, মিশিয়াও মিশে নাই, সুন্দর অথচ অদ্ভুত। আবার ফিরিয়া দেখিল, ধরণী মহাকাশকে চুম্বন করিতেছে, নমিয়া পড়িয়া বলিতেছে, "হে আকাশ, আমাকে লও, আমি যে তোমারই।" আকাশও ধরণীকে বুকের ভিতর টানিয়া লইতেছে, বলিতেছে, "এস এস, আমি ও তোমারই।" দেখিল, সে এক মহামিলন। বুঝিল, অন্যান্য, সকলই সার্থক। জন্ম সার্থক। মৃত্যু সার্থক। দেহ সার্থক। প্রাণ সার্থক। আত্মা সার্থক। এই মহামিলন সার্থক। বাহির শুধু বাহির নয়, অন্তর শুধু অন্তর নয়। ইন্দ্রিয় দিয়া যাহা প্রথম ধরা যায়, তাহা শুধু বহিরাবরণ। প্রত্যেক প্রত্যেকের, প্রত্যেক জিনিসেরই একটা অন্তঃপ্রকৃতি আছে। সেই বহিরাবরণ ও অন্তঃপ্রকৃতি মিলিয়া-মিশিয়া এক। তাহারই নাম বস্তু। জীবন এই মহামিলন-মন্দির। কত বিচিত্র রূপ, কত বিচিত্র গন্ধ, কত বিচিত্র রস, কত না সুরের খেলা; কত না রসের খেলা! —আমরা যে দিনে-দিনে নূতন হইয়া উঠিতেছি। বাঙ্গলার কবি তখন তাঁহার ভুলাইতে ভুলাইতে গাইলেন,—

"নব যে নব নিতুই নব,
যখনি হেরি তখনি নব।"

আদিম যুগ হইতে বাঙ্গলার বুকে অনেক আশা, অনেক ভাব আপনা আপনি জমাট বাঁধিতেছিল। সে যে অন্তরের মাঝে, প্রাণের কি প্রত্যন্ত কোণায় আঁখি বাঁধিতে-ছিল, মিলন পরশের জন্য ব্যাকুল হইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। মনের ভিতর তুলিয়া তুলিয়া যেই দেখিতে পাইল, আর সে আনন্দ ধরিয়া রাখিতে পারিল না। তখন কবি গাইয়া উঠিলেন,—

"হৃদয়ে আছিলে   জেগেছ হইয়
দেখিতে পাইনু সে"

হৃদয়ের মাঝে যে ভাব আপনা আপনি ফুটিতেছিল, সে যেন মূর্ত্তি ধরিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে। সে রূপ কেমন? যেন,—

"চরণ-কমলে   ভ্রমর ভোমরে
চৌদিকে বেড়িয়া ঝাঁকে"

তাহাকে দেখিয়া কবি বাহ্যজ্ঞান হারাইয়াছিলেন, তখ অন্তরের ভিতর মরমের সেই লুকান ঘরে বিভোর হইয়া দেখিতেছিলেন। যখন বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল, তখন দেখিতে পাইলেন—তাঁহার সেই মানস প্রতিমা, জীবন-প্রতিমা—

" চম্পক-বরণী, হরিণ-নয়নী * * *
চলে নীল শাড়ী নিঙাড়ি নিঙাড়ি
পরাণ সহিত মোর।"

ইহাই বাঙ্গলা গীতিকবিতার প্রাণ। প্রাণের সঙ্গে, মর্ম্মের সঙ্গে, আত্মার সঙ্গে, ভাবের সঙ্গে, কর্ম্মের সঙ্গে মর্ম্মের সঙ্গে—জীবনের সঙ্গে বাহিরের ও ভিতরের এমনই পাশাপাশী মিলন। বঙ্গ না জানুক, আর নাই জানুক, বুঝুক আর নাই বুঝুক, আমার বাঙ্গলার প্রাণ এ মহামিলনে ভোর হইয়া আছে। এই মহামিলন-মন্দিরের পূজা যে নিত্য চলিতেছে, বাঙ্গলার গান, তাহার আরাত্রিক—বাঙ্গলার ভাষা তাহার মন্ত্র। সেই বাঙ্গলার কবি চণ্ডীদাস, সেই কবিতা বাঙ্গলার কবিতা।

বাঙ্গলা দেশে সাহিত্যের অঙ্গনে এই গীতিকাব্য। কিন্তু আজকাল এক প্রকার নবযুগ পড়িয়াছে। নানাপ্রকার তর্ক বিতর্ক দলাদলি দ্বেষ, ঈর্ষা জাগিয়াছে। আজ দেখিতেছি, যে প্রাণের অনুভূতি লইয়া চণ্ডীদাস প্রভৃতি কবিরা গান গাহিয়াছিলেন, সে গান, সে প্রাণের সুর, মনের সুর যে 'বিবাদে'র একত্র করিয়া" প্রাণরাজ্যে সে বাঁশী আর যেন ফুকারিয়া উঠে না। কথা লইয়া কবিতা লইয়া, সাহিত্য লইয়া, রস তত্ত্ব লইয়া নানা বিশ্লেষণ কঠোর অনুশাসন ধর্ম্ম ও নীতির দোহাই, আদর্শের বড়াই, অশ্লীলতা ও বিশ্লীলতা, বিকৃতির তত্ত্ব প্রচার করিয়া, কষ্টিপাথরে যাচ কত পড়ে এই যাচাই বাছাই, ঝাড়াই করিতেই দিন যায় হায় কিন্তু—

" দিন গত নহে পার, তব চরণে এ দিন গত "

সে সুন্দর, সে কঠিন, সে আনন্দের, যে নিবেদনের কথা নাই, সে কথা বুঝিবার ইচ্ছাও নাই। সে বাঁশীর ধ্বনি আর শুনিতে পাই না—

" সিন্ধু নিকটে যদি কণ্ঠ শুকায়ব
কে দূর করব পিয়াসা "

আমাদের ঠিক সেই অবস্থা।

আজ এই সাহিত্যের প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া সেই তর্ক, মীমাংসা, যুক্তি, এই তাল-বৈতালের কারণ বুঝাইতে হইলে, আমি যে খুব ভাল করিয়া তাহার ঠিক মীমাংসা ভাষ্য ও টীকা টিপ্পনীর সহিত দেখাইতে পারিব, এমন হয় ত না-ও হইতে পারে, তবে বাঙ্গলা কবিতার প্রাণ ও বাঙ্গলা সাহিত্যের আদর্শ যে কি তাহা বোধ হয়, বলিবার সময় আসিয়াছে। তাই আজ এই সমবেত সাহিত্যিক সকলের আগে সেই সকল কথাই বলিতে চাই, কোন্ পথে যাইলে হৃদয়-উৎসের দেখা মিলিবে, তাহারই খোঁজ করিব।

এখন কথা হইতেছে—কাব্য কি? গীতিকবিতা কি? সাহিত্য কি?

সাহিত্যের আদর্শই বা কি? ফুল যেমন তাহার রূপ-রসের ডালি লইয়া একদিনে ফুটিয়া উঠে না, তেমনি আদর্শও একদিনে, এক মুহূর্ত্তে প্রত্যক্ষ অনুভূতিতে আসে না। অনন্ত কালের যে সনাতন সত্যের আহ্বান চলিয়াছে, সেই আহ্বানের দিকে ফুল আপনার সেই বিকাশ ও অনুরাগ লইয়া কত যুগ-যুগান্তরের সৃষ্টির অঙ্কুর মাটির ভিতর দিয়া জীবন-স্রোতে আপনার আত্মবিকাশ করে। বিকাশই যে জীবনের ধর্ম্ম,—রূপে রূপে বিকাশ, শতেক যুগের ফুল শত জন্ম ধরিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে। তার সাধনের পুষ্টি কেউ টানিয়া, খুলিয়া, আপনার ইচ্ছায় খেলিয়া, আবার সাধনে মিলাইয়া যায়। জীবনের ধর্ম্ম ও বিকাশের ধর্ম্মই তাই। অনন্তকাল হইতে যাহা আছে, অনন্তকালই থাকিবে, তাই চণ্ডীদাস গাইয়াছেন,—

"বাঁশির জনম না ছিল যখন,
তখন কান্দছি চাঁদ।
পিরীত রজনী না ছিল যখন,
তখন পড়েছি ফাঁদ।"

নিত্যসিদ্ধ আনন্দ, পিরীত রজনী, সবই ছিল, সবই আছে, সবই তেমনি করিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে।

প্রথম কথা, গীতিকবিতার জন্ম কোথায়, কবিতা কি? সাধারণতঃ মোটা কথায় হয় ত বলিতে পারা যায় যে, ছন্দোবদ্ধ সুর-তালে বাঁধা কথাই কবিতা। সমাজ-বিজ্ঞানবিৎ তাহার এক সামাজিক তত্ত্ব বাহির করিতে চান, মনস্তত্ত্ববিদ্ তাহার মানসিক বিশ্লেষণ করিতে পারেন। কিন্তু অন্তরের স্রষ্টা যে কবি, সে তাহার হৃদয়-মাঝারে যে স্বচ্ছ দর্পণখানি আছে, সেইখানে নয়ন ডুবাইয়া দেখে, সে উৎস কোথায়। প্রথম যুগে আদিম মানব যখন বহিঃপ্রকৃতির সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে বাস করিত, গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া তৃণ দিয়া ছাইয়া পাতা দিয়া ঘিরিয়া, কুটীর রচনা করিয়া, আপনাদের থাকিবার মত আশ্রয় করিয়া লইত, তখন হইতেই তাহাদের ভিতরে একটা সামাজিক ভাব পরস্পর পরস্পরের মধ্যে জাগিয়া উঠিত। তাহারা দলবদ্ধ হইয়া জীবন যাপন করিত। তখন তাহাদের শিক্ষা অনুশীলন, ভাব ভাষা, আচার ব্যবহারের ধারা, সম্পূর্ণরূপে তাহাদের প্রকৃতির ভিতর দিয়াই ফুটিয়া উঠিত। সেই অজ্ঞান-জাত সন্তান, জ্ঞানে পরিণত হইবার পথে, স্বাভাবিক সুখ, দুঃখ, ভাব, অভাব যেমন জানিত, তেমনি মিলিয়া মিশিয়া প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিত। পূর্ণিমা রজনীতে যখন জ্যোৎস্নার অনাবিল ধারায় ধরিত্রীকে স্নাত দেখিত, বিহগ-বিহঙ্গীর মধুর কলকাকলী শুনিত, নির্ঝরের জল ধারায় আলোড়িত উপলখণ্ডের ভাষা শুনিত, তাহারা দল বাঁধিয়া নৃত্য করিত, গান করিত, আনন্দ উদ্বেলিত হৃদয়ে অধীর হইয়া উন্মত্তবৎ কত ভাবের ও সুরের প্রকাশ করিত। পাখীর সমবেত কলরবোত্থিত গানের মত তাহাদেরও ভাষা ফুটিত, সেই প্রথম গান, সেই প্রথম প্রাণের আবেগ, সেই মানবের প্রথম রসানুভূতি ইহাই সমাজ-বিজ্ঞান-বিদের বিশদ কথা।

যেমন বিশ্বপ্রকৃতির সকল সৃষ্টি, রূপকলা সৃষ্টিও ঠিক সেইরূপ। কারণ ও অকারণের ভিতর দিয়া প্রভু এই মহারূপের বিলাস করিতেছেন, কারণ ও অকারণের মধ্য দিয়া আমরাও জীবনের সেই একই বিলাস-লীলা সাধন করিতেছি। এই যে সাধনা, এই যে সমদর্শন, ইহাই চণ্ডীদাসের শ্রেষ্ঠ দান। এই সাধনার ধারায় মানুষ জ্ঞান-যুক্ত। কবিদিগের জীবন এই ধারায় গঠিত। পাপপুণ্যের বিচার ইঁহার নাই, পাপও সত্য, পুণ্যও সত্য; তাহাদের নিবৃত্তি অবিদ্যা; তাঁহার কাছে যেমন সুন্দর, সংসারের স্বার্থপরতার খেলাও তাঁহার কাছে তেমনি মধুর। সবই তাঁহার রূপ, সব রূপ হইতেই সকলকে এ সমদর্শনের চক্ষু দিয়া দেখিবার ও অনুভব করিবার সাধনা তাঁহার প্রাণে রহিয়া আছে। তিনি সেই সাধনা সেই সমদর্শনের প্রেমলালিমায় সকলকে মোহিত করেন, নিজেও সেই সুধা পান করেন, সেই লীলার সহচর হইয়া আছেন, তাই চণ্ডীদাস গাইয়াছেন,—

"রূপ কলপাতে পারিবে মিলিতে
বুঝিবে মনের আশা।
কহে চণ্ডীদাস পুরিবেক আশ
তবে ত পাইবে সুধা।"

এই বিশ্ব সৃষ্টির রস-মাধুর্য উপভোগ। চণ্ডীদাসের চরম — নিজে আত্মহারা হইয়া এই বিশ্ব-আত্মার সহিত একাত্ম হওয়াই মনুষ্যজীবনের শ্রেষ্ঠ অনুশাসন। এই মানব-প্রাণের অন্তর-ভূমির সহিত বিশ্বপ্রাণের যে মিলন ভূমির অপরূপ দৃশ্য, এই প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়ের সহিত যে অতীন্দ্রিয় সত্য-মিলনের রস, তাহাই শ্রেষ্ঠ রূপকলার সাধ্য, তাহাই সংসার ও পরমার্থের মিলনে সম্পূর্ণ জীবন। এই মহামিলনের প্রধান দূতী প্রেম, বিশ্লেষণে কোন নূতন সম্পদ গড়িয়া উঠে না। বিশ্লেষণে প্রাণের সমগ্র অনুভূতি হয় না। বিশ্লেষণ ভাঙ্গিতে পারে, সৃষ্টি করিতে পারে না। বিশ্লেষণ আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া সমগ্রতা হইতে দূরে রাখে, একাকীত্বের অসহায় করিয়া তোলে,—একমাত্র প্রেমই এই মিলনের মহামন্ত্র সেই সর্বস্বধন। সেই প্রেমের দেবতা, পরিপূর্ণ, সরল, সহজ, সকল সোহাগ ও আদর সকলকেই বুকের ভিতর টানিয়া লন, তিনি এই সারা বিশ্বের, এ বিশ্ব তাঁহার। কবিতা যদি এই প্রেমের বাঞ্ছা না পৌঁছায়, এই প্রাণ চিন্তামণির 'মণি-কোঠা'র মণি না মিলাইতে পারে, তবে তাহা প্রাণের কবিতা নয়। গীতিকবিতা সেই প্রাণের যে অতলস্পর্শ রূপ-সাগরে ডুবিয়া সেই সাগরের কাহিনী ফুটাইয়া তুলে।

এইবার কবিতার ভাষা ও রীতির কথা। আমাদের দেশে একটা কথা আছে যে, "ছেঁদো কথায় ভুল না"—তাহার মানে ত সকলেই বুঝেন। কবিতার ছন্দ, তাল, সুর থাকিলেই যে তাহার মধ্যে সেই চিন্তামণির সাক্ষাৎকার মিলিবে, এমন ত নহেই, বরং অনেক সময়ে সেই মিলনের অন্তরায়। এইজন্যই যেখানে ভাবের দৈন্য, সেখানেই উপমার প্রাচুর্য্য। পরিষ্কার কাচ যেমন মানুষের দৃষ্টির অন্তরায় না হইয়া

ইংরাজী-শিক্ষিত নব্যসমাজ উচ্ছৃঙ্খলতা ও অনাচারকে ধর্ম্ম বলিয়া বরণ করিলেন; তখন তাঁহাদের মানসিক অবস্থা যে কি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহা রাজনারায়ণ বসু মহাশয় তাঁহার "একাল ও সেকাল" গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন। এই দলের প্রায় সকলেই কালাপাহাড়ের মত দেশের সকল বস্তুর মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া ধূলিসাৎ করিবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। দেশের যা কিছু বরণীয় বা আদরণীয় ছিল তাহা উপেক্ষিত হইতে লাগিল—ধর্ম্ম গেল, জাত গেল, সাহিত্য গেল, আদর্শ গেল এবং ভগবান্ উড়িয়া গেলেন। ইতিহাসে দেখা যায় যখন একটা দেশে বিপ্লবের সূত্রপাত হয়, তখন সেই দেশে কতকগুলি শক্তিশালী পুরুষের আবির্ভাব হয়, তাঁহারাই এই বিপ্লবের কর্ণধার-স্বরূপ হইয়া লোকাভ্যুদয়ের উদ্ধার মানসে এ জীবন-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়েন। ভারতের মধ্যে ঐ সংগ্রাম আরম্ভ হয় বঙ্গদেশে—তাই বঙ্গদেশে সে সময়ে কতকগুলি শক্তিশালী পুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল। বঙ্গসাহিত্যে এই শক্তিশালী পুরুষদের অগ্রণী মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তিনিই প্রথমে ইউরোপীয় আদর্শে বঙ্গসাহিত্য রচনার সূত্রপাত করেন, শাস্ত্রবিধানকে ছাড়িয়া স্বাধীনভাবে অনুকরণ করেন, দেশের পণ্ডিতমণ্ডলীকে 'Barren rascals' নামে অভিহিত করিয়া Dr. শিশুপালকে বর্জ্জন করিয়া, বিপরীত আদর্শে নাটক প্রণয়ন করেন, পৌরাণিক হইতে বিষয় সংগ্রহ করেন, এবং মিলটনের অনুকরণ করিতে গিয়া পাপী ও অসচ্চরিত্র রাবণকে কাব্যের নায়ক করিয়া দেশের প্রচলিত ধারণা তাহাদের আদর্শ ভগবান্ রামচন্দ্রকে খর্ব্ব করিয়া গেলেন। তাঁহার শক্তি চলিয়াছিল বিপ্লবের পথে—তাই সে শক্তি বড় সহজ শক্তি নয়। প্রাকৃতিক নিয়মই এই যে, ঝঞ্ঝাবায়ু বহিলে আকাশের দূষিত বায়ু পরিষ্কৃত হয়—মাইকেলের দ্বারাও বঙ্গের সাহিত্যাকাশ তাহার দূষিত বায়ু পরিত্যাগ করিয়া সংশোধিত হইয়াছিল, সে কথা সকলেই জানেন। যে ভারতচন্দ্রের সমর্থক হইতে পারিলেন না বলিয়া রাজা রামমোহন রায় কবিতা লিখিতে বিরত হইয়াছিলেন, সেই ভারতচন্দ্রের প্রভাব এই শক্তির মুখে তুলাবৎ উড়িয়া গিয়াছিল এবং বঙ্গসাহিত্যে একটা নূতন স্রোতের সৃষ্টি করিয়াছিল।

কিন্তু যেমন একদিকে আকাশ পরিষ্কৃত হইল, তেমনি আর একদিকে মেঘ দেখা দিল। সাহিত্যে এক অনাচারের স্থানে অপর অনাচার প্রবেশ লাভ করিল। আমাদের সমাজ যতই অবনত হউক, তথাপি সেখানে ত্যাগের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাহার পরিবর্ত্তে স্ব-স্ব-প্রধানতার আদর্শ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। এই আদর্শ বঙ্গের একান্নবর্ত্তী পরিবারের মিলন চূর্ণ না করিলেও আমাদের সহিত সহানুভূতি যেরূপ সম্বন্ধে পবিত্র ছিল সেই মিলন বন্ধন শিথিল করিল। সমাজে যে পরিবর্ত্তন সূচিত হইল, তাহার মূলমন্ত্র আত্মসম্প্রসারণ। আগে যাহা হিন্দু-যৌথ পরিবারের অঙ্গ বলিয়া গণ্য হইত, এখন হইতে তাহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল, পূর্ব্বে মা ছিলেন দেবী, এখন শুধু ঘরের গৃহিণী—তাঁহার অধিক সম্মান আর তাঁহার রহিল না। এ সম্মানটুকুও যেন অনুগ্রহের। যে দাবীর জোরে তিনি সে সম্মান আদায় করিয়া লইতেন এখন আর সেই জোরটুকু যেন রহিল না। ইউরোপের লোকে স্ত্রী লইয়া সংসার পাতিত

করে না, তাহারা পত্নী লইয়া পৃথক্‌রূপ উদ্যান রচিত করে, তাহাদের কাছে পিতার পরিবারের চেয়ে নিজের পরিবারের মূল্য অনেক বেশী, অতএব সেই নব্য আদর্শের কাছে দেশীয় প্রাচীন আদর্শটি—মাতৃভক্তিযুক্ত আদর্শটি—ম্লান হইয়া গেল।

এ স্রোতের একফল শুধু যে গৃহেই প্রকাশিত হইয়া ক্ষান্ত হইল, তাহা নহে, সাহিত্যেও উহার প্রভাব দেখা দিতে আরম্ভ করিল। সাহিত্যে মাতৃচিত্র বিরল হইতে লাগিল। যেখানে বা সে চিত্র রহিল সেখানেও তাহা অপ্রধান চরিত্র হিসাবে। 'মেঘনাদ বধে' প্রমীলার স্থান প্রবীরার অনেক নীচে। এই হইল অনর্থের সূত্রপাত। তখন একটা নূতন সাহিত্য গঠনের যুগ—সে যুগ অনুপ্রাণিত হইল পাশ্চাত্য ভাবে। ঈশ্বর গুপ্তের গিরেকড়া চাবুক বড় কিছু করিতে পারিয়াছিল এমন মনে হয় না। ফলে বাঙ্গালীর নূতন সাহিত্যের মান আদর্শ কমিতেই লাগিল। এ সাহিত্য মাতৃ-স্নেহরসে সিক্ত হইয়া পবিত্র হইল না, ইহা পত্নীপ্রেম বা অন্য পত্নীর আকাঙ্ক্ষা লইয়া রঙ্গভূমে অবতীর্ণ হইল। কিন্তু পত্নীপ্রেমের আদর্শও নির্ণয়াছিল? তাই এ প্রেমেও বিলাতী ছাপ পড়িল। তাই স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার উজ্জ্বল প্রতিভা লইয়া আসরে নামিলেন—'এই বুঝি আমার প্রাণেশ্বর' এমনি বিলাতী কায়দা লইয়া। 'দুর্গেশনন্দিনী' বাঙ্গালায় একটা নবযুগ আনয়ন করিল সত্য, কিন্তু উহাতে মাতৃস্নেহ চিহ্নমাত্র নাই। আয়েষা ও তিলোত্তমা দুইটি চরিত্রই বিলাতী ছাঁচে ঢালা। বঙ্কিমের এক একটি পুস্তক সৌন্দর্যের খনি, কলার আধার, সাহিত্য-শিল্পের সুনিপুণ অভিব্যক্তি—সে কথা একশতবার বলিব, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিতে হইবে যে প্রথম প্রথম তাঁহার প্রতিভা পাশ্চাত্য আদর্শেই বিশেষভাবে পরিপুষ্ট হইয়াছিল। তিনি সেক্সপীয়রেরই মত মনুষ্যপ্রকৃতির গতি ও ভাবরাশি ও কত নানাপ্রকার চিত্র আঁকিয়াছেন, কালিদাসের মত সৌন্দর্য সৃষ্টি করিয়াছেন, অন্যান্য অনেক মহান ভাবের লীলাও দেখাইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সৃষ্ট এই অপূর্ব সাহিত্য মাতৃচিত্রহীন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার 'দুর্গেশনন্দিনী,' 'কপালকুণ্ডলা,' 'মৃণালিনী,' 'চন্দ্রশেখর'-প্রমুখ কাব্য হইতেও এ অংশ নিষ্ফলায়। 'কৃষ্ণকান্ত' বা 'বিষবৃক্ষে' যে মাতৃচিত্র আছে, তাহা যেন স্ফুরিত, স্পষ্ট হয় নাই। এত সংক্ষেপে ব্যক্ত হইয়াছে যে আমরা উহার রস উপভোগ করিতে পাই না, উপভোগ করিবার সময়ই পাই না। এই চিত্রগুলি মাতৃস্নেহের প্রকৃত প্রতিকৃতি, আমাদের হৃদয় টানিয়া নিতে পারে না। 'দেবীচৌধুরাণী'তে ও পবিত্র রূপে উর্মিলায় কবি মাতৃহৃদয়ের চিত্র আঁকিয়াছেন। প্রথমটি অতি সংক্ষিপ্ত এবং দ্বিতীয়টি তত্ত্বাধিনীর চরিত্রের পাশে যেন নিষ্প্রভ। তবু এ সময়ে বঙ্কিম বিদেশীয় প্রভাবের হাত হইতে প্রায় সম্পূর্ণ মাত্রায় নিষ্কৃতি পাইয়াছিলেন।

তবে বঙ্কিমচন্দ্র কি মাতৃহৃদয় বুঝিতেন না? মনুষ্য হৃদয় যাঁহার প্রতিভার কাছে উন্মুক্ত ছিল, বিশেষতঃ যিনি স্ত্রী-হৃদয়কেই বিশেষ ভাবে বুঝিতেন, তিনি কি মা চিনিতেন না? যে কয়েকটি স্থলে তিনি মাতৃহৃদয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন, সেইখানেই আমরা বুঝিয়াছি যে কবি মাতৃস্নেহের মহিমা জানিতেন। তাঁহার অধিকাংশ গ্রন্থেই

মাতৃচিত্র একেবারে নাই, এমন কি শেষ বয়সে তিনি যে কয়েকটি পুস্তক প্রণয়ন ও পরিবর্ত্তন করেন, তাহাতে দেশীয় ভাবের প্রাবল্য থাকিলেও মাতৃচিত্র নাই বা ফুটে নাই। যে কয়খানি গ্রন্থে মার কথা আছে তাহাও গৌণভাবে। 'কৃষ্ণকান্তের উইল'এ গোবিন্দলালের মাতা আছেন যেন কাশী যাইবার জন্যই—অর্থাৎ গোবিন্দলাল কর্ত্তৃক ভ্রমর-ত্যাগের উপলক্ষমাত্র হইয়া। সংসারে মা রহিয়াছেন, অথচ গোবিন্দলাল সব বিষয়ে পরামর্শ করে ভ্রমরের সঙ্গে মার কথা ভাবেও না। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' নায়িকা-প্রধান কাব্য, মাতৃ-প্রধান নহে। তারপর 'রজনী'। 'রজনী'তে গ্রন্থ-নায়কের একটি মা আছেন কবি একথা বলিয়াছেন কিন্তু সেই মা-টিকে কবি একেবারে লুকাইয়া ফেলিয়াছেন তিনি রহিলেন লোকলোচনান্তরালে, রোগশয্যায়—তাঁহার স্থান দখল করিলেন "ললিতলতা," যুবতী বিমাতা। 'রজনী'কে যদি একমুহূর্ত্তের জন্যও সামাজিক উপন্যাস বলিয়া ভাবিতাম তাহা হইলে নিশ্চয় বলিতাম যে ইহা একটা অনাসৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু 'রজনী'তে কবি অপূর্ব্ব কৌশলের ও সৌন্দর্য্যের সাহায্যে কতকগুলি তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন মাত্র, তাই সেকথা বলিতে পারিলাম না। তাহা না বলিতে পারিলেও, একথা বলিবার বাধা নাই যে 'রজনী'তে মাতৃচিত্র খর্ব্ব হইয়াছে। 'বিষবৃক্ষে' কমলমণি খোকাকে লইয়া মাতৃস্নেহ একটুখানি করিয়াছে, কিন্তু সে নিতান্তই শিশুমাত্র। দেবীচৌধুরাণী'তে প্রফুল্ল ও প্রফুল্লের মাতাকে লইয়া পুস্তক আরম্ভ এবং আরম্ভেই মাতা শেষ হইয়া গেলেন। বলিয়াছি যে 'ইন্দিরা'য় কবি মার প্রতিনিধির অবতারণা করিয়াছেন, কিন্তু সে চিত্রও যেন অস্বাভাবিক ভাবে চিত্রিত। এমন কেন হইল? ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে, বঙ্কিমচন্দ্র যে সময়ে ও যে অবস্থায় বঙ্গের নবসাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাই আমাদিগকে স্মরণ করিতে হইবে।

যে সময়ের কথা আমরা বলিতেছি সে সময়ে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সহিত দেশের জনসাধারণের বিচ্ছেদ প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছিল তখনকার সাহিত্যিকগণ জনসাধারণকে লক্ষ্যীভূত করিয়া সাহিত্য রচনা করিতেন না, করিবার প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি করেন নাই বিলাতী সমাজে মায়ের প্রতিপত্তি নাই কাজেই বিলাতী উপন্যাসে, কাব্যে, নাটকে কোথাও মার তেমন আদর নাই। সেখানে স্ত্রীকে অথবা প্রেমিক-প্রেমিকাকে অবলম্বন করিয়া সাংসারিক লীলা—তাই বিলাতী সাহিত্য নায়ক-নায়িকা-প্রধান। বঙ্গের নবযুগের নবসাহিত্য যে এই ভাববর্জ্জিত হইবে তাহা আশা করা অন্যায়, কারণ কোনও কালের কোনও সাহিত্যই কালের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারে নাই বঙ্কিমচন্দ্র যদিও নবসাহিত্যিকদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে এই প্রভাবকে অতিক্রম করিতে পারিয়াছিলেন, তথাপি উহা যে তাঁহার হৃদয়ে বিলক্ষণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহার প্রমাণের কিছুমাত্র অভাব নাই—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ, আমরা এতক্ষণ যাহা বলিতেছি, তাঁহার কাব্যে মাতৃগৌরবের হানি। সে সময়ের সাহিত্যে এ দোষ রহিয়া গিয়াছে।

কাব্য রচনা করিলেন। 'মেঘনাদ বধ'এ দোষ থাকায় তাহা নিন্দনীয় হইয়াছে, ইহাদেরও কাব্যে সেই দোষ আরও একটু অতিরিক্তমাত্রায়। এ তিনখানি কাব্যও বাস্তব জাতীয় কাব্য হইতে পারে নাই, কিন্তু এখানে সে কথার বিচার নিষ্প্রয়োজন। সে যাহাই হউক, নবীনবাবুর আত্মজীবনী হইতে আমরা জানিতে পারি যে মহাকবি বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীতে মাতৃচিত্র প্রকৃতরূপে চিত্রিত না হওয়ার অভাব তিনি অনুভব করিয়াছিলেন। তিনি এই কাব্য ত্রিশূল অর্থাৎ "রৈবতক, প্রভাস ও কুরুক্ষেত্রে" মাতৃভক্তি-চিত্র অঙ্কিত করিলেন বঙ্কিমের এ অভাব পূর্ণ করিবার জন্য, বঙ্কিমের মাতৃত্বের একটা আদর্শ সৃষ্টি করিবার জন্যও বটে। কিন্তু সে চিত্র, বিদেশী আদর্শে গঠিত হওয়ায় এবং মাতৃহৃদয়ের স্বাভাবিক চিত্র না হওয়ায় পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করিতে পারিল না। এ কথা আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি এবং আবার বলিতেও কুণ্ঠিত নহি। একটা বড় বস্তুকে আদর্শ সৃষ্টি করিব বলিয়া পণ করিয়া বসিলে কেমন কৃত্রিমতা দোষ আপনি আসিয়া পড়ে, এ কাব্য গুলিতেও সেই দোষ স্পষ্ট। যা যাহাই হউক সাহিত্যে মাতৃস্থানের পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার পথ যে তাঁহার নিশ্চয়ই প্রাপ্য। কবি নবীনচন্দ্র যদি বেদব্যাসকে অতিক্রম না করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের উপদেশ-মত চলিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় ভালই হইত। তাহা না করায় তাঁহার সাধনা ও উদ্দেশ্য অনেক পরিমাণে ব্যর্থ হইয়াছে। তথাপিও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বাঙ্গালাকে তাঁহার নিকট ঋণ স্বীকার করিতেই হইবে।

দ্বিতীয় মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ। তাঁহার জীবন ও কর্ম বুঝিবার সময় এখনও আসিয়াছে কি না সন্দেহ, কিন্তু এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, তাঁহার নাটকাবলীতে মাতৃমূর্ত্তি উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত, মাতৃমহিমা বিশেষ ভাবে ঘোষিত। গিরিশচন্দ্রের মাতৃভক্তি তাঁহার গ্রন্থাবলীতে ফুটিয়াছে, মার স্নেহ যে কি অপূর্ব্ব পদার্থ তাহা তিনি জীবনে যেমন দেখিয়াছিলেন ও বুঝিয়াছিলেন তেমনি তাঁহার পরিণত নাটকগুলিতে দেখাইয়াছেন ও বুঝাইয়াছেন। যাঁহারা কোনও একটা সম্প্রদায়ের বশবর্ত্তী না হইয়া গিরিশচন্দ্রের নাটক চর্চ্চা করিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই মুক্তকণ্ঠে সাক্ষ্য দিবেন যে গিরিশচন্দ্র বঙ্গসাহিত্যকে যে অমূল্য উপহার দিয়াছেন—যে মহতী শিক্ষায় বাঙ্গালীকে অনুপ্রাণিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন—যদি বাঙ্গালী তাহা অন্তরের সহিত ধারণা করিবার মত হয় তাহা হইলে বঙ্গনারীর চরিত্র উন্নত হইবে। সে কথার পরিচয় ভবিষ্যতে কোনও দিন দিবার আশা রহিল, এখন এইটুকু মাত্র বলিবার বিষয় যে গিরিশচন্দ্র কি সামাজিক কি পৌরাণিক, কি ঐতিহাসিক, তাঁহার সর্ব্ববিধ নাটকেই বিপুল হস্তে মার মূর্ত্তি গঠিত করিয়া বঙ্গনারীকে উপহার দিয়াছেন। বঙ্গসাহিত্যের নবযুগে চারি বিভাগে চারিজন মহাকবির উদয় হইয়াছে। যাঁহারা সাহিত্যের এই চারি বিভাগ সুসম্পন্ন করিয়া সাহিত্যকে পূর্ণতার পথে অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন—কাব্য-বিভাগে মধুসূদন, উপন্যাস-বিভাগে বঙ্কিমচন্দ্র, নাটক বিভাগে গিরিশচন্দ্র এবং কাব্য বা গীতিকাব্য-বিভাগে রবীন্দ্রনাথ। ইঁহাদের মধ্যে মাতৃচিত্র অঙ্কনে গিরিশ-চন্দ্রেরই প্রাধান্য, সে বিষয়ে সূক্ষ্মদর্শী পাঠকদিগের ভিতর মতদ্বৈধ হইবার সম্ভাবনা

নাই। গিরিশচন্দ্রের মনুষ্য-হৃদয়জ্ঞতা তাঁহার প্রায় সকল চিত্রেই সুব্যক্ত, তাঁহার মাতৃচিত্রগুলিও তাই অস্বাভাবিকতার দোষে দুষ্ট হয় নাই, ইহাই তাঁহার মাতৃচিত্রের বিশেষত্ব। তাঁহার একটি সমগ্র নাটক এই মাতৃগৌরবের উপর প্রতিষ্ঠিত — এই নাট্যকাব্য তাঁহার পৌরাণিক নাটক 'জনা'।

'জনা' নাটকখানির সমালোচনা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে — অন্য কোনও সময়ে তাহা করিবার ইচ্ছা রহিল, কিন্তু এ কথাটুকু বলা অপ্রাসঙ্গিক নহে যে, এই নাটকে কবিবরের যে শক্তি ব্যক্ত হইয়াছে তাহা তাঁহার অন্যান্য শক্তি-ব্যঞ্জক নাটকগুলির মধ্যেও দুষ্প্রাপ্য। যে কার্য নবীনবাবুর আদর্শ রমণী ও মাতৃ চরিত্র সাধিত করিতে পারেন নাই, জনা তাহা সাধিত করিয়াছে। বঙ্গের রঙ্গালয়সমূহে "জনা"র গৌরব এখনও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে ও বোধ হয় চিরদিন থাকিবে। ইহার ফলে কত সহস্র লোকের মনে লুপ্তপ্রায় মাতৃমহিমার ছবি জাগিয়া উঠিয়াছে ও জাগাইয়া তুলিবে তাহার ইয়ত্তা নাই। কারণ নাটকখানি প্রধানতঃ মাতৃগৌরবের উপর প্রতিষ্ঠিত, কবি উজ্জ্বল অক্ষরে নির্দেশ করিয়াছেন যে, জগতে মাতৃ-আশীর্বাদই সন্তানের অক্ষয় কবচ, মাতৃসেবাই প্রধান ধর্ম ও পুণ্য — মার মনে কষ্ট দেওয়াই সকল বিপদের মূল। তিনি যে পথে চলিয়া এই শিক্ষা দিয়াছেন তাহাই হিন্দুদের চিরদিনের পথ — তাই তাঁহার শিক্ষায় যে কাজ হইয়াছে তাহা স্থায়ী-ফলপ্রসূ বলিয়া মনে হয়। অথচ এই মাতৃত্ব তিনি কোথাও কোমলতার আবরণে দুর্বল করিয়া ফেলেন নাই। পাঠক ও দর্শক বীররমণীর অপূর্ব প্রতিমূর্তি দেখিয়া রোমাঞ্চিত হইয়াছে, পুত্রবাৎসল্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হইয়াছে, আবার মাতৃস্নেহের অমৃতস্পর্শে স্নিগ্ধ ও পবিত্র হইয়াছে। নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্রের শিক্ষা এস্থলে নিষ্ফল হয় নাই — বঙ্গসাহিত্যিকগণের হৃদয়ে আবার মাতৃমহিমা জাগিয়া উঠিয়াছে — তাই 'জনার কথা' একটু বিস্তৃতভাবেই বলিলাম।

নবীন নাট্য-সাহিত্যে গিরিশচন্দ্রের পরেই কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের স্থান। ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রভৃতি অন্যান্য নাট্যকারগণও গিরিশচন্দ্রের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত। কবিবর ডি. এল. রায়ের 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে ও 'পরপারে' নামক সামাজিক নাটকে মাতৃহৃদয়ের মহিমা প্রকাশিত হইয়াছে। ক্ষীরোদপ্রসাদের 'উলুপী' নাটকেও মাতৃমহিমা কীর্তিত হইয়াছে — পূর্বে বলিয়াছি। ফলতঃ এখন সাহিত্যের হাওয়া বদলাইয়াছে — বুঝি আমরাও একটু বদলাইয়াছি। কিন্তু এখনও আমাদের সমাজ-মন্দিরে মাতৃদেবীর পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণ হইয়াছে এমন মনে হয় না, — আমাদের স্ব-প্রাধান্য এখনও প্রবল, তাই এই ক্ষুদ্র নিবন্ধের অবতারণা করিলাম। রমণীর পূর্ণতা মাতৃত্বে — মাতৃত্বের পূর্ণাভিষেকে আমাদের মঙ্গল। তাই বঙ্গসাহিত্যে মার আসন যত বাড়িবে ততই উহা পবিত্র হইবে এবং আমাদেরও পবিত্র করিবে।

[মানসী ও মর্ম্মবাণী, ১৩২৩]

সাহিত্যে "রূপান্তর"

বিপিনচন্দ্র পাল

সকল সাহিত্যেই মাঝে মাঝে এমন এক একটা কথার সৃষ্টি হয়, যাহাতে জনসাধারণের চিন্তাতে একটা যুগান্তর আনিয়া দেয়।

'সাহিত্যের রূপান্তর' কথাটি, আমার মনে হয়, এই জাতীয়।

প্রথমে যখন এই কথাটি ব্যবহৃত হইয়াছিল, সাধারণ লোকে ইহার অর্থ বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই, তবে ইহাতে যে বুঝিবার বস্তু আছে, এ ধারণা অনেকেরই জন্মিয়াছিল। কথাটি এখনও সকলে ভাল করিয়া ধরিতে পারেন নাই। ধরিতে পারিলে সাহিত্য-সমালোচনায় একটা নূতন বিজ্ঞানের সূত্রপাত হইবে।

সাহিত্য বলিতে এক্ষেত্রে রস-সাহিত্যকেই বুঝিতে হইবে। ব্যাপক অর্থে আজিকালি সাহিত্য শব্দে গণিত, দর্শন, ইতিহাস, জড়বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান প্রভৃতি যাবতীয় লিপিবদ্ধ জ্ঞানকেই বুঝায়। ইংরাজিতে এ সকলই লিটারেচারের (literature) অন্তর্গত। কিন্তু যে সাহিত্যের রূপান্তরের কথা বলা হয়, তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে গণিত, দর্শন, ইতিহাস, জড় বা জীববিজ্ঞানাদির কোনও সম্বন্ধ নাই। গণিতের বা দর্শনের, ইতিহাসের বা ভূতত্ত্বের বা রসায়নের বা জড়বিজ্ঞানের বা physics এর কথা যখন সাহিত্যের অন্তর্ভূত হয় অর্থাৎ কোনও গণিতবিদ্ বা দার্শনিক বা ঐতিহাসিক বা ভূতত্ত্ববিদ্ বা রাসায়নিক বা জড়বিজ্ঞানবিদ্ যখন আপনাপন গবেষণাদিকে লিপিবদ্ধ ও গ্রন্থনিবদ্ধ করিয়া কোনও সাহিত্যের অঙ্গ-পুষ্টি সম্পাদন করেন, তখন তাঁহাদের এ সকল রচনাতে গণিতের বা দর্শনের, ইতিহাসের বা ভূগোলের, জড়বিজ্ঞানের বা জীববিজ্ঞানের সত্য ও তথ্যসকল কোনও প্রকারের রূপান্তর প্রাপ্ত হয় না। ইঁহারা যে বস্তু বা ব্যাপারকে যে ভাবে দেখেন, ঠিক সেই ভাবেই তার বর্ণনা করিয়া থাকেন। আকাশের জ্যোতিষ্কগুলি যেখানে যে ভাবে ও যে কালেতে যে সকল সম্বন্ধেতে আবদ্ধ হইয়া দূরবীক্ষণের প্রত্যক্ষীভূত হয়, জ্যোতির্বিদ্যায় তাহাদের সেই সংস্থান ও সেই সম্বন্ধই বর্ণিত হইয়া থাকে। দ্রষ্টার অন্তরের রসানুভূতির দ্বারা তাহাতে কোনও প্রকারের রং ফলিয়া উঠে না।

এই রং ফলানটা দর্শনের বা জ্ঞানের কর্ম্ম নহে। আমাদের অন্তরের যে বৃত্তির দ্বারা আমরা বস্তু-সাক্ষাৎকারে সুখ বা দুঃখ, কিংবা হাস্য, অদ্ভুত, করুণ, রুদ্র, বীর, বীভৎস, ভয়ানক প্রভৃতি রস আস্বাদন করিয়া থাকি, সেই বৃত্তিই এ সকল বস্তুতে এ সকল রসের রং ফলাইয়া থাকে। এইজন্য এই বৃত্তিকে রঞ্জিনী বৃত্তি কহে। এই রঞ্জিনী বৃত্তির দ্বারাই যাবতীয় রসানুভব ও এই রসানুভূতির ফলে সমুদায় রস-সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়া থাকে।

আলোক-বিজ্ঞান বর্ণের ধর্ম্ম পৃথক্ করিয়া বিশ্বের অপূর্ব্ব বর্ণ-বৈচিত্র্যের নিদান নির্ণয় করিয়া থাকে। যে বর্ণটি যেভাবে যেখানে প্রকাশিত হয় কিরূপে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ-সমাবেশে আকাশের মেঘমণ্ডলে নানা প্রকারের রং লীলা প্রকটিত হয় অথবা কি সূত্রে বনস্থলীতে পত্র পল্লব-পুষ্পাদিতে বিচিত্র বর্ণ সকল ফুটিয়া উঠে, আলোক-বিজ্ঞান কেবল তাহাই ব্যক্ত করে। কিন্তু শারদীয় উষার উদ্ভিন্ন আলোকে হিমানী-মণ্ডিত অভ্রভেদী গিরিশৃঙ্গের বর্ণ-বিলাস দেখিয়া কবির বা ভাবুকের প্রাণের মর্ম্মে মর্ম্মে যে আনন্দলহরী জাগিয়া উঠে আলোক-বিজ্ঞান তাহার খবর রাখে না।

সেইরূপ বিশ্বের বিচিত্র ধ্বনিসকলের অনুভূতিকে ধরিয়া কিরূপে কোন্ সূত্র কোন্ বাহন অবলম্বন করিয়া, এ সকল শব্দ বিদ্যুদ্বেগে ছড়াইয়া পড়ে, শব্দের সহিত আমাদের শ্রুতিযন্ত্রের কি সম্বন্ধ, আমরা যে সকল শব্দ বা ধ্বনি উচ্চারণ করি, তার সঙ্গে আমাদের কণ্ঠনালীর কি সম্বন্ধ, সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা অথবা প্রকৃতির মূল উৎপত্তি ও লক্ষণ কি,—ধ্বনি-বিজ্ঞান বা acoustics তাহারই সত্য ও তথ্য নির্দ্ধারণ করিয়া থাকে। কিন্তু এ সকল ধ্বনির যোগে মানুষ সঙ্গীতের সৃষ্টি করিয়া কিরূপে যে আপনার অন্তরের বিবিধ রসানুভবকে ব্যক্ত ও সঞ্চারিত করে, সে কথা শব্দ-বিজ্ঞান জানে না। কেন যে প্রত্যুষে ভৈরবীর আলাপ শুনিয়া আমাদের মর্ম্মের স্তরে স্তরে জীবনের তরঙ্গ নাচিয়া উঠে, আবার কেনই বা মধ্যরাত্রে বেহাগের আলাপ শুনিয়া আমাদের চিত্তের উপরে অদ্ভুত নিস্তব্ধতা আসিয়া ছাইয়া পড়ে, কিম্বা সায়াহ্নের প্রাক্কালে, সূর্য্য যখন পশ্চিম গগনে ডুবিতে থাকে আসন্ন অন্ধকারের ভয়-ভাবনায় পাখীরা যখন আপন আপন কুলায়ে প্রতিনিবৃত্ত হয় পথ-শ্রান্ত পথিক যখন প্রান্তর-মধ্যে পথ চলিতে চলিতে গৃহাভিমুখে যাইয়া আশ্রয় লইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে, তখন পূরবীর আলাপ শুনিয়া আমাদের প্রাণ, ঘরে বসিয়াই, কেন উদাস হইয়া উঠে,—এ সকল খবর শব্দ-বিজ্ঞান বা acoustics কিছুই রাখে না।

সেইরূপ দেহ-বিজ্ঞান বা physiology, অস্থি-বিজ্ঞান বা anatomy জীবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের, পেশি ও অস্থিসমূহের অস্থিসন্ধির সন্ধান করিয়া, কোথায় কি ভাবে কোন্ পেশী বা কোন্ অস্থি সমাবিষ্ট, তাহাই কেবল বলিয়া দেয়। কিন্তু এই রক্ত-মাংসের, এই অস্থিপেশির দেহযষ্টি দেখিয়া, আমাদের অন্তরে যে সকল অনুরাগ বা বিরাগের সঞ্চার হয়, তার কথা দেহ-বিজ্ঞান বা অস্থি-বিজ্ঞান কিছুই জানে না, কিছুই বুঝে না। এই অনুরাগ বা এই বিরাগে আমাদের চক্ষে একই দেহ-যষ্টির যে সকল রূপান্তর ঘটে, তার কথা বিজ্ঞান বা দর্শন জানে না, বুঝে না, বলিতে পারে না। এ রূপান্তর ঘটায় আমাদের অন্তরের রঙ্গিণী বৃত্তি। এই রূপান্তরের সংবাদ বহন করিয়া থাকে রস-সাহিত্য বা কল্প-সাহিত্য।

বর্ণ-বিজ্ঞান জগতের রূপমহলে যাহা দেখে না, চিত্রকর তাহা দেখেন। শব্দ-বিজ্ঞান আকাশের শব্দ-ভাণ্ডারে যাহা শুনিতে পায় না, গায়ক এবং সঙ্গীতজ্ঞ তাহা

শোনেন। দেহ-বিজ্ঞান বা অস্থি-বিজ্ঞান জীবদেহের মধ্যে যে বস্তুর কোনও সন্ধান পায় না, চিত্রকর ও তাঁহার প্রাণ প্রত্যক্ষ করিয়া তাহা ফুটাইয়া তুলিয়া যান। জ্যোতির্বিদ্ গুরুলক্ষ গ্রহ-খচিত শূন্য-বিস্তৃত গগন-পটে যে ছবি দেখেন না, কবি তাহা দেখিয়া বিস্মিত ও বিভোর হইয়া যান। এইরূপ ভাবে এ সকল ক্ষেত্রে, চিত্রকর, গায়ক, ভাস্কর ও কবির অন্তরের প্রস্ফুট বহির্মুখী বৃত্তি বর্ণনা সাধন জীবদেহের কিংবা বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে যাহা কেবল বাহ্য ও বাহিরের পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাহাকে আপনার প্রাণের রস-এ রঞ্জিত করিয়া, তার অদ্ভুত রূপান্তর ঘটাইয়া থাকেন। এই বস্তুকেই সাহিত্যের রূপান্তর বলিতে পারা যায়।

আমাদের দেশের প্রাচীনেরা পঞ্চকোষের কথা কহিয়াছেন। প্রথম অন্নময় কোষ। আমরা আজিকালি যাহাকে জড়বিজ্ঞান বলি, ইংরাজিতে যাহাকে physico-chemical group of the sciences বলিতে পারা যায়, এই অন্নময়কোষই তার অধিকার। এই কোষের প্রতিষ্ঠা আমাদের পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়তে। তার উপরে বা ভিতরে প্রাণময় কোষ। এই প্রাণময় কোষই আধুনিক জীববিজ্ঞান—ইংরাজীতে যাহাকে biological group of the sciences বলে,—তার অধিকার। এই কোষের প্রতিষ্ঠা আমাদের প্রাণানুভূতিতে। তারপর মনোময় কোষ। এই কোষের প্রতিষ্ঠা আমাদের মনোবৃত্তিতে, মনস্তত্ত্ব বা psychological group of the sciences এর অধিকার এই কোষেতে। তার উপরে বা অভ্যন্তরে বিজ্ঞানময় কোষ। আমাদের অন্তরের যে বৃত্তির দ্বারা আমরা আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বস্তুর মধ্যে একত্বের খণ্ডের মধ্যে অখণ্ডের, অংশের মধ্যে অংশীর, বৈষম্যের মধ্যে সাম্যের প্রত্যক্ষ ও প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকি, যে বৃত্তির দ্বারা, এক কথায় আমরা যাবতীয় বিজ্ঞানাদি গড়িয়া তুলি, সেই বৃত্তিতে এই বিজ্ঞানময় কোষের প্রতিষ্ঠা। দর্শনের বা তত্ত্বজ্ঞানের (metaphysics বা philosophyর) অধিকার এই কোষে।

এই কোষ-চতুষ্টয়ের মধ্যে অন্নময় কোষ একান্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। রূপ-রস-শব্দ স্পর্শাদি এই কোষের উপাদান। পঞ্চেন্দ্রিয় পঞ্চতন্মাত্র ও পঞ্চমহাভূতের উপরে এই কোষ প্রতিষ্ঠিত। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বলিয়া এই অন্নময়কোষের জ্ঞান-লাভ সম্ভব। এই জন্য কোষ-পঞ্চকের মধ্যে এই অন্নময় কোষ সর্ব্বাপেক্ষা স্থূল। ইহা জীবের বাহ্যতম আবরণ।

তার পর প্রাণময় কোষ। প্রাণ-বস্তুর প্রমাণ ইন্দ্রিয়ানুভূতি, সত্য, কিন্তু ইন্দ্রিয়গুলি এই প্রাণ যে আছে কেবল তাহাই বলিতে পারে, এই প্রাণের স্বরূপ কি, তাহা বলিতে পারে না। এই প্রাণ বস্তু ইন্দ্রিয় ও অতীন্দ্রিয়ের মধ্যবর্ত্তী প্রথম সোপান-রূপ হইয়া আছে। এই প্রাণের এক দিকে ইন্দ্রিয়গুলি ও অন্য দিকে মন। প্রাণের এক প্রান্তে senses আর অন্য প্রান্তে psyche, এক দিকে বিষয়াপেক্ষী দর্শনাদি ইন্দ্রিয়, অন্য দিকে এ সকল ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা মন। ইন্দ্রিয়কে

ধরিয়া যেমন প্রাণের জগতে যাইয়া পড়ি, এই প্রাণকে ধরিয়া সেইরূপ মনোময় জগতে যাইয়া উপস্থিত হই। এই জন্যই অন্নময় কোষ ও মনোময় কোষের মধ্যে এই প্রাণময় কোষ সেতুস্বরূপ হইয়া আছে।

তার পর মনোময় কোষ। এই মনোময় কোষেই আমরা সর্ব্বপ্রথমে ইন্দ্রিয়াতীত নাদের সাড়া পাই। ইন্দ্রিয়ের প্রতিষ্ঠা এক দিকে অন্নেতে, অর্থাৎ পঞ্চতন্মাত্রে, ও পঞ্চমহাভূতে, আর অন্য দিক প্রাণে। ইন্দ্রিয়ের আশ্রিত অন্নময় জগৎ, ইন্দ্রিয়ের আশ্রয় প্রাণ। ইন্দ্রিয়ের প্রতিষ্ঠা প্রাণে, প্রাণের প্রকাশ ইন্দ্রিয়ে। ইন্দ্রিয় যেমন বিষয় ছাড়া নহে, প্রাণ সেইরূপ ইন্দ্রিয় ছাড়া নহে। কিন্তু মনের মধ্যে বিষয়ের অবর্ত্তমানেও ইন্দ্রিয়রসের প্রত্যক্ষ ও অনুভব হয়। মন অনুপস্থিতকে উপস্থিত, অবর্ত্তমানকে বর্ত্তমান, অপ্রত্যক্ষকে প্রত্যক্ষ বলিয়া ধারণ করিতে পারে। এই জন্য মন ইন্দ্রিয়ানুভূতির স্মৃতি বা আভাসমাত্র গ্রহণ করিয়া, আপনার মধ্যে বিবিধ বিষয়ের সৃষ্টি করিতে পারে। এই জন্যই ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠযোগে আবদ্ধ হইলেও, মনের এমন শক্তি আছে, যাহাতে ইন্দ্রিয়ের অপ্রত্যক্ষ বিষয়কে সে আপনার মধ্যে প্রত্যক্ষ করিতে পারে এবং পূর্ব্ব-প্রত্যক্ষ বিবিধ ইন্দ্রিয়ানুভবকে মিলাইয়া মিশাইয়া, অভূতপূর্ব্ব বস্তুর সৃষ্টি করিয়া থাকে। নৃ-শৃঙ্গ, আকাশ-কুসুম এই সকলই এই জাতীয় মানস-সৃষ্টি। ইংরাজিতে এ সকলকে fancy creation বলা যায়।

এই জাতীয় মানস-সৃষ্টিতেও এক প্রকারের রূপান্তর হয় বটে, কিন্তু এখানে যে রূপান্তরের কথা হইতেছে, যে রূপান্তর রস-সাহিত্যের প্রাণস্বরূপ, ইহা সে জাতীয় রূপান্তর নহে। ফলতঃ ইহাকে রূপান্তর না বলিয়া রূপ-নির্ম্মাণ বলা যাইতে পারে। কেহ কখনও মানুষের শিং দেখে নাই, তবে অন্য জন্তুর শিং দেখিয়াছে। সে সকল জন্তুতে যে শিং দেখা গিয়াছিল, সেই শিংকে মানুষের মাথায় বসাইয়া নৃ-শৃঙ্গের সৃষ্টি হইয়াছে। মানুষ এবং শৃঙ্গ দুই ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ বস্তু। নৃ-শৃঙ্গে এই দুই ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ বস্তুর নিজস্ব বিশিষ্ট রূপের কোনও বিপর্য্যয় বা পরিবর্ত্তন ঘটে না। মানুষ মানুষই থাকিয়া যায়, আর শৃঙ্গও শৃঙ্গই থাকিয়া যায়, মানুষও বদলায় না, শৃঙ্গও বদলায় না। কেবল যাহা ভিন্ন স্থানে ভিন্ন সম্বন্ধে ছিল, তাহাকে এক করিয়া এই নৃ-শৃঙ্গের উৎপত্তি হইয়াছে। আকাশ-কুসুম সম্বন্ধেও তাহাই ঘটে। আকাশও প্রত্যক্ষ বস্তু, কুসুমও প্রত্যক্ষ বস্তু। কিন্তু আকাশে কুসুম ফোটে না, গাছে বা লতাতেই ফোটে। আকাশ-কুসুমে আকাশে ও কুসুমের মধ্যে যে সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা হয়, তাহাই অপূর্ব্ব। এই সম্বন্ধ দুইটি পূর্ব্বদৃষ্ট বস্তুর মিলনে রচিত। এই সম্বন্ধ বাস্তব নহে, কল্পিত। এই সম্বন্ধে আকাশের আকাশত্ব বা কুসুমের কুসুমত্ব, দু'য়ের কোনটাই বদলাইয়া যায় না, অথচ একটা নূতন কল্পিত বস্তুর সৃষ্টি হয়। এই কারণে এখানে রূপান্তর শব্দের প্রয়োগ সঙ্গত হইবে না।

যেমন মনোময় কোষে সত্য রূপান্তর ঘটে না, সেইরূপ বিজ্ঞানময় কোষেও ঘটে না। মন ইন্দ্রিয়ানুভূতি লইয়াই কারবার করে। ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ বিষয় লইয়াই

মন আপনার যাবতীয় মানস-সৃষ্টির প্রতিষ্ঠা করে। বিজ্ঞান সেইরূপ অতীন্দ্রিয় তত্ত্বে বিহার করে। বহুত্বের মধ্যে একত্ব দর্শন করিতে গেলে, এই বহুত্বের প্রত্যক্ষ রূপ-রসাদির বৈচিত্র্যকে উপেক্ষা করিয়া, এ সকলের মধ্যে ও অন্তরালে অপ্রত্যক্ষ তত্ত্ব-বস্তুর ধ্যান করিতে হয়। মনোময় কোষের আশ্রয়—রূপ, বিজ্ঞানময় কোষের আশ্রয়—স্বরূপ। রূপ বৈচিত্র্যের প্রকাশ করে। জগতের বহুত্ব রূপ লইয়া। স্বরূপই কেবল এই বৈচিত্র্য ও এই বহুত্বকে নিরস্ত করিয়া, নিরাকার ও শূন্য বিশিষ্টতা ও এই বিচিত্রতা-পূর্ণ এই নির্গুণ একত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকে। বিজ্ঞান যে একত্ব প্রতিষ্ঠিত করে, তাহার উপলব্ধি করিতে হইলে, সকল রূপকে নিরস্ত করিতে হয়। অথচ রূপকে রাখিয়াই কেবল রূপান্তর ঘটাইতে পারা যায়, রূপকে বিনাশ করিয়া নহে। কিন্তু একত্বে, নিরাকারে, নির্বিশেষে, কোনও রূপের প্রতিষ্ঠা হয় না, হইতেই পারে না। একত্বে যখন রূপের প্রতিষ্ঠা হয়, তখনই সে এক বহু হয়। নিরাকারে যখন রূপের প্রকাশ হয়, তখনই তাহা সাকার হইয়া যায়। নির্বিশেষে যখন বৈশিষ্ট্যের প্রতিষ্ঠা হয়, তখন তাহা আর নির্বিশেষ থাকে না। অতএব রূপের প্রতিষ্ঠা অসম্ভব বলিয়া, বিজ্ঞানময়-জগতে—যেখানে কেবল সত্তা বা Being মাত্র আছে, কিন্তু প্রকাশ বা Doing নাই, সেখানে—রূপান্তর হয় না হইতে পারে না।

কিন্তু এখানেও কবি-কল্পনা নানা প্রকারের রূপের সৃষ্টি করিতে গিয়াছে। বেদের পুরুষ-সূক্তে তার প্রমাণ পাই ;—

"পুরুষের সহস্র মস্তক, সহস্র চক্ষু ও সহস্র চরণ। তিনি পৃথিবীকে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত করিয়া দশ অঙ্গুলি পরিমাণ অতিরিক্ত হইয়া অবস্থিত থাকেন।

'যাহা হইয়াছে, অথবা যাহা হইবেক, সকলি সেই পুরুষ। তিনি অমরত্ব-লাভে অধিকারী হয়েন, কেন না, তিনি অন্ন-দ্বারা অতিরোহণ করেন"।

"ইঁহার এতাদৃশ মহিমা, তিনি কিন্তু ইহা অপেক্ষাও বৃহত্তর। বিশ্ব-জীবসমূহ তাঁহার একপাদ মাত্র, আকাশে অমর অংশ তাঁহার তিন পাদ।

"পুরুষ আপনার তিন পাদ লইয়া উপরে উঠিলেন। তাঁহার চতুর্থ অংশ এই স্থানে রহিল। তিনি তদনন্তর ভোজনকারী ও ভোজন-রহিত (চেতন ও অচেতন) তাবৎ বস্তুতে ব্যাপ্ত হইলেন।

"তাঁহা হইতে বিরাট্ জন্মিলেন, এবং বিরাট্ হইতে সেই পুরুষ। তিনি জন্ম-গ্রহণপূর্ব্বক পশ্চাৎভাগে ও পূর্ব্বভাগে পৃথিবীকে অতিক্রম করিলেন।'—ইত্যাদি।

এখানে কবি এক অদ্ভুত পুরুষ কল্পনা করিয়াছেন। নিরাকার, সত্তামাত্র ব্রহ্ম, পরম-তত্ত্ব কি বস্তু, ইহা ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ না হইলেও সমাধি-প্রত্যক্ষ বটে। এই বিচিত্রতাময় জগতের মূলে যে একটা একত্ব আছে ইহা আমরা বুঝি। এই একত্বের উপলব্ধি লাভ করিতে হইলে, আমাদিগকে মন হইতে, চিন্তা হইতে, ধ্যান ও জ্ঞান হইতে, জগতের যাবতীয় রূপ-রসাদির বৈচিত্র্য, বৈশিষ্ট্য, ও বহুত্বকে দূর করিয়া দিতে হয়। রূপের অনুভবের সঙ্গে এই একের অপরোক্ষ উপলব্ধি সম্ভব নহে।

"নেতি" "নেতি" বলিয়া ব্যতিরেকী পন্থার অনুসরণেই এই একত্বের উপলব্ধি করিতে হয়। আর যখন অন্বয়ী-পন্থাতে ইহার অনুভব লাভ করিতে হয়, তখন—"এই সকল রূপের মধ্যে সেই স্বরূপ আছেন," "এই সকল বিচিত্রতার অন্তরালে সেই মহান্ এক রহিয়াছেন"—এই ভাবে, অথবা "তাঁহারই দ্বারা এই সকল রূপের প্রকাশ হইতেছে," "তাঁহারই শক্তিতে ও জ্ঞানে বিশ্বের অশেষ বৈচিত্র্য স্থিতি করিতেছে,"—এই রূপে তাঁহার চিন্তা বা ধ্যান করিতে হয়।

এইরূপ ধ্যানেও বস্তুর রূপান্তর হয় বটে। কিন্তু হয়,—বিজ্ঞানময় কোষে নহে, কিন্তু আনন্দময় কোষে। এই ধ্যান করিতে করিতে চিত্তে যে সকল ভাব উৎসারিত হয়, সেই ভাবের রং পড়িয়া তখন বিশ্বের রূপ বদলাইয়া যায়। তখন, সেই ভাবের অঞ্জনে রঞ্জিত-চক্ষু সাধক—

"শ্যামল কমল দেখে,
দেখে বা শ্যামা মূর্ত্তি,
ধারা নেত্রে পড়ে,
বন্ধ হইলেন স্ফূর্ত্তি।"

নিরাকারের সাধকের অধিকার সুতরাং বিজ্ঞানময় কোষ। কিন্তু যদিও কোষ-পঞ্চকে আনন্দময় কোষ বলিয়া একটি পৃথক্ কোষের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, আনন্দ-বস্তু সকল কোষকে ছাইয়া, সকল কোষকে ছাপিয়া আছে। অন্ন, প্রাণ, মন, বিজ্ঞান—সকলই আনন্দময়। জড়ে, জীবে, মননে, চিন্তনে, ধ্যানে আনন্দ সর্ব্বত্র উৎসারিত, সর্ব্বত্র উচ্ছ্বসিত। এইজন্য নিরাকারের ধ্যানে যখন এই আনন্দ-রস উথলিয়া উঠে, তখন নিরাকারেরও "আকার" বদলাইয়া যায়, "স্বরূপে" রূপ ফুটিয়া উঠে। তখন—

"সর্ব্বজীবে হয়,
ব্রহ্মভাবোদয়,
চিদানন্দ জেগে উঠে।"

কিন্তু এইটি হয়, আনন্দ-রস-প্রভাবে। সকল ক্ষেত্রেই এই আনন্দ বস্তু বা রস-বস্তু আপনার রসান মাখাইয়া বস্তুর রূপান্তর ঘটায়। এই রূপান্তরকেই সাহিত্যের রূপান্তর বলা যায়।

[অগ্রহায়ণ, ১৩২৭]

কবি-প্রসঙ্গ

রামপ্রসাদ

পূর্ণচন্দ্র বসু

পৃথিবীর সাহিত্য-সংসারে পারমার্থিক কবিতায় রামপ্রসাদের পদাবলী এক অপূর্ব্ব পদার্থ। কোন জাতীয় সাহিত্য-ভাণ্ডারে সেরূপ সম্পত্তি বিরাজিত নাই। প্রসাদী পদাবলীর প্রকৃতি ও বিশেষ ধর্ম্ম আর কোন প্রকার ধর্ম্ম-সঙ্গীতে বিদ্যমান দেখা যায় না। রামপ্রসাদ যেন এক স্বতন্ত্র ধরণ অবলম্বন করিয়াছিলেন। কারণ, প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রেই আপন আপন নূতন পথ আবিষ্কার করিয়া থাকেন। তাঁহা-দিগের হৃদয়-ভাব ও চিন্তা এক নূতন পথে প্রবাহিত হয়। সুতরাং, সে সমস্ত ভাব ও চিন্তা এক নূতন ভাবে বিকশিত হইয়া পড়ে।

রামপ্রসাদ সেনের কল্পনা অতি তেজস্বিনী ছিল। তাঁহার কল্পনা সম্মুখে যাহা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাই গ্রহণ করিয়া স্বর্ণে মণ্ডিত করিয়াছে। তাঁহার কল্পনা পার্থিব সুন্দর পদার্থের অনুসরণে ব্যস্ত হয় নাই, দেখে নাই,—কোথায় কুসুমিত কুঞ্জবন, স্বচ্ছ সরোবর, ভীষণ জলপ্রপাত, প্রকাণ্ড পর্ব্বতমালা ও মনোহর শস্যক্ষেত্র। সে কল্পনা সম্মুখে যাহাই দেখিয়াছে, তাহাই অবলম্বন করিয়া একটি একটি মনোহর সঙ্গীত প্রস্তুত করিয়াছে। রামপ্রসাদ যখন যেখানে উপস্থিত, সেই স্থানের বিষয় তাঁহার কল্পনাকে অমনি আকৃষ্ট করিয়াছে। রামপ্রসাদের কল্পনা যেন নিয়তই জাগরিত রহিয়াছে। জাগরিত থাকিয়া যাহা কিছু দেখিয়াছে, অমনি তাহাকে সাত্ত্বিকভাবে পরিপূর্ণ করিয়াছে; পৃথিবীর সামান্য ধূলিরাশিকেও স্বর্ণে মণ্ডিত করিয়াছে। রামপ্রসাদ যে দৃশ্যের সম্মুখে উপস্থিত, তাহাতে যে কেবল আপন-হৃদয়ের সাত্ত্বিকভাব আরোপিত করিয়াছেন, এমত নহে, তাহাকে প্রসাদতঃ কবিত্বে পরিপূর্ণ করিয়াছেন। প্রকৃতি কবির চক্ষে কিরূপ দেখায়, তাহাই যদি বিকশিত করা কবিত্বের ধর্ম্ম হয়, রামপ্রসাদের সঙ্গীতে তবে কবিত্বের কিছুই অভাব নাই। রামপ্রসাদের হৃদয় ধর্ম্মপরায়ণ ছিল, তাঁহার মন কল্পনায় পরিপূর্ণ ছিল। রামপ্রসাদ যাহা দেখিতেন, প্রথমে তাঁহার হৃদয় তাহাতে আকৃষ্ট হইত, হৃদয়ের আকর্ষণে তাহাতে ধর্ম্মভাব প্রতিফলিত হইত, তৎপরে কল্পনার উজ্জ্বল অলঙ্কারে তাহা বিভূষিত হইত। যে ক্ষুদ্র জগতে রামপ্রসাদ বাস করিতেন, তাহার চারিদিকস্থ যাবতীয় পদার্থকে তিনি সাত্ত্বিকভাবের কল্পনা-দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রকৃত জগতের উপর আর একটি নূতন জগৎ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। নশ্বরতাময়ী পার্থিব প্রকৃতিকে তিনি কনকভূষণে মণ্ডিত করিয়াছিলেন। কঠিন বুদ্ধিগম্য জগৎকে তিনি ইন্দ্রজালে পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রকৃতির

কর্ণকুহরে এক নূতন সঙ্গীত-ধ্বনির অমৃত বর্ষণ করিয়াছিলেন। প্রকৃতিও তাঁহার নূতন গীতে বিমুগ্ধ হইয়াছিল — বিমুগ্ধ হইয়া সেই গান চারিদিকে প্রতিধ্বনিত করিয়াছিল। তিনি যাবতীয় সামান্য পদার্থকে ধর্ম্ম গান সঙ্গীত করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। আজিও আমরা সেই সমস্ত কনিষ্ঠ মাত্র পদার্থের সমীপে উপনীত হইয়া রামপ্রসাদের সঙ্গীতে যেন উন্মাদিত হইয়া গাহিয়া উঠি,—

"মা আমায় ঘুরাবে কত—
কলুর চোখ-ঢাকা বলদের মত?
ভবের গাছে বেঁধে দিয়ে মা, পাক দিতেছ অবিরত;
তুমি কি দোষে করিলে আমায় ছ'টা কলুর অনুগত?
মা শব্দ মমতাযুত, কাঁদলে কোলে করে সুত।
দেখি ব্রহ্মাণ্ডেরই এই রীতি মা, আমি কি ছাড়া জগত?
দুর্গা। দুর্গা। দুর্গা। ব'লে ত'রে গেল পাপী কত।
একবার খুলে দে মা চ'খের ঠুলি, দেখি তোমার অভয় পদ।
কুপুত্র অনেকেই হয় মা, কুমাতা নয় কখন ত।
রামপ্রসাদের এই আশা মা, অন্তে থাকি পদানত।"

রামপ্রসাদের সঙ্গীতাবলী তাঁহার সাধকত্বের ও কবিত্বের অমোঘ নিদর্শন। রসাত্মক বাক্যই যদি কাব্যের লক্ষণ হয়, তবে রামপ্রসাদের সঙ্গীতাবলী একখানি চমৎকার কাব্য। বাঙ্গালা ভাষায় তাহা এক অদ্বিতীয় কাব্য। সে কাব্য শান্তরসের প্রস্রবণ এবং সে প্রস্রবণ কল্পনা-লতিকায় সুশোভিত। রামপ্রসাদ হৃদয়কে মাতাইয়া তোলেন তাঁহার ভক্তিরসে। তাঁহার সঙ্গীতাবলী যে ভক্তিরসের আধার, তাহা বিষয়ীর রাজসিক ভক্তি নহে,—যে রাজসিক ভক্তি কেবল বাহ্য জাঁকজমকে প্রকাশিত হইতে চায়; কিন্তু তাহা প্রকৃত সাধকের সাত্ত্বিক ভক্তি। সেই সাত্ত্বিক ভক্তির সহিত বিষয়িগণের রাজসিক ভক্তির কিরূপ প্রভেদ, তাহা এই সঙ্গীতে প্রতীত হইতেছে,—

"মন, তোর এত ভাবনা কেন?
জয় কালী ব'লে বস্ মা ধ্যানে।
জাঁকজমকে ক'রলে পূজা, অহঙ্কার হয় মনে মনে,
আমি লুকিয়ে মায়ের ক'রব পূজা, জানবে নাকো জগজ্জনে।
ধাতু পাষাণ মাটির মূর্ত্তি, কাজ কি রে তোর সে গঠনে?
আমি মনোময় প্রতিমা গ'ড়ে, বসা'ব হৃদ্-পদ্মাসনে।
আলোচাল আর পাকা কলা, কাজ কি রে তোর আয়োজনে?
আমি ভক্তি-সুধা মাকে দিয়ে, তৃপ্ত ক'র মনে মনে।
মেষ মহিষ ছাগ আদি, কাজ কি রে তোর বলিদানে?
জয় কালী ব'লে দাও রে বলি, এ দেহের ষড় রিপুগণে।
কাজ কি রে তোর বিল্বদলে, কাজ কি রে তোর গঙ্গাজলে?
এ দেহে আছে সহস্র দল, দাও রে মায়ের শ্রীচরণে।

ততই তাঁহার সামীপ্য মুক্তি সম্ভাবিত হয়। এই ঐশ্বর্য্য-মুক্তি তেমনই প্রত্যক্ষ হয়, যেমন অর্জ্জুনের নিকটে প্রত্যক্ষ হইয়াছিল। সামীপ্য মুক্তি লাভ হইলে যোগীর সারূপ্য বা সার্ষ্টি মুক্তি হয়। এই আধ্যাত্মিক স্তরে আসিয়া যোগী ঈশ্বরের স্বরূপ হইয়া তাঁহার ঐশ্বর্য্যভাগী হন। ঈশ্বরের সহিত সমান ঐশ্বর্য্যশালী হওয়ার নামই সার্ষ্টি বা সারূপ্য মুক্তি। যোগ-সাধন দ্বারা এইরূপ ঐশ্বর্য্য-লাভে সমর্থ হওয়া যায়। এ সমস্ত মুক্তি লাভ করিয়া যোগী যে স্তরে আসিয়া দাঁড়ান, তৎপরে কেহ কেহ সেই ঐশ্বর্য্য লাভেই আত্মতৃপ্ত হইয়া পড়েন, কেহ কেহ বা তৎপরে সাযুজ্য বা ঈশ্বরে লয়-মুক্তির প্রয়াসী হন। সাযুজ্য মুক্তিলাভেও জীবের অহংভাব থাকে; কারণ, তখন সগুণ ভগবানের সহিত একীভূত ভাব ধরা যায়। অহংভাব যত দিন থাকে, ততদিন জীবের সংসারগতি নিবারিত হয় না। এই অহংভাবের একেবারে বিনাশ-সাধন না করিতে পারিলে নির্ব্বাণ হয় না; নির্ব্বাণ না হইলে ব্রহ্ম-পদ-লাভ হয় না। এই ব্রহ্ম-পদ লাভেরই নামই মোক্ষ। নির্ব্বাণ হেতু আত্মা নির্গুণ ব্রহ্মে বিলীন হইয়া যান। গুণাতীত হইলে তবে জীবের সংসারগতি ঘুচে। সংসারগতি না ঘুচিলে জীব পরমানন্দ অনুভবের লাভ করিতে পারে না। ভক্তি ও শক্তি-সাধন-পথে এইই আধ্যাত্মিক স্তর। এক এক আধ্যাত্মিক স্তর হইতে ঊর্দ্ধ স্তরে যাইতে পারিলে, নিম্ন স্তরের মুক্তি-সাধন হয়।

লোকে সহসা সাযুজ্য-মুক্তির প্রয়াসী হইতে পারে না। কারণ, সে ভাব অনেক দূরের কথা। সে-মুক্তির প্রয়াসী হইতে হইলে জীবকে সারূপ্য মুক্তি লাভ করিয়া অনেক দূর আধ্যাত্মিক স্তরে উপনীত হইতে হয়। রামপ্রসাদ যে আধ্যাত্মিক স্তরে উপনীত হইয়াছিলেন, সে স্তরে তিনি শুধু সাক্ষাৎকারই প্রয়াসী হইয়াছিলেন। ভগবদ্দর্শনের জন্য তিনি একান্ত লোলুপ হইয়াছিলেন। অভয়-পদ লাভের জন্য তাঁহার একান্ত লালসা হইয়াছিল। ভক্তের প্রথম লালসাই এই। যে শক্তি লাভ করিতে পারিলে এই লালসা পূর্ণ হয়, অভয়-পদের দর্শন লাভ হয়, সেই শক্তি-সাধনার জন্য রামপ্রসাদ সংসার-বিরাগী হইয়াছিলেন। এই একান্ত লালসা তাঁহার অনেক সঙ্গীতে দেখিতে পাওয়া যায়। ঊর্দ্ধ আধ্যাত্মিক স্তরের আস্বাদ গ্রহণ করিবার শক্তি তাঁহার জন্মে নাই। তবে রামপ্রসাদ যে সকল মুক্তির কথায় একেবারে অনভিজ্ঞ ছিলেন, এমনও বোধ হয় না। লয়-মুক্তি পর্য্যন্তও যে তাঁহার এ সাধের আশা ছিল, তাহা তিনি—

"না, আমি তোমাকে খাব।
তুমি খাও কি আমি খাই মা, একবার (এ বাজার)
দুটোর একটা করে যাব।" ইত্যাদি

এই গীতে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। এই গীতে ব্রহ্মের সহিত বিলীন হইবার আশা বিলক্ষণ জানাইয়াছিলেন। আর এক গীতেও তাঁহার এই লয়মুক্তি-জ্ঞান প্রতীত হইয়াছে; যখন তিনি পরলোক-তত্ত্বের মীমাংসায় গাহিয়া উঠিলেন,—

"বল দেখি ভাই, কি হয় ম'লে?"

স্ত্রীজাতির ভক্তি-ভাবের পুত্তলী দেখি। শবরূপী শিবের হৃদয় হইতে কালীরূপী শক্তি উদ্ভূত দেখি। দেবশক্তি কেমন প্রবলা তাহা ধর্ম্মের অসি ও পাপিষ্ঠগণের মুণ্ডমালায় প্রতীত করি। তখন হৃদয় কালীময় হয়, শক্তিতে পরিপূর্ণ হয়। ভবের ঐশ্বর্য্য, ধর্ম্মের শান্তিস্থান, শক্তিরই পদতলে। যাহার ধর্ম্মশক্তি আছে, সম্পদ্, শান্তি ও সুখ তাঁহার পদতলে।

[আর্য্যদর্শন, ১২৮২]

দীনবন্ধু মিত্র

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

যে বৎসর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মৃত্যু হয় সেই বৎসর মাইকেল মধুসূদন দত্ত-প্রণীত 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' রহস্যসন্দর্ভে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। উহাই মধুসূদনের প্রথম বাঙ্গালা কাব্য। তাহার পর-বৎসর দীনবন্ধুর প্রথম গ্রন্থ 'নীলদর্পণ' প্রকাশিত হয়।

সেই ১৮৫৯।৬০ সাল বাঙ্গালা সাহিত্যে চিরস্মরণীয়—উহা নূতন পুরাতনের সন্ধিস্থল। পুরাতন দলের শেষ কবি ঈশ্বরচন্দ্র অস্তমিত, নূতনের প্রথম কবি মধুসূদনের নবোদয়। ঈশ্বরচন্দ্র খাঁটি বাঙ্গালী, মধুসূদন ডাহা ইংরেজ। দীনবন্ধু ইহাদের সন্ধিস্থল। বলিতে পারা যায় যে, ১৮৫৯।৬০ সালের মত দীনবন্ধুও বাঙ্গালা কাব্যের নূতন-পুরাতনের সন্ধিস্থল।

দীনবন্ধু ঈশ্বর গুপ্তের একজন কাব্য-শিষ্য। ঈশ্বরচন্দ্রের কাব্য শিষ্যদিগের মধ্যে দীনবন্ধু গুরুর যতটা কবি-স্বভাবের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন, এত আর কেহ নহে। দীনবন্ধুর হাস্যরসে যে অধিকার তাহা গুরুর অনুকারী। বাঙ্গালীর প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে দীনবন্ধুর কবিতার যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাহাও গুরুর অনুকারী। যে রুচির জন্য দীনবন্ধুকে অনেকে দূষিয়া থাকেন, সে রুচিও গুরুর।

কিন্তু কবিত্ব-সম্বন্ধে গুরুর অপেক্ষা শিষ্যকে উচ্চ আসন দিতে হইবে। ইহা গুরুর ও অগৌরবের কথা নহে। দীনবন্ধুর হাস্যরসে অধিকার যে ঈশ্বর গুপ্তের অনুকারী বলিয়াছি, সে কথার তাৎপর্য্য এই যে দীনবন্ধু ঈশ্বর গুপ্তের ন্যায় একজাতীয় ব্যঙ্গ-প্রণেতা ছিলেন। আগেকার দেশীয় ব্যঙ্গ-প্রণালী এক জাতীয় ছিল, এখন আর এক জাতীয় ব্যঙ্গে সামাজিকদিগের ভালবাসা জন্মিয়াছে। আগেকার লোক কিছু মোটা কাজ ভালবাসিত, এখন সরুর উপর লোকের অনুরাগ। আগেকার রসিক লাঠিয়ালের ন্যায় মোটা লাঠি লইয়া সজোরে শত্রুর মাথায় মারিতেন, মাথার খুলি ফাটিয়া যাইত।

এখনকার রসিকেরা, ডাক্তারের মত সরু ল্যান্‌সেট্‌খানি বাহির করিয়া, কখন কুচ করিয়া ব্যথার স্থানে বসাইয়া দেন, কিছু জানিতে পারা যায় না, কিন্তু হৃদয়ের শোণিত ক্ষত-মুখে বাহির হইয়া যায়। এখন ইংরেজ-শাসিত সমাজে ডাক্তারের শ্রীবৃদ্ধি—লাঠিয়ালের বড় দুরবস্থা। সাহিত্য-সমাজে লাঠিয়াল আর নাই, এমন নহে, দুর্ভাগ্যক্রমে সংখ্যায় কিছু বাড়িয়াছে, কিন্তু তাহাদের লাঠি ঘুণে ধরা, বাহুতে বল নাই, তাহারা লাঠির ভরে কাতর; শিক্ষা নাই, কোথায় মারিতে কোথায় মারে। লোক হাসায় বটে, কিন্তু হাস্যের পাত্র তাহারা স্বয়ং। ঈশ্বর গুপ্ত বা দীনবন্ধু এ জাতীয় লাঠিয়াল ছিলেন না। তাঁহাদের হাতে পাকা বাঁশের মোটা লাঠি, বাহুতেও অমিত বল, শিক্ষাও বিচিত্র। দীনবন্ধুর লাঠির আঘাতে অনেক জলধর ও রাজীব মুখোপাধ্যায় জলধর বা রাজীব-জীবন পরিত্যাগ করিয়াছে।

লাঠির প্রধান গুণ—সৃষ্টি-কৌশল। ঈশ্বর গুপ্তের এ ক্ষমতা ছিল না। দীনবন্ধুর এ শক্তি অতি প্রচুর-পরিমাণে ছিল। তাঁহার প্রণীত জলধর জগদম্বা মল্লিকা, নিমচাঁদ দত্ত প্রভৃতি এই সকল কথার উজ্জ্বল উদাহরণ। তবে যাহা সূক্ষ্ম, কোমল, মধুর, অকৃত্রিম, করুণ, প্রশান্ত—সে সকলে দীনবন্ধুর তেমন অধিকার ছিল না। তাঁহার লীলাবতী, তাঁহার মালতী কামিনী, সৈরিন্ধ্রী, সরলা প্রভৃতি রসজ্ঞের নিকট তাদৃশ আদরণীয়া নহে। তাঁহার বিনায়ক, রমণীমোহন, অরবিন্দ ললিতমোহন মন মুগ্ধ করিতে পারে না। কিন্তু যাহা স্থূল, অসঙ্গত, অসংলগ্ন, বিপর্য্যস্ত তাহা তাঁহার ইঙ্গিতমাত্রেরও অধীন। প্রথম ডাকে ভূতের দলের মত স্মরণমাত্র সারি দিয়া আসিয়া দাঁড়ায়।

কি উপায় লইয়া দীনবন্ধু এই সকল চিত্র রচনা করিয়াছিলেন, তাহার আলোচনা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। বিস্ময়ের বিষয়—বাঙ্গালা সমাজ-সম্বন্ধে দীনবন্ধুর বহুদর্শিতা। সকল শ্রেণীর বাঙ্গালীর দৈনিক জীবনের সকল খবর রাখে এমন বাঙ্গালী লেখক আর নাই। এ বিষয়ে বাঙ্গালী লেখকদিগের এখন সাধারণতঃ বড় শোচনীয় অবস্থা। তাঁহাদিগের অনেকেরই লিখিবার যোগ্য শিক্ষা আছে লিখিবার শক্তি আছে, কেবল যাহা জানিলে তাঁহাদের লেখা সার্থক হয়, তাহা জানা নাই। তাঁহারা অনেকেই দেশবৎসল, দেশের মঙ্গলার্থ লেখেন, কিন্তু দেশের অবস্থা কিছুই জানেন না। কলিকাতার ভিতর স্বশ্রেণীর লোক কি করে, ইহাই অনেকের স্বদেশ সম্বন্ধীয় জ্ঞানের সীমা। কেহ বা অতিরিক্ত দুই চারিখানা পল্লীগ্রাম, বা দুই-একটা ক্ষুদ্র নগর দেখিয়াছেন, কিন্তু সে বুঝি কেবল পথ ঘাট, বাগান-বাগিচা, হাট-বাজার— লোকের সঙ্গে মিলেন নাই। দেশ-সম্বন্ধীয় তাঁহাদের যে জ্ঞান, তাহা সচরাচর সংবাদপত্র হইতে প্রাপ্ত। সংবাদপত্র-লেখকেরা আবার সচরাচর (সকলে নহেন) ঐ শ্রেণীর লেখক—ইংরেজেরা ত বটেনই। কাজেই তাঁহাদের কাছেও দেশ-সম্বন্ধীয় যে জ্ঞান পাওয়া যায় তাহা, দার্শনিকদিগের ভাষায় রজ্জুতে সর্পজ্ঞানবৎ ভ্রম-জ্ঞান বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে। এমন বলিতেছি না যে, কোন বাঙ্গালী লেখক গ্রাম্য প্রদেশ

ভ্রমণ করেন নাই। অনেকে করিয়াছেন, কিন্তু লোকের সঙ্গে মিশিয়াছেন কি? না মিশিলে, যাহা জানিয়াছেন, তাহার মূল্য কি?

বাঙ্গালী লেখকদিগের মধ্যে দীনবন্ধু এ বিষয়ে সর্ব্বোচ্চ স্থান পাইতে পারেন। দীনবন্ধুকে রাজকার্য্যানুরোধে, মণিপুর হইতে গঞ্জাম পর্য্যন্ত, দার্জ্জিলিং হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত, পুনঃপুনঃ ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল। কেবল পথ-ভ্রমণ বা নগর-দর্শন নহে। ডাকঘর দেখিবার জন্য গ্রামে গ্রামে যাইতে হইত। লোকের সঙ্গে মিশিবার তাঁহার অসাধারণ শক্তি ছিল। তিনি আহ্লাদপূর্ব্বক সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গে মিশিতেন। ক্ষেত্রমণির মত গ্রাম্য প্রদেশের ইতর লোকের কন্যা, আদুরীর মত গ্রাম্য বর্ষীয়সী, তোরাপের মত গ্রাম্য প্রজা, রাজীবের মত গ্রাম্য বৃদ্ধ, নসীরাম ও রতার মত গ্রাম্য বালক, পক্ষান্তরে নিমচাঁদের মত সহুরে শিক্ষিত মাতাল, অটলের মত নগর-বিহারী গ্রাম্য বাবু, কাঞ্চনের মত নগর-শোণিতপায়িনী নগরবাসিনী রাক্ষসী, নদেরচাঁদ হেমচাঁদের মত 'উনপাঁজুরে বরাখুরে' হাপ-পাড়াগেঁয়ে হাপ-সহুরে বয়াটে ছেলে, ঘটিরামের মত ডিপুটি, নীলকুঠির দেওয়ান, আমীন, তাইদগীর, উড়ে বেহারা, দুলে বেহারা, পেঁচোর-মা কাওরাণীর মত লোকের পর্য্যন্ত তিনি নাড়ী-নক্ষত্র জানিতেন। তাহারা কি করে, কি বলে, তাহা ঠিক জানিতেন। কলমের মুখে তাহা ঠিক বাহির করিতে পারিতেন,—আর কোন বাঙ্গালী লেখক তেমন পারে নাই। তাহার আদুরীর মত অনেক আদুরী আমি দেখিয়াছি—তাহারা ঠিক আদুরী। নদেরচাঁদ, হেমচাঁদ আমি দেখিয়াছি, তাহারা ঠিক নদেরচাঁদ বা হেমচাঁদ। মল্লিকা দেখা গিয়াছে—ঠিক অমনি ফুটন্ত মল্লিকা। দীনবন্ধু অনেক সময়েই শিক্ষিত ভাস্কর বা চিত্রকরের ন্যায় জীবিত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া চরিত্রগুলি গড়িতেন। সামাজিক বৃক্ষে সামাজিক বানর সমারূঢ় দেখিলেই অমনি তুলি ধরিয়া তাহার লেজশুদ্ধ আঁকিয়া লইতেন। এটুকু গেল তাঁহার Realism. তাহার উপর Idealize করিবারও বিলক্ষণ ক্ষমতা ছিল। সম্মুখে জীবন্ত আদর্শ রাখিয়া আপনার স্মৃতির ভাণ্ডার খুলিয়া, তাহার ঘাড়ের উপর অন্যের দোষ-গুণ চাপাইয়া দিতেন। যেখানে যেটি সাজে, সেখানে সেটি বসাইতে জানিতেন। গাছের বানরকে এইরূপ সাজাইতে সাজাইতে সে একটা হনুমান বা জাম্ববান পরিণত হইত। নিমচাঁদ, ঘটিরাম, ভোলাচাঁদ প্রভৃতি সেই জন্য এইরূপ উৎপত্তি। এই সকল সৃষ্টির সফলতা ও বৈচিত্র্য বিবেচনা করিলে তাঁহার ক্ষমতা বিস্ময়কর বলিয়া বোধ হয়।

কিন্তু কেবল অভিজ্ঞতায় কিছু হয় না। সহানুভূতি ভিন্ন সৃষ্টি নাই। দীনবন্ধুর সামাজিক অভিজ্ঞতাই বিস্ময়কর নহে—তাহার সহানুভূতিও অতিশয় তীব্র। বিস্ময় এবং বিশেষ প্রশংসার কথা এই যে সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গেই তাঁহার তীব্র সহানুভূতি। দরিদ্র-দুঃখীর দুঃখের মর্ম্ম বুঝিতে এমন আর কাহাকেও দেখি নাই। তাই দীনবন্ধু অমন একটা তোরাপ কি রাইচরণ, একটা আদুরী কি রেবতী লিখিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এই তীব্র সহানুভূতি কেবল দরিদ্র দুঃখীর সঙ্গে নহে—ইহা সর্ব্বব্যাপী।

তিনি নিজে পবিত্র-চরিত্র ছিলেন, কিন্তু দুশ্চরিত্রের দুঃখ বুঝিতে পারিতেন। দীনবন্ধুর পবিত্রতার ভান ছিল না। এই বিশ্বব্যাপী সহানুভূতির গুণেই হউক বা দোষেই হউক, তিনি সর্ব্বস্থানে যাইতেন, দুরাত্মা পাপাত্মা সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গে মিশিতেন। কিন্তু অগ্নিমধ্যস্থ অদাহ্য শিলার ন্যায় পাপাগ্নি-কুণ্ডেও আপনার বিশুদ্ধি রক্ষা করিতেন। নিজে এই প্রকার পবিত্রচেতা হইয়াও সহানুভূতি-শক্তির গুণে তিনি পাপিষ্ঠের দুঃখ পাপিষ্ঠের ন্যায় বুঝিতে পারিতেন। তিনি নিমচাঁদ দত্তের ন্যায় বিশুদ্ধ-জীবন-সুখ বিফলীকৃত-শিক্ষা নৈরাশ্য-পীড়িত মদ্যপের দুঃখ বুঝিতে পারিতেন, বিবাহ-বিষয়ে ভগ্নমনোরথ রাজীব মুখোপাধ্যায়ের দুঃখ বুঝিতে পারিতেন, গোপীনাথের ন্যায় নীলকরের আজ্ঞানুবর্ত্তিতার যন্ত্রণা বুঝিতে পারিতেন। দীনবন্ধুকে আমি বিশেষ জানিতাম। তাঁহার হৃদয়ের সকল ভাগই আমার জানা ছিল। আমার এই বিশ্বাস, এরূপ পরদুঃখকাতর মনুষ্য আর আমি দেখিয়াছি কি-না সন্দেহ। তাঁহার গ্রন্থেও সেই পরিচয় আছে।

কিন্তু এ সহানুভূতি কেবল দুঃখের সঙ্গে নহে। সুখ দুঃখ রাগ-দ্বেষ সকলেরই সঙ্গে তুল্য সহানুভূতি। আদুরীর বাউটিপৈঁচার সুখের সঙ্গে সহানুভূতি, তোরাপের রাগের সঙ্গে সহানুভূতি, ভোলাচাঁদ যে ভূত কারণবশতঃ পুকুর-পাড়ে যাইতে পারে না সে দুঃখের সঙ্গেও সহানুভূতি। সকল কবিরই এ সহানুভূতি চাই, তা নহিলে কেহই উচ্চ শ্রেণীর কবি হইতে পারেন না। কিন্তু অন্য কবিদিগের সঙ্গে ও দীনবন্ধুর সঙ্গে একটু প্রভেদ আছে। সহানুভূতি প্রধানতঃ কল্পনা-শক্তির ফল। আমি আপনাকে ঠিক অন্যের স্থানে কল্পনার দ্বারা বসাইতে পারিলেই তাহার সঙ্গে আমার সহানুভূতি জন্মে। যদি তাহাই হয়, তবে এমন হইতে পারে যে অতি নিষ্ঠুর নির্দ্দয় ব্যক্তিও কল্পনা-শক্তির বল থাকিলে কাব্য প্রণয়ন কালে দুঃখীর সঙ্গে আপনার সহানুভূতি জন্মাইয়া লইয়া কাব্যের উদ্দেশ্য-সাধন করেন। কিন্তু আবার এমন শ্রেণীর লোকও আছেন যে দয়া প্রভৃতি কোমল বৃত্তি-সকল তাঁহাদের স্বভাবে এত প্রবল যে সহানুভূতি তাঁহাদের স্বতঃসিদ্ধ—কল্পনার সাহায্যের অপেক্ষা করে না। মনস্তত্ত্ববিদেরা বলিবেন এখানেও কল্পনা-শক্তি লুকাইয়া কাজ করে, তবে সে কার্য্য এমন অলক্ষ্য বা শীঘ্র সম্পাদিত যে, আমরা বুঝিতে পারি না। এখানেও কল্পনা নিরাড়ম্বরা। তাহাই না হয় হইল, তথাপি একটি প্রভেদ হইল। পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর লোকের সহানুভূতি তাঁহাদের ইচ্ছা বা চেষ্টার অধীন, দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকের সহানুভূতি তাঁহাদের ইচ্ছাধীন নহে—তাঁহারাই সহানুভূতির অধীন। প্রথম শ্রেণীর লোক যখন মনে করেন তখনই সহানুভূতি আসিয়া উপস্থিত হয়, নহিলে সে আসিতে পারে না। সহানুভূতি তাঁহাদের দাসী। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরা নিজেই সহানুভূতির দাস, তাহারা তাহাকে চান বা না চান, সে আসিয়া ঘাড়ে চাপিয়াই আছে, হৃদয় কাড়িয়া আসন পাতিয়া বিরাজ করিতেছে। পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর লোকের কল্পনা-শক্তি বড় প্রবল, দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকের প্রীতি, দয়াদি বৃত্তি-সকল প্রবল।

দীনবন্ধু এই দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক ছিলেন। তাঁহার সহানুভূতি তাঁহার অধীন বা আয়ত্ত নহে—তিনি নিজেই সহানুভূতির অধীন। তাঁহার সর্ব্বব্যাপিনী সহানুভূতি তাঁহাকে যখন যে পথে লইয়া যাইত, তখন তিনি তাহাই করিতে বাধ্য হইতেন। তাঁহার গ্রন্থে যে রুচির দোষ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার ইহা এক প্রকার আমরা বুঝিতে পারি। তিনি নিজে সুশিক্ষিত এবং নির্ম্মলচরিত্র, তথাপি তাঁহার গ্রন্থে যে রুচির দোষ দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহার প্রবলা দুর্দ্দমনীয়া সহানুভূতিই তাহার কারণ। যাহার সঙ্গে তাঁহার সহানুভূতি, যাহার চরিত্র আঁকিতে বসিয়াছেন, তাহার সমুদায় অংশই তাঁহার কলমের আগায় আসিয়া পড়িত। কিছু বাদ সাদ দিবার তাঁহার শক্তি ছিল না, কেন না, তিনি সহানুভূতির অধীন—সহানুভূতি তাঁহার অধীন নহে। আমরা বলিয়াছি যে তিনি জীবন্ত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া চরিত্রপ্রণয়নে নিযুক্ত হইতেন। সেই জীবন্ত আদর্শের সঙ্গে সহানুভূতি হইত বলিয়াই তিনি তাহাকে আদর্শ করিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার উপর আদর্শের এমনই বল যে সেই আদর্শের কোন অংশ ত্যাগ করিতে পারিতেন না। তোরাপের সৃষ্টি-কালে, তোরাপ যে ভাষায় রাগ প্রকাশ করে, তাহা বাদ দিতে পারিতেন না। আদুরীর সৃষ্টি-কালে, আদুরী যে ভাষায় রহস্য করে, তাহা বাদ দিতে পারিতেন না। নিমচাঁদ গড়িবার সময়, নিমচাঁদ যে ভাষায় মাতলামি করে, তাহা ছাড়িতে পারিতেন না। অন্য কবি হইলে সহানুভূতির সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত করিত,—বলিত, "তুমি আমাকে তোরাপের বা আদুরীর বা নিমচাঁদের স্বভাব-চরিত্র বুঝাইয়া দাও, কিন্তু ভাষা আমার পছন্দমত হইবে—ভাষা তোমার কাছে লইব না।" কিন্তু দীনবন্ধুর সাধ্য ছিল না সহানুভূতির সঙ্গে কোন প্রকার বন্দোবস্ত করেন। সহানুভূতি তাঁহাকে বলিত, 'আমার হুকুম—সবটুকু লইতে হইবে—নাও ভাষা। দেখিতেছ না যে তোরাপের ভাষা ছাড়িলে তোরাপের রাগ আর তোরাপের রাগের মত থাকে না, আদুরীর ভাষা ছাড়িলে আদুরীর তামাসা আর আদুরীর তামাসার মত থাকে না, নিমচাঁদের ভাষা ছাড়িলে নিমচাঁদের মাতলামি আর নিমচাঁদের মাতলামির মত থাকে না, সবটুকু দিতে হইবে।" দীনবন্ধুর সাধ্য ছিল না যে বলেন, 'না, তা হবে না।' তাই আমরা একটা আস্ত তোরাপ, আস্ত নিমচাঁদ, আস্ত আদুরী দেখিতে পাই। রুচির মুখ রক্ষা করিতে গেলে, ছেঁড়া তোরাপ, কাটা আদুরী, ভাঙ্গা নিমচাঁদ আমরা পাইতাম।

আমি এমন বলিতেছি না যে, দীনবন্ধু যাহা করিয়াছেন বেশ করিয়াছেন। গ্রন্থে রুচির দোষ না ঘটে, ইহাই সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়, তাহাতে সংশয় কি? আমি যে কয়টা কথা বলিলাম, তাহার উদ্দেশ্য প্রশংসা বা নিন্দা নহে। মানুষটা বুঝানই আমার উদ্দেশ্য। দীনবন্ধুর রুচির দোষ তাঁহার ইচ্ছায় ঘটে নাই—তাঁহার তীব্র সহানুভূতির গুণেই ঘটিয়াছে। গুণেও দোষ জন্মে, ইহা সকলেই জানে।—কথাটায় আমরা মানুষটা বুঝিতে পারিতেছি। খুব ভাল লোক আর মন্দ লোক, মানুষটা বড় ভালবাসিবার মানুষ। তাঁহার জীবনেও তাহাই দেখিয়াছি। দীনবন্ধুকে যত লোক ভালবাসিয়াছে,

এমন আমি কখন দেখি নাই বা শুনি নাই। সেই সর্ব্বব্যাপিনী তীব্র সহানুভূতিই তাহার কারণ।

দীনবন্ধুর এই দুইটি গুণ—(১) তাঁহার সামাজিক অভিজ্ঞতা, (২) তাঁহার প্রবল এবং স্বাভাবিক সর্ব্বব্যাপিনী সহানুভূতি—তাঁহার কাব্যের গুণদোষের কারণ, এই দুইটি বুঝানো এই সমালোচনার প্রধান উদ্দেশ্য। আমি ইহাও বুঝাইতে চাই যে, যেখানে এই দুইটির মধ্যে একটির অভাব হইয়াছে, সেইখানেই তাঁহার কবিত্ব নিষ্ফল হইয়াছে। যাহারা তাঁহার প্রধান নায়ক-নায়িকা, তাহাদিগের চরিত্র যে তেমন মনোহর হয় নাই, ইহাই তাহার কারণ। আদুরী বা তোরাপ জীবন্ত চিত্র—কামিনী বা লীলাবতী বিজয় বা ললিতমোহন সেরূপ নয়। সহানুভূতি আদুরী ও তোরাপের বেলা তাহাদের অন্তঃস্থিত ভাষা পর্য্যন্ত আনিয়া কবির কলমের আগায় বসাইয়া দিয়াছিল—কামিনী বা বিজয়ের বেলা, লীলাবতী বা ললিতের বেলা—চরিত্র ও ভাষা উভয়ই বিকৃত কেন? যদি তাঁহার সহানুভূতি স্বাভাবিক এবং সর্ব্বব্যাপী, তবে এখানে সহানুভূতি নিষ্ফল কেন? ইহাই বুঝা সহজ—এখানে অভিজ্ঞতার অভাব। প্রথমে নায়িকাদের কথা ধরুন।

লীলাবতী বা কামিনী শ্রেণীর নায়িকা সম্বন্ধে তাঁহার কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। ছিল না—কেন-না, কোন লীলাবতী বা কামিনী বাঙ্গালী সমাজে ছিল না। হিন্দুর ঘরে মেয়ে সেয়ানা, কে বিবাহের পাত্রী হইয়া, যিনি কোর্টশিপ করিতে চাহেন, তাঁহাকে প্রাণ-মন সমর্পণ করিয়া বসিয়া থাকে, এমন মেয়ে বাঙ্গালী-সমাজে ছিল না—কেবল আজ-কাল নাকি দুই একটা হইতেছে শুনিতেছি। ইংরেজের ঘরে তেমন মেয়ে আছে, ইংরেজি-কাব্যাদি তাহাতেই ভরা। আমাদিগের দেশের প্রাচীন সংস্কৃত পুস্তকও তেমনই আছে। দীনবন্ধু ইংরেজি ও সংস্কৃত নাটক নবেল ইত্যাদি পড়িয়া এই ভ্রমে পড়িয়াছিলেন যে, নাটক-নবেলে বাঙ্গালার সমাজস্থিত নায়ক-নায়িকাকেও সেই ছাঁচে ঢালা চাই। কাজেই যাহা নাই যাহার আদর্শ সমাজে নাই তিনি তাহাই গড়িতে বসিয়াছিলেন। এখন আমি ইহাও বুঝিয়াছি যে, তাঁহার চরিত্র-প্রণয়ন-প্রথা এই ছিল যে জীবন্ত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া চিত্রকরের ন্যায় চিত্র আঁকিতেন। এখানে জীবন্ত আদর্শ নাই, কাজেই ইংরেজি ও সংস্কৃত গ্রন্থের মধ্যগত মৃৎপুত্তলগুলি দেখিয়া সে চরিত্র গঠন করিতে হইত। জীবন্ত আদর্শ সম্মুখে নাই কাজেই সে সর্ব্বব্যাপিনী সহানুভূতিও সেখানে নাই। কেন-না সর্ব্বব্যাপিনী সহানুভূতিও জীবন্ত ভিন্ন জীবন-হীনকে ব্যাপ্ত করিতে পারে না—জীবনহীনের সঙ্গে সহানুভূতির কোন সম্বন্ধ নাই। এখানে পাঠক দেখিবেন যে দীনবন্ধুর সামাজিক অভিজ্ঞতাও নাই, স্বাভাবিক সহানুভূতিও নাই। এই দুইটি লইয়াই দীনবন্ধুর কবিত্ব। কাজেই এখানে কবিত্ব নিষ্ফল।

যেখানে দীনবন্ধুর প্রধান নায়িকা কোর্টশিপের পাত্রী নহে—যথা সৈরিন্ধ্রী—সেখানেও দীনবন্ধু জীবন্ত আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া পুস্তকগত আদর্শ অবলম্বন করিয়াছেন। কাজেই সেখানেও নায়িকার চরিত্র স্বাভাবিক হইতে পায় নাই।

রাশিরাশি কুসুম দল কমিয়া ফুটিয়াছিল। আকাশে নক্ষত্র, নদী-বক্ষে নৌকায় আলো, তরঙ্গে চন্দ্ররশ্মি। কাব্যরস বড় উচ্ছলিত হইল। মনে করিলাম, কবিতা পড়িয়া মনের তৃপ্তিসাধন করি। ইংরেজি কবিতায় তাহা হইল না—ইংরেজির সঙ্গে এ ভাগীরথীর ত কিছুই মিলে না। কালিদাস-ভবভূতিও অনেক দূরে।

মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র কাহাতেও তৃপ্তি হইল না। চুপ করিয়া রহিলাম। এমন সময়ে গঙ্গা-বক্ষ হইতে মধুর সঙ্গীতধ্বনি শুনা গেল। জেলে জাল বাহিতে বাহিতে গায়িতেছে—

> "সাধো আছে মা মনে—
> দুর্গা ব'লে প্রাণ ত্যজিব,
> জাহ্নবী-জীবনে!"

তখন প্রাণ জুড়াইল—মনের সুর মিলিল—বাঙ্গালা ভাষায় বাঙ্গালীর মনের আশা শুনিতে পাইলাম—এ জাহ্নবী-জীবনে দুর্গা বলিয়া প্রাণ ত্যজিবারই বটে, তাহা বুঝিলাম। তখন সেই শোভাময়ী জাহ্নবী, সেই সৌন্দর্য্যময় জগৎ সকলই আপনার বলিয়া বোধ হইল—এতক্ষণ পরের বলিয়া বোধ হইতেছিল।

সেইরূপ আজিকার দিনের অভিনব এবং উন্নতির পথে সমারূঢ় সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট বাঙ্গালা সাহিত্য দেখিয়া অনেক সময়ে বোধ হয়—হোক সুন্দর, কিন্তু এ বুঝি পরের—আমাদের নহে। খাঁটি বাঙ্গালা কথায়, খাঁটি বাঙ্গালীর মনের ভাব ত খুঁজিয়া পাই না। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ—শিক্ষিত বাঙ্গালীর কবি,—ঈশ্বর গুপ্ত বাঙ্গালার কবি। এখন আর খাঁটি বাঙ্গালী কবি জন্মে না—জন্মিবার যো নাই—জন্মিয়া কাজ নাই। বাঙ্গালার অবস্থা আবার ফিরিয়া অবনতির পথে না গেলে খাঁটি বাঙ্গালী কবি আর জন্মিতে পারে না। আমরা "বৃত্রসংহার" পরিত্যাগ করিয়া "পৌষপার্ব্বণ" চাই না। কিন্তু তবু বাঙ্গালীর মনে পৌষপার্ব্বণে যে একটি সুখ আছে, বৃত্রসংহারে তাহা নাই। পিঠাপুলিতে যে একটি সুখ আছে, শচীর বিম্বাধর-প্রতিবিম্বিত সুধায় তাহা নাই। সে জিনিষটা একেবারে ছাড়িলে চলিবে না, দেশশুদ্ধ লোক, শনিমেল তৃতীয় সংস্করণে পরিণত হইলে চলিবে না। বাঙ্গালী নাম রাখিতে হইবে। জননী জন্মভূমিকে ভালবাসিতে হইবে। যাহা মাল পুগায়, তাহা যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখিতে হইবে। এই দেশী জিনিষগুলি মাল প্রসাদ। এই খাঁটি বাঙ্গালাটি, এই খাঁটি দেশী কথাগুলি মাল প্রসাদ। মাল পুগায়ে পেট না ভরে, বিলাতী খাদ্য বাজার হইতে কিনিয়া খাইতে পারি—কিন্তু মাল প্রসাদ ছাড়িব না।

ঈশ্বর গুপ্ত কবি। কিন্তু কি রকম কবি? ভারতবর্ষে পূর্ব্বে জ্ঞানিমাত্রকেই কবি বলিত। শাস্ত্রবেত্তামাত্রে সকলেই "কবি"। ধর্ম্ম-শাস্ত্রকারও কবি, জ্যোতিষ-শাস্ত্রকারও কবি। তারপর কবিশব্দের অর্থের অনেক রকম পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। "কাব্যেষু মাঘঃ কবি-কালিদাসঃ"—এখানে অর্থটা ইংরেজি Poet শব্দের মত। তারপর এই শতাব্দীর প্রথমাংশে 'কবির লড়াই' হইত। দুই দল গায়ক

ভুলিয়া ছন্দোবন্ধে পরস্পরের কথার উত্তর-প্রত্যুত্তর দিতেন। সেই রচনার নাম "কবি"।

আবার আজকাল কবি অর্থে Poet, তাহাকে পাওয়া যায়, কিন্তু "কবিত্ব" শব্দে আজকাল বড় গোল। ইংরেজিতে যাহাকে Poetry বলে, এখন তাহাই কবিত্ব। এখন এই অর্থ প্রচলিত, সুতরাং এই অর্থে ঈশ্বর গুপ্ত কবি কি-না, আমরা বিচার করিতে বাধ্য।

পাঠক বোধ হয় আমার কাছে এমন প্রত্যাশা করেন না যে, এই কবিত্ব কি সামগ্রী, তাহা আমি বুঝাইয়া বলিব। অনেক ইংরেজ ও বাঙ্গালী লেখক সে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের উপর আমার বরাত দেওয়া রহিল। আমার এই মাত্র বক্তব্য যে, সে অর্থে ঈশ্বর গুপ্তকে উচ্চাসনে বসাইতে সমালোচক সম্মত হইবেন না। মনুষ্য-হৃদয়ের কোমল, গম্ভীর, উন্নত, অস্ফুট ভাবগুলি ধরিয়া, তাহাদিগকে গঠন দিয়া, অব্যক্তকে তিনি ব্যক্ত করিতে জানিতেন না। সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিতে তিনি তাদৃশ পটু ছিলেন না। তাঁহার সৃষ্টিই বড় নাই। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ—ইঁহারা সকলেই এ কবিত্বে তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। খুঁটিনাটিও তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। [illegible] মত [illegible] গড়িবার তাঁহার ক্ষমতা ছিল না। কালিদাসের মত শকুন্তলা-উর্বশী কি প্রিয়ংবদা-চিত্র, কৃত্তিবাসের মত তরণীসেন-বধ, মুকুন্দরামের মত ফুল্লরা গড়িতে পারিতেন না। বৈষ্ণব কবিদের মত বীণায় ঝঙ্কার দিতে জানিতেন না। তাঁহার কাব্যে সুন্দর, করুণ, প্রেম—এ সব সামগ্রী বড় বেশী নাই। কিন্তু তাঁহার যাহা আছে তাহা আর কাহারও নাই। আপন অধিকারের ভিতর তিনি রাজা।

সংসারের সকল সামগ্রী কিছু ভাল নহে। যাহা ভাল, তাহাও কিছু এত ভাল নহে যে তাহার অপেক্ষা ভাল আমরা কামনা করি না। সকল বিষয়েই প্রকৃত অবস্থার অপেক্ষা উৎকর্ষ আমরা কামনা করি। সেই উৎকর্ষের আদর্শ-সকল আমাদের হৃদয়ে অস্ফুট রকম থাকে। সেই আদর্শ ও সেই কামনা, কবির সামগ্রী। যিনি তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, তাহাকে গঠন দিয়া শরীরী করিয়া আমাদের হৃদয়গ্রাহী করিয়াছেন, সচরাচর তাঁহাকেই আমরা কবি বলি। মধুসূদনাদি তাহা পারিয়াছেন। ঈশ্বরচন্দ্র তাহা পারেন নাই বা করেন নাই। এই জন্য এই অর্থে আমরা মধুসূদনাদিকে শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া ঈশ্বরচন্দ্রকে নিম্ন শ্রেণীতে স্থাপন করিয়াছি। কিন্তু এইখানেই কি কবিত্বের বিচার শেষ হইল? কবিতার সামগ্রী কি আর কিছুই রহিল না?

রহিল বৈ কি। যাহা আদর্শ, যাহা কমনীয়, যাহা আকাঙ্ক্ষিত, তাহা কবির সামগ্রী। কিন্তু যাহা প্রকৃত, যাহা প্রত্যক্ষ, যাহা প্রাপ্ত, তাহাই বা নয় কেন? তাহাতে কি কিছু রস নাই? কিছু সৌন্দর্য্য নাই? আছে বৈ কি। ঈশ্বর গুপ্ত সেই রসে রসিক, সেই সৌন্দর্য্যের কবি। যাহা আছে, ঈশ্বর গুপ্ত তাহার কবি। তিনি এই বাঙ্গালা সমাজের কবি। তিনি কলিকাতা সহরের কবি। তিনি বাঙ্গালার গ্রাম্য দেশের কবি। এই সমাজ, এই সহর, এই দেশ—বড় কাব্যময়। অন্যে তাহাতে

বড় রস পান না। তোমরা পৌষপার্ব্বণে পিটাপুলি খাইয়া অজীর্ণে দুঃখ পাও, তিনি তাহার কাব্যরসটুকু সংগ্রহ করেন। অন্যে নববর্ষে মাংস চিবাইয়া, মদ গিলিয়া, গাঁদাফুল সাজাইয়া কষ্ট পায়, ঈশ্বর গুপ্ত মক্ষিকাবৎ তাহার সার আদান করিয়া নিজে উপভোগ করেন, অন্যকেও উপহার দেন। দুর্ভিক্ষের দিন—তোমরা মাতা বা শিশুর চক্ষে অশ্রুবিন্দুশ্রেণী সাজাইয়া মুক্তাহারের সঙ্গে তাহার উপমা দাও, তিনি চালের দরটি কষিয়া দেখিয়া তাহার ভিতর একটু রস পান—

"চালের চেয়ে ধন ঠেকেছে
তাজা মদ খাব গন্ধ নাকো।"

তোমরা সুন্দরীগণকে পুষ্পোদ্যানে বা বাতায়নে বসাইয়া প্রতিমা সাজাইয়া পূজা কর, তিনি তাহাদের রান্নাঘরে উনুনগোড়ায় বসাইয়া শাশুড়ী-ননদের গঞ্জনায় ফেলিয়া সংসারের এক রকম খাঁটি কাব্যরস বাহির করেন,—

"বধূর মধুর খনি, মুখ শতদল।
সলিলে ভাসিয়া যায়, চক্ষু ছলছল॥"

ঈশ্বর গুপ্তের কাব্য চালের কাঁটায়, রান্নাঘরের ধূঁয়ায়, নাটুরে মাঝির ধ্বজির ঠেলায়, নীলের দাদনে, হোটেলের খানায়, পাঁটার অস্থি-মজ্জায়। তিনি আনারসে মধুর রস ছাড়া কাব্যরস পান, তপ্সে মাছে মৎস্য-ভাব ছাড়া তপস্বি-ভাব দেখেন, পাঁটার বোকাগন্ধ ছাড়া একটু দধীচির গায়ের গন্ধ পান। তিনি বলেন, "তোমাদের এ দেশ, এ সমাজ বড় রঙ্গ-ভরা। তোমরা মাথা কুটাকুটি করিয়া দুর্গোৎসব কর, আমি কেবল তোমাদের রঙ্গ দেখি। তোমরা এ ওকে ফাঁকি দিতেছ, এ ওর কাছে মেকি চালাইতেছ, এখানে কান্না হাসি হাস, ওখানে মিছা কান্না কাঁদ, আমি তা বসিয়া বসিয়া দেখিয়া হাসি। তোমরা বল, বাঙ্গালীর মেয়ে বড় সুন্দরী, বড় মনোমোহিনী, প্রেমের আধার, স্নেহের সুসার, ধর্ম্মের ভাণ্ডার,—তা হইলে হইতে পারে, কিন্তু আমি দেখি উহারা বড় রঙ্গের জিনিষ। মানুষে যেমন রূপী বান্দর পোষে, আমি বলি, পুরুষে তেমনি মেয়েমানুষ পোষে,—উভয়কেই মুখ ভেঙ্গানতেই সুখ।" স্ত্রীলোকের রূপ আছে—তাহা তোমার-আমার মত ঈশ্বর গুপ্তও জানিতেন, কিন্তু তিনি বলেন, "উহা দেখিয়া মুগ্ধ হইবার কথা নহে—উহা দেখিয়া হাসিবার কথা।" তিনি স্ত্রীলোকের রূপের কথা পড়িলে হাসিয়া লুটাইয়া পড়েন। মাঘ মাসের প্রাতঃস্নানের সময়ে, যেখানে অন্য কবি রূপ দেখিবার জন্য যুবতীগণের পিছে পিছে যাইতেন, ঈশ্বরচন্দ্র সেখানে তাহাদের নাকাল দেখিবার জন্য যান। তোমরা হয়ত, সেই শীতার-শীতল স্বচ্ছসলিলধৌত কম্পিতকান্তি লইয়া আদর্শ গড়িবে, তিনি বলিলেন, "দেখ দেখি, কেমন তামাসা! যে কান্তি স্নানের সময়ে পরিধেয় বসন লইয়া বিব্রত, তোমরা তাদের পাইয়া এত বাড়াবাড়ি কর!" তোমরা মহিলাগণের গৃহকর্ম্মে আস্থা ও যত্ন দেখিয়া বলিবে, "ধন্য স্বামি-পুত্র-সেবাব্রত! ধন্য স্ত্রীলোকের স্নেহ ও ধৈর্য্য!"

যেন হাবা বাবলা ফুলে বাবলা
বাবলা ডাকে না,
বাবলা তুমি গেলেই খুসি হব,
খুসি খেয়ে বাঁচব না ॥"

সাহেব-বাবুরা খনির কাছে অনেক গালিমন্দ খাইয়াছেন। একটি নমুনা—

"যখন আসবে শমন করবে দমন
কি বোলে তায় বুঝাইবে।
বুঝি হুট বোলে, বুট পায়ে দিয়ে
চুরুট ফুঁকে স্বর্গে যাবে ?"

এক কথায় সাহেবদের নৃত্য-গীত—

"গুড় গুড় গুম গুম লাফে লাফে তাল।
তারা রারা রারা রারা লালা লালা লাল ॥"

সখের বাবু, তিনি সহরে—

"ভেড়া হ'য়ে তুড়ি মারে, টপ্পাগীত গেয়ে।
গোচ-পাকে বাবু হন, পচা শাল চেয়ে ॥
কোনরূপে পিত্তি-রক্ষা—এঁটোকাঁটা খেয়ে।
শুদ্ধ হন খেনো গাঙ্গে, খেনো জলে নেয়ে ॥"

কিন্তু অনেক স্থানেই ঈশ্বর গুপ্তের ঐ রকম নাই। অনেক স্থানেই কেবল শব্দসঙ্গ, কেবল শব্দ ও রূপের ছটা লইয়া আমোদ—

"কষিত কনক কান্তি, কমনীয় কায়।
গালভরা গোঁফদাড়ি, তপস্বীর প্রায় ॥
মানুষের দৃশ্য নও, বাস কর নীরে।
মোহন-মণির প্রভা, ননীর শরীরে ॥"

অথবা আনারসে—

"লুণ মেখে লেবুরস, রসে যুক্ত করি।
চিন্ময়ী চৈতন্যরূপা, চিনি তায় ভরি ॥"

অথবা পাঁটা—

"সাধ্য কার এক মুখে মহিমা প্রকাশে।
আপনি করেন বাদ্য, আপনার নাশে ॥
হাড়কাটে ফেলে দিই, ধ'রে দুটি ঠ্যাং।
সে সময়ে বাদ্য করে, ছ্যাডাং ছ্যাডাং ॥
এমন পাঁটার নাম যে রেখেছে বোকা।
নিজে সেই বোকা নয়, ঝাড়ে-বংশে বোকা ॥"

তবে ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, ঈশ্বর গুপ্ত মেকির উপর গালিগালাজ করিয়াছেন। মেকির উপর যথার্থ রাগ ছিল। মেকি বাবুরা তাঁহার কাছে গালি খাইতেন, মেকি

ইহাতে আমরা যে কেবলই শিখিয়াছি, এমত নহে। একটা উদাহরণের দ্বারা বুঝাই।

মেঘদূতের একটি কবিতায় কালিদাস কোন পর্ব্বত-শৃঙ্গকে ধরণীর স্তন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা বিলাতি রুচিবিরুদ্ধ, স্তন বিলাতি রুচি-অনুসারে অশ্লীল কথা। কাজেই এই উপমাটি অনেকের কাছে অশ্লীল। নব্য বাবু হয়ত ইহা শুনিয়া কাণে আঙ্গুল দিয়া পর স্ত্রী সুন্দরী ও কার্পেটের মহিমা কীর্ত্তনে মনোযোগ দিবেন। কিন্তু আমি হিন্দু বলিয়া বুঝি যদি এ উপমার অর্থ এই বুঝি যে, পৃথিবী আমাদিগের জননী; তাই তাঁহাকে ভক্তিভাবে স্নেহ করিয়া 'মাতা বসুমতী' বলি, আমরা তাঁহার সন্তান, সন্তানের চক্ষে, মাতৃস্তন অপেক্ষা সুন্দর, পবিত্র, জগতে আর কিছুই নাই—থাকিতে পারে না। অতএব এমন পবিত্র উপমা আর হইতে পারে না। ইহাতে যে অশ্লীলতা দেখে, আমার বিবেচনায় তাহার চিত্তে পাপ-চিন্তা ভিন্ন কোন বিশুদ্ধ ভাবের স্থান হয় না। কবি এখানে অশ্লীল নহেন,—এখানে পাঠকের হৃদয়—নরক। এখানে ইংরেজি রুচি বিশুদ্ধ নহে,—দেশী রুচিই বিশুদ্ধ।

আমাদের দেশের অনেক প্রাচীন কবি এইরূপ বিলাতি রুচির আইনে ধরা পড়িয়া বিনাপরাধে অশ্লীলতা অপরাধে অপরাধী হইয়াছেন। স্বয়ং বাল্মীকি কি কালিদাসেরও অব্যাহতি নাই। যে ইউরোপে জোলার নবেলের আদর, সে ইউরোপের রুচি বিশুদ্ধ, আর যাঁহারা রামায়ণ কুমারসম্ভব লিখিয়াছেন, সীতা-শকুন্তলার সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাদের রুচি অশ্লীল! এই শিক্ষা আমরা ইউরোপীয়ের কাছে পাই। কি শিক্ষা! তাই আমি অনেকবার বলিয়াছি, ইউরোপের কাছে বিজ্ঞান, ইতিহাস, শিল্প শেখ; আর সব দেশীয়ের কাছে শেখ।

তবে বাবু ঈশ্বর গুপ্ত যে অনেক স্থানে ধরা পড়েন। যে সকল স্থানে আমরা তাঁহাকে একেবারে খালাস দিতে রাজি। কিন্তু ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হয় যে, তবে অনেক স্থানেই তত সহজে তাঁহাকে নিষ্কৃতি দেওয়া যায় না। অনেক স্থানে তাঁহার রুচি বাস্তবিক কদর্য্য, যথার্থ অশ্লীল এবং বিরক্তিকর। তাহার মার্জ্জনা নাই।

ঈশ্বর গুপ্তের কবিত্ব কি প্রকার তাহা বুঝিতে গেলে, তাঁহার দোষ-গুণ দুই বুঝাইতে হয়। শুধু তাই নহে, তাঁহার কবিত্বের অপেক্ষা আর একটা বড় জিনিষ পাঠককে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি। ঈশ্বর গুপ্ত নিজে কি ছিলেন, তাহাই বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি। কবির কবিত্ব বুঝিয়া লাভ আছে, সন্দেহ নাই, কিন্তু কবিত্ব অপেক্ষা কবিকে বুঝিতে পারিলে আরও গুরুতর লাভ। কবিতা দর্পণ-মাত্র—তাহার ভিতর কবির অবিকল ছায়া আছে, দর্পণ বুঝিয়া কি হইবে? ভিতরে যাহার ছায়া, ছায়া দেখিয়া তাহাকে বুঝিব। কবিতা, কবির কীর্ত্তি—তাহা ত আমাদের হাতেই আছে—পড়িলেই বুঝিব। কিন্তু যিনি এই কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তিনি কি গুণে, কি প্রকারে, এই কীর্ত্তি রাখিয়া গেলেন, তাহাই বুঝিতে হইবে। তাহাই

সাধারণ ঈশ্বরবাদী বা ঈশ্বর-ভক্তের মত তিনি ঈশ্বরবাদী ও ঈশ্বর ভক্ত ছিলেন না। তিনি ঈশ্বরকে নিকটে দেখিতেন, যেন প্রত্যক্ষ দেখিতেন, যেন মুখামুখী হইয়া কথা কহিতেন। আপনাকে যথার্থ ঈশ্বরের পুত্র, ঈশ্বরকে আপনার সাক্ষাৎ মূর্তিমান্ পিতা বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করিতেন। মুখামুখী হইয়া বাপের সঙ্গে বচসা করিতেন। কখন বাপের আদর পাইবার জন্য কোলে বসিতে যাইতেন, আপনি বাপকে কত আদর করিতেন—উত্তর না পাইলে কাঁদাকাটি বাধাইতেন। বলিতে কি, তাঁহার ঈশ্বরের প্রতি পুত্রবৎ অকৃত্রিম প্রেম দেখিলে চক্ষের জল রাখা যায় না। অনেক সময়েই দেখিতে পাই যে বুদ্ধিমান্ ঈশ্বর সম্মুখে পাইয়া ছাড়েন না, কথার উত্তর পাইতেছেন না বলিয়া তাঁহার অসহ্য যন্ত্রণা হইতেছে, বাপকে বকিয়া কাঁদাইয়া দিতেছেন। বাপ নিরাকার নির্গুণ চৈতন্যমাত্র, সাক্ষাৎ মূর্তিমান্ বাপ নহেন, এ কথা মনে করিতেও অনেক সময়ে কষ্ট হইত—

কাতর কিঙ্কর আমি, তোমার সন্তান।
আমার জনক তুমি, সবার প্রধান॥
বার বার ডাকিতেছি, কোথা ভগবান্।
একবার তাহে তুমি নাহি দাও কাণ॥
সর্ব্বদিকে সর্ব্বলোকে কত কথা কয়।
শ্রবণে সে সব রব প্রবেশ না হয়॥
হায় হায় কব কায়, ঘটিল কি জ্বালা।
জগতের পিতা হ'য়ে তুমি হ'লে কালা॥
মনে সাধ কথা কই, নিকটে আনিয়া।
অধীর হ'লেম ভেবে বধির জানিয়া॥

এ ভক্তের স্তুতি নহে—এ বাপের উপর বেটার আবদার। ধন্য ঈশ্বরচন্দ্র! তুমি পিতৃপদ লাভ করিয়াছ, সন্দেহ নাই। আমরা কেহই তোমার সমালোচক হইবার যোগ্য নহি।

বৈষ্ণবগণ বলেন হনুমানাদি দাস্যভাবে, শ্রীদামাদি সখ্যভাবে, নন্দ যশোদা পুত্রভাবে এবং গোপীগণ কান্তভাবে সাধনা করিয়া ঈশ্বর পাইয়াছিলেন। কিন্তু পৌরাণিক ব্যাপার-সকল আমাদিগের হইতে এত দূরসংস্থিত যে, তুলনায় আমাদের যাহা লভনীয়, তাহা আমরা বড় সহজে পাই না। যদি হনুমান, উদ্ধব, যশোদা বা রাধিকাকে আমাদের কাছে পাইতাম, তবে সে সাধনা বুঝিবার চেষ্টা কতক সফল হইত। বাঙ্গালায় দুই জন সাধক আমাদের বড় নিকট। দুই জনই বৈদ্য, দুই জনই কবি। এক রামপ্রসাদ সেন আর এক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। ইঁহারা কেহই বৈষ্ণব ছিলেন না, কেহই ঈশ্বরকে প্রভু, সখা, পুত্র বা কান্তভাবে দেখেন নাই। রামপ্রসাদ ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ মাতৃভাবে দেখিয়া ভক্তি সাধিত করিয়াছিলেন—ঈশ্বরচন্দ্র পিতৃভাবে। রামপ্রসাদের মাতৃপ্রেম আর ঈশ্বরচন্দ্রের পিতৃপ্রেম ভেদ বড় অল্প।

তুমি হে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাপ্ত ত্রিসংসার।
আমি হে ঈশ্বর গুপ্ত—কুমার তোমার॥
পিতৃনামে নাম পেয়ে, উপাধি পেয়েছি।
জন্মভূমি জননীর কোলেতে বসেছি।
তুমি গুপ্ত আমি গুপ্ত, গুপ্ত কিছু নয়।
তবে কেন গুপ্তভাবে ভাব গুপ্ত রয়?

পরন্তু—আরও নিকটে,—

তোমার বদনে যদি না সরে বচন।
কেমনে হইবে তবে কথোপকথন॥
আমি যদি কিছু বলি, বুঝে অভিপ্রায়।
ইসেরায় ঘাড় নেড়ে সায় দিও তায়॥

যাহার এই ঈশ্বর-ভক্তি—যে ঈশ্বরকে এইরূপ সর্ব্বদা নিকটে, অতি নিকটে দেখে—ঈশ্বর-সংসর্গ-তৃষ্ণায় যাহার হৃদয় এইরূপে দগ্ধ—সে কি বিলাসী হইতে পারে? হয় হউক। আমরা একপ বিলাসী ছাড়িয়া সন্ন্যাসী দেখিতে চাই না।

তবে ঈশ্বর সন্ন্যাসী, হবিষ্যাশী বা অসংযতাত্মা ছিলেন না। পাঁটা, তপ্সে মাছ বা আনারসের গুণ গাহিতে ও রসাস্বাদনে—উভয়েই সক্ষম ছিলেন। যদি ইহা বিলাসিতা হয়, তিনি বিলাসী ছিলেন। তাঁহার বিলাসিতা তিনি নিজে স্পষ্ট করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন :—

লক্ষ্মীছাড়া যদি হও খেয়ে আর দিয়ে।
কিছু মাত্র সুখ নাই হেন লক্ষ্মী নিয়ে॥
যতক্ষণ থাকে ধন তোমার আগারে।
নিজে খাও, খেতে দাও, সাধ্য-অনুসারে॥
ইথে যদি কমলার মন নাহি সরে।
প্যাঁচা ল'য়ে যান মাতা কৃপণের ঘরে॥

শাস্ত্রমত যে ভোজন না করে তাহাকেই বিলাসী বলিয়া গণনা করিতে হইবে, ইহাও আমি স্বীকার করি না। গীতার ভোজনযুক্তি এই :—

আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্য-সুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ॥

মূলকথা এই—যাহা আগে বলিয়াছি—ঈশ্বর গুপ্ত মেকির বড় শত্রু। মেকি মানুষের শত্রু, এবং মেকি ধর্ম্মের শত্রু। লোভী, পরদ্বেষী অথচ হবিষ্যাশী ভণ্ডের ধর্ম্ম তিনি গ্রহণ করেন নাই। ভণ্ডের ধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া তিনি জানিতেন না। তিনি জানিতেন, ধর্ম্ম ঈশ্বরানুরাগে—আহার-ত্যাগে নহে। যে ধর্ম্ম ঈশ্বরানুরাগ ছাড়িয়া পানাহার ত্যাগকে ধর্ম্মের স্থানে খাড়া করিতে চাহিত, তিনি তাহার শত্রু। সেই ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ পাঁটার স্তোত্রে, আনারসের গুণ-গানে এবং তপ্সের মহিমা-

বর্ণনায় কবির এত সুখ হইত । মানুষটা বুঝিলাম, নিজে ধার্ম্মিক, ধর্ম্মে খাঁটি, ভেকির উপর খড়্গহস্ত। বাহিরেকার কবিতার অশ্লীলতা কেন দেখি, বোধ হয় তাহাও বুঝিয়াছি। বিলাসিতা কেন দেখি বোধ হয় তাহা এখন বুঝিলাম।

ঈশ্বর গুপ্তের কবিত্বের কথা বলিতে বলিতে তাঁহার ব্যঙ্গের কথায়, ব্যঙ্গের কথা হইতে তাঁহার অশ্লীলতার কথায়, অশ্লীলতার কথা হইতে তাঁহার বিলাসিতার কথায় আসিয়া পড়িয়াছিলাম। এখন ফিরিয়া যাইতে হইতেছে।

অশ্লীলতা যেমন তাঁহার কবিত্বের এক প্রধান দোষ, শব্দাড়ম্বরপ্রিয়তা তেমনি আর এক প্রধান দোষ। শব্দচ্ছটায় অনুপ্রাস-যমকের ঘটায় তাহার ভাবার্থ অনেক সময়ে একেবারে ডুবিয়া যাইয়া যায়। অনুপ্রাস যমকের অনুরোধে অর্থের ভিতর কি ছাই-ভস্ম থাকিয়া যায়, কবি তাহার প্রতি কিছুমাত্র মনোযোগ করিতেছেন না দেখিয়া, অনেক সময়ে রাগ হয়, দুঃখ হয়, হাসি পায়, দয়া হয়—পড়িতে আর প্রবৃত্তি হয় না। যে কারণে তাঁহার অশ্লীলতা, সেই কারণে এই যমকানুপ্রাসে অনুরাগ—দেশ, কাল, পাত্র। সংস্কৃত সাহিত্যের অবনতির সময় হইতে যমকানুপ্রাসের বড় বাড়াবাড়ি। ঈশ্বর গুপ্তের পূর্ব্বেই কবিওয়ালার কবিতায়, পাঁচালিওয়ালার পাঁচালিতে ইহার বেশী বাড়াবাড়ি। দাশরথি রায় অনুপ্রাস-যমকে বড় পটু—তাই তাঁহার পাঁচালি লোকের এত প্রিয় ছিল। দাশরথি রায়ের কবিত্ব না ছিল, এমত নহে। কিন্তু অনুপ্রাস-যমকের দৌরাত্ম্যে তাহা প্রায় একেবারে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে, পাঁচালিওয়ালা ছাড়িয়া তিনি কবির শ্রেণীতে উঠিতে পান নাই। এই অলঙ্কার-প্রয়োগের পটুতায় ঈশ্বর গুপ্তের স্থান তাঁহার পরেই—এত অনুপ্রাস যমক আর কোন বাঙ্গালীতে ব্যবহার করে নাই। এখানেও মার্জ্জিত রুচির অভাব-জন্য বড় দুঃখ হয়

অনুপ্রাস-যমক যে সর্ব্বত্রই দূষ্য, এমত কথা আমি বলি না। ইংরেজিতে ইহা বড় কদর্য্য শুনায় বটে, কিন্তু সংস্কৃতে ইহার উপযুক্ত ব্যবহার অনেক সময়েই বড় মধুর। কিছুরই বাহুল্য ভাল নহে—অনুপ্রাস-যমকের বাহুল্য বড় কষ্টকর। রাখিয়া ঢাকিয়া, পরিমিতভাবে ব্যবহার করিতে পারিলে বড় মিষ্ট। বাঙ্গালাতেও তাই। মধুসূদন দত্ত মাঝে মধ্যে পদ্যে অনুপ্রাসের ব্যবহার করেন,—বড় বুঝিয়া-সুঝিয়া, বাছিয়া-চাকিয়া ব্যবহার করেন—মধুর হয়। শ্রীমান্ অক্ষয়চন্দ্র সরকার গদ্যে কখন কখন দুই এক বুঁদ অনুপ্রাস ছাড়িয়া দেন, রস উছলিয়া উঠে।

ঈশ্বর গুপ্তের এক-একটি অনুপ্রাস বড় মিঠে—

বিবিজান চলে যান লবেজান ক'রে।

ইহার তুলনা নাই। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের সময়-অসময় নাই, বিষয়-অবিষয় নাই, সীমা সরহদ্দ নাই—একবার অনুপ্রাস-যমকের ফোয়ারা খুলিলে আর বন্ধ হয় না, আর কোন দিকে দৃষ্টি থাকে না, কেবল শব্দের দিকে। এইরূপ শব্দ-ব্যবহারে তিনি

অদ্বিতীয়। তিনি শব্দের প্রতিযোগিশূন্য অধিপতি। এই দোষ-গুণের উদাহরণ-স্বরূপ দুইটি গীত 'বোধেন্দুবিকাশ' হইতে উদ্ধৃত করিলাম :—

রাগিণী বেহাগ—তাল একতালা

কে রে বামা, বারিদবরণী,
তরুণী, ভালে ধ'রেছে তরণী,
কাহার' ঘরণী, আসিয়ে ধরণী, করিছে দনুজ জয়।
হের হে ভূপ, কি অপরূপ, অনুপ রূপ নাহি স্বরূপ,
মদন-নিধন-করণ-কারণ, চরণ-শরণ লয়॥
বামা হাসিছে, ভাষিছে, লাজ না বাসিছে,
হুহুঙ্কার-রবে দনুজ নাশিছে, নিকটে আসিছে,
বিপক্ষ বাধিছে, গ্রাসিছে বারণ-হয়।
বামা টলিছে ঢলিছে, লাবণ্য গলিছে,
সঘনে বলিছে, গগনে চলিছে,
কোপেতে জ্বলিছে, দনুজ দলিছে, ছলিছে ভুবনময়।
কে রে, ললিতরসনা, বিকটদশনা,
করিয়ে ঘোষণা, প্রকাশে বাসনা,
হ'য়ে শবাসনা, বামা বিবসনা, আসবে মগনা রয়।

রাগিণী বেহাগ—তাল একতালা

কে রে বামা, ষোড়শী রূপসী,
এলোকেশী, এ যে নহে মানুষী,
ভালে শিশুশশী, করে শোভে অসি,
রূপমসী, চারু ভাস।
দেখ, বাজিছে ঝম্প, দিতেছে লম্ফ,
কাঁপিছে দম্ভ, হ'তেছে কম্প,
গেল রে পৃথ্বী, করে কি কীর্ত্তি চরণে কৃত্তিবাস।
কে রে করাল কামিনী, মরাল-গামিনী,
কাহার স্বামিনী ভুবনভাবিনী
কোপেতে প্রভাত করেছে যামিনী,
দামিনীজড়িত-হাস।
কে রে যোগিনী-সঙ্গে, রুধির রঙ্গে,
রণতরঙ্গে নাচে ত্রিভঙ্গ,
কুটিলাপাঙ্গে, ত্রিদিব-অঙ্গে, করিছে ত্রিদিব নাশ।
আহা, যে দেখি খর্ব্ব, যে ছিল গর্ব্ব,
হইল খর্ব্ব, গেল রে সর্ব্ব,
চরণসরোজে পড়িয়ে শর্ব্ব, করিছে সর্ব্বনাশ।

করিয়াছেন। ঈশ্বর গুপ্ত সেই বিশুদ্ধ পরম মঙ্গলময় ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই ধর্ম্মের যথার্থ মর্ম্ম কি, তাহা অবগত হইবার জন্য তিনি সংস্কৃত অনভিজ্ঞ হইয়াও অধ্যাপকের সাহায্যে বেদান্তাদি ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং বুদ্ধির অসাধারণ প্রাখর্য্য-হেতু সে সকলে যে তাঁহার বেশ অধিকার জন্মিয়াছিল, তাঁহার প্রণীত গদ্য-পদ্যে তাহা বিশেষ জানা যায়।

তৃতীয়। ঈশ্বর গুপ্তের রাজনীতি বড় উদার ছিল। তাহাতেও যে তিনি সময়ের অগ্রবর্ত্তী ছিলেন, সে কথা বুঝাইতে গেলে অনেক কথা বলিতে হয়, সুতরাং নিরস্ত হইলাম।

১২৯২

জয়দেব

অক্ষয়চন্দ্র সরকার

আধুনিক বঙ্গে গান বা গীতি-কাব্যের প্রভূত আধিপত্য। ইহার সাহিত্য সঙ্গীতময়। ইহার কান্না সঙ্গীতময়, ইহার আদর-আহ্লাদ, বিলাস-কৌতুক সকলই সঙ্গীত, ধ্যান, ধারণা, কীর্ত্তন ভজন,—সঙ্গীতে, ক্রন্দন, কলহ—তাহাও সঙ্গীতে। বঙ্গদেশ যেমন গীতি-কবিতাকে আপনার সর্ব্বাবয়বের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা করিয়াছে, গীতি-কবিতাও সেইরূপ বঙ্গদেশকে গৌরবান্বিত করিয়াছে। বাঙ্গালির গীতি-কাব্য বাঙ্গালি বিচিত্র বিধানে অঙ্কিত করিয়া 'এই দেখ' বলিয়া জগতের সমক্ষে ধরিতে পারে। বৈষ্ণব ভক্তবৃন্দের মধুর পদাবলী, সাধক রামপ্রসাদ প্রভৃতির কালী-কীর্ত্তন, হরুঠাকুর প্রভৃতির কবিগান, নিধুবাবু প্রভৃতির টপ্পা—আমাদের গৌরবের সামগ্রী। পরিবর্ত্তন হউক, ইংরেজি সাহিত্যের আদর্শে বঙ্গসাহিত্য নূতন পরিচ্ছদে নিত্য পরিশোভিত হইতেছে, কিন্তু এখনও গীতি-কবিতা যেমনই উজ্জ্বলা, তেমনই মধুরা।

সেই 'জয় জগদীশ হরে'—হইতে এই 'বন্দে মাতরম্'—পর্য্যন্ত,

সেই "ললিত-লবঙ্গলতা পরিশীলন-কোমল-মলয় সমীরে,
মধুকর-নিকর-করম্বিত-কোকিল-কূজিত-কুঞ্জকুটীরে।" হইতে

এই "শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনী
ফুল্লকুসুমিত-দ্রুমদল-শোভিনী,'—পর্য্যন্ত

এক অনন্ত স্রোত, অনন্ত প্রবাহ অবিরাম চলিতেছে, অবিচ্ছিন্ন গমনে, দুকূল ভাসাইয়া কুলু কুলু রব করিয়া, বাঙ্গালির প্রেমভক্তি, বাঙ্গালির ধর্ম্মভক্তি, বাঙ্গালির কোমল হৃদয়ের কোমল মর্ম্ম, বাঙ্গালির সরল প্রাণের তরল মর্ম্ম—এই স্রোত শত বৎসর সমানে বহিয়া

হরিদ্বারই বল, আর গঙ্গাসাগরই বল, জয়দেব উভয় তীর্থেই আমাদের পুণ্যতীর্থ। গঙ্গাসাগর বিশাল ভারতসাগরের অতি ক্ষুদ্র অংশ হইলেও আমাদের নিজস্ব সাগর, আমাদের কূল-পুলিন, কুল-পাবন।

বঙ্গের সাহিত্য-জগতে জয়দেব প্রাতঃশুক্র, তিনি গীতিকাব্যের কলকণ্ঠ। বঙ্গের ধর্ম্ম-জগতে জয়দেব কোমল-কর চন্দ্রমা, চৈতন্যদেব প্রদীপ্ত সূর্য্য। এই চন্দ্র-সূর্য্যের আলোক উত্তাপে বঙ্গ-বৈষ্ণবের নিশা বিভাবরী আলোকিত ও পুলকিত রহিয়াছে।

[নবজীবন, ১২৯৩]

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

বঙ্গ-সাহিত্যের প্রথম কবি বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস। দুই জনে সমসাময়িক লোক ছিলেন। সমান বিষয় লইয়াই দুই জনের কবিতা—রাধাকৃষ্ণের মিলন বিরহ মানাভিমান, পূর্ব্বরাগ-অনুরাগ। কিন্তু বিষয় এক হইলেও দুই জন কবির ভাব অবশ্য সম্পূর্ণ এক নহে, দুই জনের বর্ণনার মধ্যে একটি বিশেষ স্বাতন্ত্র্য লক্ষিত হয়। বিদ্যাপতি আপন হৃদয়ের মধ্য দিয়া রাধাকৃষ্ণকে দেখিয়াছেন, আপন রুচি-অনুযায়ী আঁকিয়াছেন, সাজাইয়াছেন, চণ্ডীদাসও নিজের মত করিয়া তাঁহাদিগকে গড়িয়াছেন, নিজের হৃদয়ের ভাব দিয়া তাঁহাদের প্রেম বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং হৃদয়ের একই ভাব বর্ণনা করিতে বসিলেও উভয় কবির বর্ণনা যে বিভিন্ন হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কিছুই নাই। বিদ্যাপতিও রাধার রূপ খুঁটিয়া বলিয়া গিয়াছেন, চণ্ডীদাসও রাধার রূপের বর্ণনা করিয়াছেন, তাই বলিয়া দুই জনের রূপ-বর্ণনা কি একই রকম? দুই জনেই রাধার রূপের সুখ্যাতি করিয়াছেন দুই জনেই রাধাকে সুন্দরী বলিয়াছেন, সে সুন্দরী বাঙ্গালাদেশের সুন্দরী—সেই কৃষ্ণ কেশগুচ্ছ, সেই মৃগলোচন, সেই চন্দ্র-বদন, কিন্তু তথাপি দুই জনের বর্ণনা—কি তফাৎ! এক বর্ণনার মর্ম্মে মর্ম্মে বিদ্যাপতি, আর এক বর্ণনার মর্ম্মে মর্ম্মে চণ্ডীদাস। লেখার সহিত লেখকের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ জড়িত।

শুধু ভাবের কথা কেন, বিদ্যাপতির সহিত চণ্ডীদাসের ভাষারও বিস্তর প্রভেদ। বিদ্যাপতি হিন্দীর ধাঁচে ধাঁচে লিখিয়াছেন, তাঁহার অনেক কথা স্পষ্ট হিন্দী; চণ্ডীদাস বাঙ্গালী, তাঁহার লেখায় হিন্দী বড় একটা জোর করিয়া উঠিতে পারে নাই, তবে প্রাচীন বাঙ্গালার হিন্দীর সহিত সম্পর্ক আছে যে, ইহা বুঝা যায়। বিদ্যাপতি বাছিয়া বাছিয়া

মধ্যে মধ্যে শ্রুতিমধুর কথা সংগ্রহ করেন, তাঁহার সাজ-সজ্জার একটু পারিপাট্য আছে; চণ্ডীদাস সাদাসিধা, ভাব আসিতেই ছত্র করিয়া লিখিয়া যান, অন্যদিকে তাঁহার বড়-একটা নজর থাকে না। বিদ্যাপতি যেন কিছু গুছাইয়া বসিয়াছেন, চণ্ডীদাসের কোন দিকে খেয়াল নাই।

বিদ্যাপতি অপেক্ষা চণ্ডীদাসকে প্রেমের কবি বলা যাইতে পারে। প্রেমের সুর চণ্ডীদাস যেমন ধরিতে পারিয়াছেন, বিদ্যাপতি তেমন পারেন নাই। চণ্ডীদাসের কবিতার সর্বত্রই প্রেমের বিশেষ বিকাশ হইয়াছে। সুখের প্রতিই তাঁহার একমাত্র টান নহে। একটা উচ্চ আদর্শের প্রতি তাঁহার লক্ষ্য আছে। প্রেম আর মোহ যে সম্পূর্ণ বিভিন্ন পদার্থ তাহা তিনি জানেন। চণ্ডীদাস ত বলিয়াছেন,

"পিরীতি না কহে কথা।
পিরীতি লাগিয়া পরাণ ছাড়িলে
পিরীতি মিলায় তথা॥"

বাস্তবিক, প্রেম কি কখনো সহজে মিলে? প্রেমের দুয়ারে যে প্রাণ বলি দিতে পারে, সেই প্রেম পায়। আপনাকে প্রেমে ঢালিয়া দিতে হইবে, প্রেমে আর আপনার স্বাতন্ত্র্য থাকিবে না। যাহারা সুখের জন্য প্রেম চাহে, তাহাদের কপালে সুখ উঠে না।

"সুখের লাগিয়া যে করে পিরীতি
দুখ যায় তার ঠাঁই॥"

আমাদের সময়ের একজন কবিও তাহাই বলিয়াছেন, 'এরা সুখের লাগি চাহে প্রেম, প্রেম মেলে না।' চণ্ডীদাস পিরীতিকে সকল রসের সার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন,

"পিরীতি রসের সার।
পিরীতি রসের রসিক নহিলে
কি ছার পরাণ তার॥"

বিদ্যাপতিও প্রেমের উপরে আস্থা প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু চণ্ডীদাসের মত উচ্চভাবের কথা তাঁহার রচনায় পাওয়া যায় না। বিদ্যাপতি কহিয়াছেন,

"প্রেম কারণ জীউ উপেখবে
জগজন কো নাহি জানে।"

প্রেমের জন্য জীবন উপেক্ষা করে, বিদ্যাপতি স্বীকার করিয়াছেন, তথাপি চণ্ডীদাসের উপরি-উদ্ধৃত কবিতায় প্রেমের মহান্ ভাব যেমন ব্যক্ত হইয়াছে, বিদ্যাপতির লেখায় কি এ ভাব তেমন পরিস্ফুট হইয়াছে? চণ্ডীদাসের কথার ধরণে একটা সরল সুন্দর ভাব আছে, বিদ্যাপতিতে তাহা নাই। কিন্তু পাঠকেরা একেবারে হতাশ

হইবেন না, বিদ্যাপতির দুই একটি গান যাহা আছে, তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যের বিশেষ গৌরব, অন্য কোনও সাহিত্যে কোন কবি তেমনটি নাই।

চণ্ডীদাস প্রেমের জ্বালা বেশ বুঝেন, জ্বালা যাহারা সহিতে পারে না তাহারা প্রেমের রাজ্যে বাস করিবার অযোগ্য। অনলেই ত প্রেম, সুখের রাজ্যে কি প্রেম তেমন ফুটিতে পায়?

দ্বিজ চণ্ডীদাসে বলে পিরীতি এমতি।
যার যত জ্বালা তার ততই পিরীতি।।

চণ্ডীদাস অন্য এক স্থলে বলিয়াছেন,

"দুখ জ্বালা যায়, তবে ত আবার
মিলয়ে পিরীতি ধন।"

কিন্তু থাক্‌, শুধু দোষ দুই লাইনের মধুরতাটুকু দেখিয়া দুই জন কবির স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা যায় না। দুই জনের রূপ বর্ণনা, দুই জনের মিলন-বিরহের ভাব-প্রকাশ, দুই জনের উপমা-অলঙ্কার এ সকল বিশেষ করিয়া মিলাইয়া দেখিতে হইবে। তবেই না দুই জন কবির স্বাতন্ত্র্য যথার্থরূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে? চণ্ডীদাস যে প্রেমধনে ধনী, সে বিষয়ে আমাদের সংশয় না থাকিতে পারে, কিন্তু আরও কিছু না বলিলে—আরও ভাল করিয়া বিদ্যাপতির রচনার সহিত তাঁহার লেখার তুলনা না করিলে আমরা দুইজন কবির প্রাণ ধরিতে পারি না।

চণ্ডীদাসকে বিদ্যাপতির সহিত তুলনায় আমরা দুঃখের কবি বলিতে পারি। চণ্ডীদাস যে তাঁহার লেখায় অনবরত দুঃখের কথা পাড়িয়াছেন তাহা নহে, কিন্তু তাঁহার রচনার, তাঁহার অজ্ঞাতসারে কেমন একটা দুঃখের ভাব প্রবেশ করিয়াছে। লেখা দেখিয়া মনে হয়, কবির জীবনে তেমন সুখের পূর্ণমাত্রা ঘটে নাই। প্রাচীন কবিদিগের সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে আমরা কিছু বলিতে পারি না—যেখানে পণ্ডিতদিগেরই পদস্খলন-সম্ভাবনার অসদ্ভাব নাই সেখানে আমরা জোর করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করি কিরূপে? কিন্তু বোধ হয় চণ্ডীদাসের জীবনে দুঃখ-কষ্টের বিশেষ প্রভাব পড়িয়াছে। যাহা হউক, তাহা হউক বা না হউক, তাঁহার হৃদয় দুঃখভারাক্লিষ্ট ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু আপাততঃ সে কথা লইয়া তর্ক করিতে বসিবার আবশ্যকতা দেখি না। কথাটায় তর্কের বিশেষ কিছু নাইও।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস উভয়েই শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ রাধার রূপে হৃদয় হারাইয়াছেন, রাধার সৌন্দর্য্যে কোনও পবিত্র মহান্‌ ভাবের বিকাশ দেখিয়া নহে, রাধার বাহ্য সম্পদে, নবীন বয়সেই তিনি আকৃষ্ট। শ্রীকৃষ্ণের প্রেম—যদি উহাকেও প্রেম বলিতে হয়—রূপজ মোহ মাত্র। অতীন্দ্রিয় ভাবের এখানে সম্পূর্ণ অভাব। এ প্রেম যৌবনের জোয়ারেই টিকিয়া থাকে, তাহার পর যৌবনাবসানে মরিয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ হৃদয়ের অথবা উচ্চ ভাবের ধার দিয়াও যান নাই। ভোগলালসা

পরিতৃপ্তি বৈ তাঁহার অপর কোনও উদ্দেশ্য দেখা যায় না। এখন দেখিতে হইবে, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ রাধার সৌন্দর্য্য কিরূপ দেখিয়াছেন

বিদ্যাপতির শ্রীকৃষ্ণ 'রাধার বাহ্যসৌন্দর্য্য' বৈ কিছুই দেখেন নাই। তিনি রাধার প্রত্যেক অঙ্গ স্বতন্ত্রভাবে দেখিয়াছেন—অধরের লালিমা, নয়নের চাহনি, চরণের গজেন্দ্র গমন। রাধা হাসিয়া কথা বলিতেছেন, সে হাসির সৌন্দর্য্য কিরূপ? না, শরৎ পূর্ণিমার চন্দ্র যেন অমৃত বর্ষণ করিতেছে। বিদ্যাপতির কৃষ্ণ রাধার সকল বাহ্যসৌন্দর্য্য এক করিয়া মোটামুটি ভাবে প্রায় দেখেন নাই। কেবল দু এক জায়গায় রাধাকে এক করিয়া দেখিয়াছেন মাত্র। সেখানে রাধার সহিত নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রের তুলনা করিয়াছেন। অন্য উপমাও এক আধটি আছে। কিন্তু সকল উপমাই রাধার বাহিরের জিনিস—তা' চন্দ্রই হৌক, বিদ্যুৎই হৌক, আর যাহাই হৌক। শ্রীকৃষ্ণের উপর যে সৌন্দর্য্যের প্রভাব একটি শ্লোকে বেশ ভাল করিয়া প্রকাশ পাইয়াছে সে শ্লোকটী,

"সজনি ভাল করি পেখন না ভেল।
মেঘ-মালা সঙ্গে তড়িত-লতা জনু
হৃদয়ে শেল দেই গেল॥" ইত্যাদি।

চণ্ডীদাসের কৃষ্ণও রাধার বাহ্যসৌন্দর্য্য-মুগ্ধ। তিনিও রাধার বদনকমল, হরিণনয়ান দেখিয়াছেন কিন্তু চণ্ডীদাসের কৃষ্ণ বিদ্যাপতির কৃষ্ণ অপেক্ষা রাধাকে দেখিয়াছেন ভাল করিয়া। বিদ্যাপতির কৃষ্ণ রাধার অঙ্গের প্রতি লক্ষ্যই অধিক নিরীক্ষণ করিয়া দেখিয়াছেন, সমস্ত রাধাকে দেখিবার—কেমন বিশেষ করিয়া দেখিবার—তাঁহার সুবিধা হইয়া উঠে নাই কিন্তু চণ্ডীদাস রাধাকে বিশেষ করিয়া দেখিয়াছেন। চণ্ডীদাসের কৃষ্ণ রাধার আড়নয়নে ঈষৎ হাসি লক্ষ্য করিয়াছেন কিন্তু সমস্ত রাধাকে—আপাদমস্তক—তিনি দেখিতে ভুলেন নাই। রাধাকে ভাগে ভাগে অঙ্গে অঙ্গে ছাড়া এক করিয়াও তিনি অনেকটা দেখিয়াছেন। বিদ্যাপতি অপেক্ষা চণ্ডীদাস রাধার মধ্য হইতে দেখিয়া তুলনা দিয়াছেন। যেমন,

"হিয়ার মালা, যৌবনের ডালা,
পসারী পসারল যেন॥"

এখন এই পূর্ব্বরাগে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কৃষ্ণ কিরূপভাবে রাধাকে দেখিয়াছেন দেখিতে হইবে। দুই জনের রাধাই হাবভাবশূন্যা নহেন। কিন্তু বিদ্যাপতির রাধা কিলকিঞ্চিত-কৌশলে দক্ষা অধিক। চণ্ডীদাসের কৃষ্ণ দেখিয়াছেন, রাধার হাসির চাহনি পর্য্যন্ত। কিন্তু বিদ্যাপতির কৃষ্ণ দেখিয়াছেন আরও বেশী। রাধা হাসিয়া তাঁহার পানে ফিরিয়া দেখেন, দূরে গিয়া সখীদিগের ডাকিবার ছলে শ্রীকৃষ্ণের পানে চাহিয়া লয়েন, ইত্যাদি। শুধু ইহাই নহে, বুকের হার ছিঁড়িয়া ফেলিয়া সখীদিগকে

তাঁহার দিন কাটিতেছে না। আর এই দিন কাটে না বলিয়াই তাঁহার সজলনয়ান। রাধার "তিন এক হয় যুগ চারি।"

রাধা যে শুধু সজল নয়নে পথ চাহিয়াই থাকেন, তাহা নহে। বিরহের মধ্যে অভিশাপ লাগিয়া আছে। কিন্তু অভিশাপ কাহাকে? কালকে বুঝি? কালকে হইলে ত রক্ষা ছিল, কিন্তু রাধা কালকেই বিরহের কারণ ঠাহরেন নাই, তাঁহার লক্ষ্য সচেতন পদার্থে। রাধার অভিশাপ শুনিলেই তাহা বুঝা যায়।

"নারীর দীর্ঘ নিশ্বাস, পড়ুক তাহার পাশ
পিয়া মোর যার পাশ বৈসে।"

তাহার পাশে এই দীর্ঘ নিশ্বাস পড়ুক। এ কি সহজ কথা? তাহার বুকে শেল বিঁধাইয়া দিলে বুঝি প্রাণের আশ মিটে না, দীর্ঘ নিশ্বাসে তাহার কোমল হৃদয় খাক হইয়া যাক—সে যন্ত্রণায় ছটফট করিয়া মরুক। রাধা রাধা, তুমি তাহার হৃদয়ে ছুরিকা বিঁধাইয়া দাও, তাহার হৃদয়ের শোণিতে তোমার বিরহ-জ্বালার উপশম কর, কিন্তু এ অভিশাপ দিও না গো। এ অভিশাপ তাহাকে—কাহাকে কে জানে?—তাহাকে দিও না।

চণ্ডীদাসের রাধাও আবেগভরে অভিসম্পাত করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার আবার এ রোগ কেন? কারণ অবশ্যই আছে।

"সই কেমনে ধরিব হিয়া?
আমার বঁধুয়া আন বাড়ী যায়
আমার আঙিনা দিয়া?
সে বঁধু কালিয়া না চায় ফিরিয়া,
এমতি করিল কে?
আমার অন্তর যেমন করিছে,
তেমতি হউক সে॥
যাহার লাগিয়া সব তেয়াগিনু
লোকে অপযশ কয়।
সেই গুণনিধি, ছাড়িয়া পিরীতি
আর জানি কার হয়?
আপনা আপনি, মন বুঝাইতে,
পরতীত নাহি হয়।
পরের পরাণ হরণ করিলে
কাহার পরাণে সয়?
যুবতী হইয়া, শ্যাম ভাঙাইয়া,
এমতি করিল কে?
আমার পরাণ যেমতি করিছে,
তেমতি হউক সে।"

বলা বাহুল্য। এরূপ ভাষায় কোন গ্রন্থ প্রণীত হইলে, তাহা তখনই বিলুপ্ত হইত ; কেন-না, কেহ তাহা পড়িত না। কাজেই বাঙ্গালা সাহিত্যের কোন শ্রীবৃদ্ধি হইত না।

এই সংস্কৃতানুসারিণী ভাষা প্রথম মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তের হাতে কিছু সংস্কার-প্রাপ্ত হইল। ইঁহাদিগের ভাষা সংস্কৃতানুসারিণী হইলেও তত দুর্বোধ্য নহে। বিশেষতঃ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা অতি সুমধুর ও মনোহর। তাঁহার পূর্ব্বে কেহই এরূপ সুমধুর বাঙ্গালা গদ্য লিখিতে পারে নাই এবং তাঁহার পরেও কেহ পারে নাই। কিন্তু তাহা হইলেও সর্ব্বজনবোধগম্য ভাষা হইতে ইহা অনেক দূরে রহিল। সকল প্রকার কথার এ ভাষায় ব্যবহার হইত না বলিয়া, ইহাতে সকল প্রকার ভাব প্রকাশ করা যাইত না এবং সকল প্রকার রচনা ইহাতে চলিত না। যাহা ভাষার ওজস্বিতা এবং বৈচিত্র্যের অভাব হইলে ভাষা উন্নতিশালিনী হয় না। কিন্তু প্রাচীন প্রথায় আবদ্ধ এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষার মনোহারিতায় বিমুগ্ধ হইয়া কেহই আর কোন প্রকার ভাষায় রচনা করিতে ইচ্ছুক বা সাহসী হইত না। কাজেই বাঙ্গালা সাহিত্য পূর্ব্ববৎ সঙ্কীর্ণ পথেই চলিল।

ইহা অপেক্ষা বাঙ্গালা ভাষায় আরও একটি গুরুতর বিপদ্ ঘটিয়াছিল। সাহিত্যের ভাষাও যেমন সঙ্কীর্ণ পথে চলিতেছিল, সাহিত্যের বিষয়ও তেমনি সঙ্কীর্ণ পথে চলিতেছিল। যেমন ভাষাও সংস্কৃতের ভাণ্ডারে বদ্ধ ছিল, সাহিত্যের বিষয়ও তেমনই সংস্কৃতের এবং কদাচিৎ ইংরাজির ভাণ্ডারে বদ্ধ ছিল। সংস্কৃত বা ইংরাজি গ্রন্থের সার-সঙ্কলন বা অনুবাদ ভিন্ন বাঙ্গালা সাহিত্য আর কিছুই প্রসব করিত না। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রতিভাশালী লেখক ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহারও শকুন্তলা ও সীতার বনবাস সংস্কৃত হইতে, ভ্রান্তিবিলাস ইংরাজি হইতে এবং বেতালপঞ্চবিংশতি হিন্দি হইতে সংগৃহীত। অক্ষয়কুমার দত্তের ইংরাজি একমাত্র অবলম্বন ছিল। আর সকলে তাঁহাদের অনুকারী এবং অনুবর্ত্তী। বাঙ্গালি লেখকেরা [illegible] সাহিত্যে হস্তপ্রসারণ করিতেন না। জগতের অনন্ত ভাণ্ডার আপনাদের অধিকারে আনিবার চেষ্টা না করিয়া, সকলেই ইংরাজি ও সংস্কৃতের ভাণ্ডারে চুরির সন্ধানে বেড়াইতেন। সাহিত্যের পক্ষে ইহার অপেক্ষা গুরুতর বিপদ আর কিছুই নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় ও অক্ষয়কুমার যাহা করিয়াছিলেন তাহা সময়ের প্রয়োজনানুগত, অতএব তাঁহারা প্রশংসা ব্যতীত অপ্রশংসার পাত্র নহেন, কিন্তু সমস্ত বাঙ্গালি লেখকের দল সেই একমাত্র পথের পথিক হওয়াই বিপদ।

এই দুইটি গুরুতর বিপদ্ হইতে প্যারীচাঁদ মিত্রই বাঙ্গালা সাহিত্যকে উদ্ধৃত করেন। যে ভাষা সকল বাঙ্গালির বোধগম্য এবং সকল বাঙ্গালি কর্তৃক ব্যবহৃত, প্রথম তিনিই তাহা গ্রন্থপ্রণয়নে ব্যবহার করিলেন, এবং তিনিই প্রথম ইংরাজি ও সংস্কৃতের ভাণ্ডারে পূর্ব্বগামী লেখকদিগের উচ্ছিষ্টাবশেষের অনুসন্ধান না করিয়া, স্বভাবের অনন্ত ভাণ্ডার হইতে আপনার রচনার উপাদান সংগ্রহ করিলেন। এক

'আলালের ঘরের দুলাল' নামক গ্রন্থে এই উভয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। আলালের ঘরের দুলাল বাঙ্গালা ভাষায় চিরস্থায়ী ও চিরস্মরণীয় হইবে। উহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ তৎপরে কেহ প্রণীত করিয়া থাকিতে পারেন, অথবা ভবিষ্যতে কেহ করিতে পারেন কিন্তু আলালের ঘরের দুলালের দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের যে উপকার হইয়াছে, আর কোন বাঙ্গালা গ্রন্থের দ্বারা সেরূপ হয় নাই এবং ভবিষ্যতে হইবে কি-না সন্দেহ।

আমি এমন বলিতেছি না যে আলালের ঘরের দুলালের ভাষা আদর্শ-ভাষা। উহাতে গাম্ভীর্য্যের এবং বিশুদ্ধির অভাব আছে এবং উহাতে অতি উন্নত ভাব সকল, সকল সময়ে পরিস্ফুট করা যায় কি না সন্দেহ। কিন্তু উহাতেই প্রথম এ বাঙ্গালা দেশে প্রচারিত হইল যে, যে-বাঙ্গালা সর্ব্বজন মধ্যে কথিত এবং প্রচলিত, তাহাতে গ্রন্থ রচনা করা যায়, সে রচনা সুন্দরও হয়, এবং যে সর্ব্বজন-হৃদয়-গ্রাহিতা সংস্কৃতানুযায়িনী ভাষার পক্ষে দুর্লভ, এ ভাষার তাহা সহজ গুণ। এই কথা জানিতে পারা বাঙ্গালি জাতির পক্ষে অল্প লাভ নহে এবং এই কথা জানিতে পারার পর হইতে উন্নতির পথে বাঙ্গালা সাহিত্যের গতি অতিশয় দ্রুতবেগে চলিতেছে। বাঙ্গালা ভাষার এক সীমায় তারাশঙ্করের কাদম্বরীর অনুবাদ, আর এক সীমায় প্যারীচাঁদ মিত্রের আলালের ঘরের দুলাল। ইহার কেহই আদর্শ ভাষায় রচিত নয়। কিন্তু আলালের ঘরের দুলালের পর হইতে বাঙ্গালি লেখক জানিতে পারিল যে, এই উভয় জাতীয় ভাষার উপযুক্ত সমাবেশ দ্বারা এবং বিষয়ভেদে একের প্রবলতা ও অপরের অল্পতা দ্বারা, আদর্শ বাঙ্গালা গদ্যে উপস্থিত হওয়া যায়। প্যারীচাঁদ মিত্র আদর্শ বাঙ্গালা গদ্যের সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন, কিন্তু বাঙ্গালা গদ্য যে উন্নতির পথে যাইতেছে, প্যারীচাঁদ মিত্র তাহার প্রধান ও প্রথম কারণ। ইহাই তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি।

আর তাঁহার দ্বিতীয় অক্ষয় কীর্ত্তি এই যে, তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, সাহিত্যের প্রকৃত উপাদান আমাদের ঘরেই আছে—তাহার জন্য ইংরাজি বা সংস্কৃতের কাছে ভিক্ষা চাহিতে হয় না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যেমন জীবনে তেমনই সাহিত্যে, ঘরের সামগ্রী যত সুন্দর, পরের সামগ্রী তত সুন্দর বোধ হয় না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যদি সাহিত্যের দ্বারা বাঙ্গালা দেশকে উন্নত করিতে হয়, বাঙ্গালা দেশের কথা লইয়াই সাহিত্য গড়িতে হইবে। প্রকৃত পক্ষে, আমাদের জাতীয় সাহিত্যের আদি আলালের ঘরের দুলাল। প্যারীচাঁদ মিত্রের এই দ্বিতীয় অক্ষয় কীর্ত্তি।

অতএব বাঙ্গালা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান অতি উচ্চ। এই কথাই আমার বক্তব্য।

[১২৯৯]

বঙ্কিমচন্দ্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যে কালে বঙ্কিমের নবীনা প্রতিভা লক্ষ্মীরূপে সুধাভাণ্ড হস্তে লইয়া বাংলাদেশের সমুখে আবির্ভূত হইলেন তখনকার প্রাচীন লোকেরা বঙ্কিমের রচনাকে সসম্মান-আনন্দের সহিত অভ্যর্থনা করেন নাই।

সেদিন বঙ্কিমকে বিস্তর উপহাস বিদ্রূপ গ্লানি সহ্য করিতে হইয়াছিল। তাঁহার উপর একদল লোকের সুতীব্র বিদ্বেষ ছিল, এবং ক্ষুদ্র যে-লেখক-সম্প্রদায় তাঁহার অনুকরণের বৃথা চেষ্টা করিত, তাহারাই আপন ঋণ গোপন করিবার প্রয়াসে তাঁহাকে সর্বাপেক্ষা অধিক গালি দিত।

আবার এখনকার যে নূতন পাঠক ও লেখক সম্প্রদায় উদ্ভূত হইয়াছেন, তাঁহারাও বঙ্কিমের পরিপূর্ণ প্রভাব হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিবার অবকাশ পান নাই। তাঁহারা বঙ্কিমের গঠিত সাহিত্য-ভূমিতেই একেবারে ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন, বঙ্কিমের নিকট যে তাঁহারা কতরূপে কতভাবে ঋণী তাহার হিসাব বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া তাঁহারা দেখিতে পাইতেছেন না।

কিন্তু বর্তমান লেখকের সৌভাগ্যক্রমে অবস্থানের সহিত যখন বঙ্কিমের প্রথম সাক্ষাৎকার হয়, তখন সাহিত্যরুচি-সম্বন্ধে কোনোরূপ পূর্বসংস্কার আমাদের মনে বদ্ধমূল হইয়া যায় নাই এবং বর্তমান কালের নূতন ভাবপ্রবাহও আমাদের নিকট অপরিচিত অনভ্যস্ত ছিল। তখন বঙ্গসাহিত্যের যেমন প্রাতঃসন্ধ্যা উপস্থিত, আমাদের সেইরূপ বয়ঃসন্ধিকাল। বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যে প্রভাতের সূর্যোদয় বিকাশ করিলেন, আমাদের হৃৎপদ্ম সেই প্রথম উদ্ঘাটিত হইল।

পূর্বে কী ছিল এবং পরে কী পাইলাম তাহা দুই কালের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আমরা এক মুহূর্তেই অনুভব করিতে পারিলাম। কোথায় গেল সেই অন্ধকার, সেই একাকার, সেই সুপ্তি, কোথায় গেল সেই বিজয়-বসন্ত, সেই গোলেবকাওলি, সেই বালক-ভুলানো কথা—কোথা হইতে আসিল এত আলোক, এত আশা, এত সংগীত, এত বৈচিত্র্য। বঙ্গদর্শন যেন তখন আষাঢ়ের প্রথম বর্ষার মতো "সমাগতো রাজবদুন্নতধ্বনিঃ।" এবং মুষলধারে ভাববর্ষণে বঙ্গসাহিত্যের পূর্ববাহিনী পশ্চিমবাহিনী সমস্ত নদী নির্ঝরিণী অকস্মাৎ পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া যৌবনের আনন্দবেগে ধাবিত হইতে লাগিল। কত কাব্য নাটক উপন্যাস কত প্রবন্ধ কত সমালোচনা কত মাসিকপত্র কত সংবাদপত্র বঙ্গভূমিকে জাগ্রত প্রভাতকলরবে মুখরিত করিয়া তুলিল। বঙ্গভাষা সহসা বাল্যকাল হইতে যৌবনে উপনীত হইল।

আমরা কিশোরকালে বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে ভাবের সেই নবসমাগমের মহোৎসব দেখিয়াছিলাম, সমস্ত দেশ ব্যাপ্ত করিয়া যে-একটি আশার আনন্দ নূতন হিল্লোলিত

হইয়াছিল, তাহা অনুভব করিয়াছিলাম, সেই জন্য আজ মধ্যে মধ্যে নৈরাশ্য উপস্থিত হয়। মনে হয় সেদিন হৃদয়ে যে অপরিমেয় আশার সঞ্চার হইয়াছিল, তদনুরূপ ফললাভ করিতে পারি নাই। সে জীবনের বেগ আর নাই। কিন্তু এ নৈরাশ্য অনেকটা অমূলক। প্রথম সমাগমের প্রবল উচ্ছ্বাস কখনও স্থায়ী হইতে পারে না। সেই নব আনন্দ নবীন প্রণয়ের অভ্যুদয় হইতে বর্তমানের তুলনা করাই অন্যায়। বিবাহের প্রথম দিনে যে বাঁশিতে বাঁশীধ্বনি হয়, সে-বাঁশী চিরদিনের নহে। সেদিন কেবল অবিমিশ্র আনন্দ এবং আশা, তাহার পর হইতে বিচিত্র কর্তব্যমিশ্রিত দুঃখসুখ, ক্ষুদ্র বাধাবিঘ্ন, আবর্তিত বিরহমিলন—তাহার পর হইতে গভীর গম্ভীরভাবে নানাপথ বাহিয়া নানা শোকতাপ অতিক্রম করিয়া সংসারপথে অগ্রসর হইতে হইবে, প্রতিদিন আর নহবৎ বাজিবে না। তথাপি সেই একদিনের উৎসবের স্মৃতি কঠোর কর্তব্যপথে চিরদিন আনন্দ সঞ্চার করে।

বঙ্কিমচন্দ্র স্বহস্তে বঙ্গভাষার সহিত সেদিন নবযৌবনপ্রাপ্ত ভাবের পরিণয় সাধন করাইয়াছিলেন, সেই দিনের সর্বব্যাপী প্রফুল্লতা এবং আনন্দ উৎসব আমাদের মনে আছে। সেদিন আর নাই। আজ নানা লেখা নানা মত নানা আলোচনা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। আজ কোনো দিন বা ভাবের স্রোত মন্দ হইয়া আসে, কোনো দিন বা অপেক্ষাকৃত পরিপুষ্ট হইয়া উঠে।

এইরূপ হইয়া থাকে এবং এইরূপই হওয়া আবশ্যক। কিন্তু কাহার প্রসাদে এরূপ হওয়া সম্ভব হইল, সে-কথা স্মরণ করিতে হইবে। আমরা আত্মাভিমানে সর্বদাই তাহা ভুলিয়া যাই।

ভুলিয়া যে যাই তাহার প্রধান প্রমাণ রামমোহন রায়কে আমাদের বর্তমান বঙ্গদেশের নির্মাতা বলিয়া আমরা জানি না। কি রাজনীতি, কি বিদ্যাশিক্ষা, কি সমাজ, কি ভাষা আধুনিক বঙ্গদেশে এমন কিছুই নাই রামমোহন রায় স্বহস্তে যাহার সূত্রপাত করিয়া যান নাই। এমন কি, আজ প্রাচীন শাস্ত্রালোচনার প্রতি দেশের যে এক নূতন উৎসাহ দেখা যাইতেছে রামমোহন রায় তাহারও পথ-প্রদর্শক। যখন নবশিক্ষাভিমানে স্বভাবতই পুরাতন শাস্ত্রের প্রতি অবজ্ঞা জন্মিবার সম্ভাবনা তখন রামমোহন রায় সাধারণের অনধিগম্য বিস্মৃতপ্রায় বেদপুরাণতন্ত্র হইতে সারোদ্ধার করিয়া প্রাচীন শাস্ত্রের গৌরব উজ্জ্বল রাখিয়াছিলেন।

বঙ্গদেশ আজ সেই রামমোহন রায়ের নিকট কিছুতেই কায়মনের সহিত কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে চাহেন না। রামমোহন বঙ্গসাহিত্যকে গ্রানিট স্তরের উপর স্থাপন করিয়া নিমজ্জন দশা হইতে উন্নত করিয়া তুলিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাহারই উপর প্রতিভার প্রবাহ ঢালিয়া স্তরবদ্ধ পলি মৃত্তিকা ক্ষেপণ করিয়া গিয়াছেন। আজ বাংলাভাষা কেবল দৃঢ় বাসযোগ্য নহে, উর্বরা শস্যশ্যামলা হইয়া উঠিয়াছে। বাসভূমি যথার্থ মাতৃভূমি হইয়াছে। এখন আমাদের মনের খাদ্য প্রায় ঘরের দ্বারেই ফলিয়া উঠিতেছে।

অথচ যেখানে উচ্চ আদর্শ তখন দাঁড়াইয়া যায় নাই। সেই সময়ে সব্যসাচী বঙ্কিম এক হস্ত গঠন-কার্যে আর এক হস্ত নিবারণ-কার্যে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। একদিকে অগ্নি জ্বালাইয়া রাখিতেছিলেন আর একদিকে ধূম এবং ভস্মরাশি দূর করিবার ভার নিজেই লইয়াছিলেন।

রচনা এবং সমালোচনা এই উভয় কার্যের ভার বঙ্কিম একাকী গ্রহণ করাতেই বঙ্গসাহিত্য এত সত্বর এমন দ্রুত পরিণতি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল

এই দুরূহ ব্রতানুষ্ঠানের যে ফল তাহাও তাঁহাকে ভোগ করিতে হইয়াছিল। মনে আছে, বঙ্গদর্শনে যখন তিনি সমালোচক-পদে আসীন ছিলেন, তখন তাঁহার ক্ষুদ্র শত্রুর সংখ্যা অল্প ছিল না। শত শত অযোগ্য লোক তাঁহাকে ঈর্ষা করিত এবং তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব অপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতে ছাড়িত না।

কণ্টক যতই ক্ষুদ্র হৌক তাহার বিদ্ধ করিবার ক্ষমতা আছে। এবং কল্পনাপ্রবণ লেখকদিগের বেদনাবোধও সাধারণের অপেক্ষা কিছু অধিক। ছোটো ছোটো দংশনগুলি যে বঙ্কিমকে লাগিত না, তাহা নহে, কিন্তু কিছুতেই তিনি কর্তব্যে পরাঙ্মুখ হন নাই। তাঁহার অজেয় বল, কর্তব্যের প্রতি নিষ্ঠা এবং নিজের প্রতি বিশ্বাস ছিল। তিনি জানিতেন, বর্তমানের কোনো উপদ্রব তাঁহার মহিমাকে আচ্ছন্ন করিতে পারিবে না, সমস্ত ক্ষুদ্র শত্রুর ব্যূহ হইতে তিনি অনায়াসে নিষ্ক্রমণ করিতে পারিবেন। এই জন্য চিরকাল তিনি অম্লানমুখে বীরদর্পে অগ্রসর হইয়াছেন কোনো দিন তাঁহাকে রথ-বেগ খর্ব করিতে হয় নাই।

সাহিত্যের মধ্যে দুই শ্রেণীর যোগী দেখা যায়, ধ্যানযোগী এবং কর্মযোগী। ধ্যানযোগী একান্তমনে বিরলে ভাবের চর্চা করেন, তাঁহার রচনাগুলি সংসারী লোকের পক্ষে যেন উপরি-পাওনা—যেন যথালাভের মতো।

কিন্তু বঙ্কিম সাহিত্যে কর্মযোগী ছিলেন তাঁহার প্রতিভা আপনাতে আপনি স্থিরভাবে পর্যাপ্ত ছিল না। সাহিত্যের যেখানে যাহা কিছু অভাব ছিল সর্বত্রই তিনি আপনার বিপুল বল এবং আনন্দ লইয়া ধাবমান হইতেন। কি কাব্য, কি বিজ্ঞান, কি ইতিহাস, কি ধর্মতত্ত্ব, যেখানে যখনই তাঁহাকে আবশ্যক হইত, সেখানে তখনই তিনি সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া দেখা দিতেন। নবীন বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে সকল বিষয়েই আদর্শ স্থাপন করিয়া যাওয়া তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। বিপন্ন বঙ্গভাষা আর্তস্বরে যেখানেই তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছে, সেইখানেই তিনি প্রসন্ন চতুর্ভুজ মূর্তিতে দর্শন দিয়াছেন।

কিন্তু তিনি যে কেবল অভয় দিতেন সান্ত্বনা দিতেন, অভাব পূর্ণ করিতেন, তাহা নহে, তিনি দর্পহারীও ছিলেন। এখন যাঁহারা সাহিত্যের সারথ্য স্বীকার করিতে চান তাঁহারা কিসে নির্বিরোধ বঙ্গদর্শককে অত্যুক্তিপূর্ণ স্তুতিবাক্যে নিয়ত প্রসন্ন রাখিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু বঙ্কিমের বাণী কেবল স্তুতিবাদিনী ছিল না, খড়্গধারিণীও ছিল। বঙ্গদেশ যদি অসাড় প্রাণহীন না হইত তবে কৃষ্ণচরিত্রে বর্তমান পতিত হিন্দুসমাজ

করিতেন এবং কল্পনার উচ্ছ্বাস, ভাবের আবেগ এবং ভক্ত্যাতিশয্য প্রকাশ করিবার এমন অনুকূল অবসর কখনোই ছাড়িতেন না, সুবিচারিত তর্ক দ্বারা, সুকঠিন সত্যনির্ণয়ের স্পৃহা দ্বারা পদে পদে আপন লেখনীকে বাধা দিতেন না, সর্বজনগম্য সরল পথ ছাড়িয়া দিয়া সূক্ষ্মবুদ্ধি দ্বারা স্বকপোলকল্পিত একটা নূতন আবিষ্কারকেই সর্বপ্রাধান্য দিয়া তাহাকেই বাক্‌চাতুর্যে এবং কল্পনাকুহকে সমাচ্ছন্ন করিয়া তুলিতেন, এবং নিজের বিদ্যা ও প্রতিভাকে যথাসাধ্য টানিয়া বুনিয়া আশেপাশে দীর্ঘ করিয়া অধিক পরিমাণ লোককে আপন মতের জালে আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিতেন।

বস্তুত আমাদের শাস্ত্র হইতে ইতিহাস উদ্ধারের প্রকৃত ভার কেবল বঙ্কিম লইতে পারিতেন। এক দিকে হিন্দুশাস্ত্রের প্রকৃত মর্মগ্রহণে য়ুরোপীয়দিগের অক্ষমতা, অন্য দিকে শাস্ত্রগত প্রমাণের নিরপেক্ষ বিচার-সম্বন্ধে হিন্দুদিগের সংকোচ, এক দিকে রীতিমত পরিচয়ের অভাব, অন্য দিকে অতিপরিচয়জনিত অভ্যাস ও সংস্কারের অন্ধতা, যথার্থ ইতিহাসটিকে এই উভয়সংকটের মাঝখান হইতে উদ্ধার করিতে হইবে। দেশানুরাগের সাহায্যে শাস্ত্রের অন্তরে প্রবেশ করিতে হইবে এবং সত্যানুরাগের সাহায্যে তাহার অমূলক অংশ পরিত্যাগ করিতে হইবে। যে বলে ইচ্ছাকে বেগ দিতে হইবে সেই বলের আকর্ষণে তাহাকে সর্বদা সংযত করিতে হইবে। এই সকল ক্ষমতা-সামঞ্জস্য বঙ্কিমের ছিল।—সেই জন্য মৃত্যুর অনতিপূর্বে তিনি যখন প্রাচীন বেদ-পুরাণ সংগ্রহ করিয়া প্রবৃত্ত হইয়া বসিয়াছিলেন, তখন বঙ্গসাহিত্যের বড়ো আশার কারণ ছিল, কিন্তু মৃত্যু সে-আশা সফল হইতে দিল না, এবং আমাদের ভাগ্যে যাহা অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল তাহা যে কবে সমাধা হইবে কেহই বলিতে পারে না।

বঙ্কিম এই যে সর্বপ্রকার আতিশয্য এবং অসংগতি হইতে আপনাকে রক্ষা করিয়া গিয়াছেন, ইহা তাঁহার প্রতিভার প্রকৃতিগত। যেকেহ তাঁহার রচনা পড়িয়াছেন, সকলেই জানেন, বঙ্কিম হাস্যরসে সুরসিক ছিলেন। যে পরিষ্কার বুদ্ধির আলোকের দ্বারা সমস্ত আতিশয্য ও অসংগতি প্রকাশ হইয়া পড়ে, হাস্যরস সেই কিরণেরই একটি রশ্মি। কতদূর পর্যন্ত গেলে একটি ব্যাপার হাস্যজনক হইয়া উঠে তাহা সকলে অনুভব করিতে পারে না, কিন্তু যাঁহারা হাস্যরস-রসিক তাঁহাদের অন্তঃকরণে একটি বোধশক্তি আছে যদ্দ্বারা তাঁহারা সকল সময়ে নিজের না হইলেও অপরের কথাবার্তা আচার ব্যবহার এবং চরিত্রের মধ্যে অসংগতির সূক্ষ্ম সীমাটুকু সহজে নির্ণয় করিতে পারেন।

নির্মল শুভ্র সংযত হাস্য বঙ্কিমই সর্বপ্রথমে বঙ্গসাহিত্যে আনয়ন করেন। তৎপূর্বে বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসকে অন্য রসের সহিত এক পঙ্‌ক্তিতে বসিতে দেওয়া হইত না। সে নিম্নাসনে বসিয়া গ্রাম্য অশ্লীল ভাষায় ভাঁড়ামি করিয়া সভাজনের মনোরঞ্জন করিত। আদিরসেরই সহিত যেন তাহার কোনো একটি সর্ব-উপদ্রবসহ বিশেষ কুটুম্বিতার সম্পর্ক ছিল এবং ঐ রসটিকেই সর্বপ্রকারে পীড়ন ও আন্দোলন করিয়া তাহার অধিকাংশ পরিহাস বিদ্রূপ প্রকাশ পাইত। এই প্রগল্‌ভ বিদূষকটি

যতই প্রিয়পাত্র থাক্ কখনও সম্মানের অধিকারী ছিল না। যেখানে গম্ভীরভাবে কোনো বিষয়ের আলোচনা হইত সেখানে হাস্যের চপলতা সর্বপ্রযত্নে পরিহার করা হইত।

বঙ্কিম সর্বপ্রথমে হাস্যরসকে সাহিত্যের উচ্চশ্রেণীতে উন্নত করেন। তিনিই প্রথমে দেখাইয়া দেন যে, কেবল প্রহসনের সীমার মধ্যে হাস্যরস বদ্ধ নহে, উজ্জ্বল শুভ্র হাস্য সকল বিষয়কেই আলোকিত করিয়া তুলিতে পারে। তিনিই প্রথম দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রমাণ করাইয়া দেন যে, এই হাস্যজ্যোতির সংস্পর্শে কোনো বিষয়ের গভীরতার গৌরব হ্রাস হয় না, কেবল তাহার সৌন্দর্য এবং রমণীয়তার বৃদ্ধি হয়, তাহার সর্বাংশের প্রাণ এবং গতি যেন সুস্পষ্টরূপে দীপ্যমান হইয়া উঠে। যে-বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যের গভীরতা হইতে অশ্রুর উৎস উন্মুক্ত করিয়াছেন, সেই বঙ্কিম আনন্দের উদয়শিখর হইতে নবজাগ্রত বঙ্গসাহিত্যের উপর হাস্যের আলোক বিকীর্ণ করিয়া দিয়াছেন।

কেবল সুসংগতি নহে, সুরুচি এবং শিষ্টতার সীমা নির্ণয় করিতেও একটি স্বাভাবিক সূক্ষ্ম বোধশক্তির আবশ্যক। মাঝে মাঝে অনেক বলিষ্ঠ প্রতিভার মধ্যে সেই বোধ-শক্তির অভাব দেখা যায়। কিন্তু বঙ্কিমের প্রতিভায় বল এবং সৌকুমার্যের একটি সুন্দর সম্মিলন ছিল। নারীজাতির প্রতি যথার্থ বীরপুরুষের মনে যেরূপ একটি সসম্ভ্রম সম্মানের ভাব থাকে, তেমনই সুরুচি এবং শীলতার প্রতি বঙ্কিমের বলিষ্ঠ বুদ্ধির একটি বীরোচিত প্রীতিপূর্ণ শ্রদ্ধা ছিল। বঙ্কিমের রচনা তাহার সাক্ষ্য। বর্তমান লেখক যে-দিন প্রথম বঙ্কিমকে দেখিয়াছিল সেদিন একটি ঘটনা ঘটে যাহাতে বঙ্কিমের এই স্বাভাবিক সুরুচিপ্রিয়তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

সেদিন লেখকের আত্মীয় পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয়ের নিমন্ত্রণে তাঁহাদের মরকতকুঞ্জে কলেজ-রিয়ুনিয়ন নামক মিলন-সভা বসিয়াছিল। ঠিক কত দিনের কথা ভালো স্মরণ নাই, কিন্তু আমি তখন বালক ছিলাম। সেদিন সেখানে আমার অপরিচিত বহুতর যশস্বী লোকের সমাগম হইয়াছিল। সেই বুধমণ্ডলীর মধ্যে একটি ঋজু দীর্ঘকায় উজ্জ্বলকৌতুকপ্রফুল্লমুখ গুম্ফধারী প্রৌঢ় পুরুষ চাপকান-পরিহিত বক্ষের উপর দুই হস্ত আবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। দেখিবামাত্রই যেন তাঁহাকে সকলের হইতে স্বতন্ত্র এবং আত্মসমাহিত বলিয়া বোধ হইল। আর সকলে জনতার অংশ, কেবল তিনি যেন একাকী একজন। সেদিন আর কাহারো পরিচয় জানিবার জন্য আমার কোনোরূপ প্রয়াস জন্মে নাই, কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ আমি এবং আমার একটি আত্মীয় সঙ্গী একসঙ্গেই কৌতূহলী হইয়া উঠিলাম। সন্ধান লইয়া জানিলাম তিনিই আমাদের বহুদিনের অভিলষিতদর্শন লোকবিশ্রুত বঙ্কিমবাবু। মনে আছে, প্রথম দর্শনেই তাঁহার মুখশ্রীতে প্রতিভার প্রখরতা এবং বলিষ্ঠতা এবং সর্বলোক হইতে তাঁহার একটি সুদূর স্বাতন্ত্র্যভাব আমার মনে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। তাহার পর অনেক বার তাঁহার সাক্ষাৎলাভ করিয়াছি, তাঁহার নিকট অনেক উৎসাহ এবং উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং তাঁহার মুখশ্রী স্নেহের কোমলহাস্যে অত্যন্ত কমনীয়

হইতে দেখিয়াছি, কিন্তু এখন স্মরণে নাই যে তাঁহার মুখের উদাত্ত বক্তৃতার ন্যায় একটি উজ্জ্বল তীক্ষ্ণ প্রবলতা দেখিতে পাইয়াছিলাম, তাহা আজ পর্যন্ত বিস্মৃত হই নাই।

সেই উৎসব উপলক্ষে একটি ঘরে একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত দেশানুরাগমূলক স্বরচিত সংস্কৃত শ্লোক পাঠ এবং তাহার ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। বঙ্কিম একপ্রান্তে দাঁড়াইয়া শুনিতেছিলেন। পণ্ডিত মহাশয় সহসা একটি শ্লোকে পতিত ভারতসন্তানকে লক্ষ করিয়া একটি অত্যন্ত সেকেলে পণ্ডিতী অলংকার প্রয়োগ করিলেন, সেটা কিঞ্চিৎ বীভৎস হইয়া উঠিল। বঙ্কিম তৎক্ষণাৎ একান্ত সংকুচিত হইয়া দক্ষিণ করতলে মুখের নিম্নার্ধ ঢাকিয়া পার্শ্ববর্তী দ্বার দিয়া দ্রুতবেগে অন্য ঘরে পলায়ন করিলেন। বঙ্কিমের সেই সসংকোচ পলায়ন-দৃশ্যটি অদ্যাবধি আমার মনে মুদ্রাঙ্কিত হইয়া আছে।

বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে, ঈশ্বর গুপ্ত যখন সাহিত্যগুরু ছিলেন, বঙ্কিম তখন তাঁহার শিষ্যশ্রেণীর মধ্যে গণ্য ছিলেন। সে-সময়কার সাহিত্য অন্য যে-কোনো প্রকার শিক্ষা দিক সম্যক্‌ ঠিক সুরুচি শিক্ষার উপযোগী ছিল না। সে-সময়কার অসংযত বাগ্‌যুদ্ধ এবং আন্দোলনের মধ্যে দীক্ষিত ও বর্ধিত হইয়া ইতরতার প্রতি বিদ্বেষ, সুরুচির প্রতি শ্রদ্ধা এবং শ্লীলতা-সম্বন্ধে অক্ষুণ্ণ বেদনাবোধ রক্ষা করা যে কী আশ্চর্য ব্যাপার তাহা সকলেই বুঝিতে পারিবেন। দীনবন্ধুও বঙ্কিমের সমসাময়িক এবং তাঁহার বান্ধব ছিলেন, কিন্তু তাঁহার লেখায় অন্য ক্ষমতা প্রকাশ হইলেও তাহাতে বঙ্কিমের প্রতিভার এই ব্রাহ্মণোচিত শুচিতা দেখা যায় নাই। তাঁহার রচনা হইতে ঈশ্বর গুপ্তের সময়ের ছাপ কালক্রমে ধৌত হইতে পারে নাই।

আমাদের মধ্যে যাঁহারা সাহিত্যব্যবসায়ী তাঁহারা বঙ্কিমের কাছে যে কী চিরঋণে আবদ্ধ, তাহা যেন কোনো কালে বিস্মৃত না হন। একদিন আমাদের বঙ্গভাষা কেবল একতারা যন্ত্রের মতো এক তারে বাঁধা ছিল, কেবল সহজ সুরে ধর্মসংকীর্তন করিবার উপযোগী ছিল। বঙ্কিম স্বহস্তে তাহাতে এক-একটি করিয়া তার চড়াইয়া আজ তাহাকে বীণাযন্ত্রে পরিণত করিয়া তুলিয়াছেন। পূর্বে যাহাতে কেবল স্থানীয় গ্রাম্যসুর বাজিত, আজ তাহা বিশ্বসভায় শুনাইবার উপযুক্ত ধ্রুপদ অঙ্গের কলাবতী রাগিণী আলাপ করিবার যোগ্য হইয়া উঠিতেছে। সেই তাঁহার স্বহস্তসম্পূর্ণ স্নেহপালিত ক্রোড়সঙ্গিনী বঙ্গভাষা আজ বঙ্কিমের জন্য অন্তরের সহিত রোদন করিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তিনি এই শোকোচ্ছ্বাসের অতীত শান্তিধামে দুর্গম জীবনযাত্রার অবসানে চিরবিরাম বিশ্রাম লাভ করিয়াছেন। মৃত্যুর পরে তাঁহার মুখে একটি কোমল প্রসন্নতা, একটি সর্বদুঃখতাপহীন গভীর প্রশান্তি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল—যেন জীবনের মধ্যাহ্ন-রৌদ্রদগ্ধ কঠিন সংসারতল হইতে মৃত্যু তাঁহাকে স্নেহ-সুশীতল জননীক্রোড়ে তুলিয়া লইয়াছে। আজ আমাদের বিলাপ-পরিতাপ তাঁহাকে স্পর্শ করিতেছে না, আমাদের ভক্তি-উপহার গ্রহণ করিবার জন্য সেই প্রতিভাজ্যোতির্ময় সৌম্য প্রসন্নমূর্তি এখানে উপস্থিত নাই। আমাদের এই শোক এই ভক্তি কেবল আমাদেরই কল্যাণের জন্য।

বঙ্কিম সাহিত্যক্ষেত্রে যে আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, এই শোকে এই ভক্তিতে সেই আদর্শ প্রতিমা আমাদের অন্তরে উজ্জ্বল এবং স্থায়ী রূপে প্রতিষ্ঠিত হউক। প্রস্তরের মূর্তি স্থাপনের অর্থ এবং সামর্থ্য আমাদের যদি না থাকে, তবে একবার তাঁহার মহত্ত্ব সর্বতোভাবে মনের মধ্যে উপলব্ধি করিয়া তাঁহাকে আমাদের বঙ্গ-হৃদয়ের স্মৃতিস্তম্ভে স্থায়ী করিয়া রাখি। ইট কাঠ এবং ইট কাঠের মানুষ চিরস্থায়ী নহে, রাজনৈতিক, ধর্মনৈতিক, সমাজনৈতিক মতামত সময়ানুসারে পরিবর্তিত হইতে পারে, যে-সকল ঘটনা যে-সকল অনুষ্ঠান আজ সর্বপ্রধান বলিয়া বোধ হইতেছে এবং যাহার উন্মাদনার কোলাহলে সমাজের প্রাত্যহিক শব্দহীন কর্তব্যগুলিকে নগণ্য বলিয়া মনে হইতেছে কাল তাহার স্মৃতিমাত্র চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে না পারে, কিন্তু যিনি আমাদের মাতৃভাষাকে সর্বপ্রকার ভাবপ্রকাশের অনুকূল করিয়া গিয়াছেন তিনি এই হতভাগ্য দরিদ্র দেশকে একটি অমূল্য চিরসম্পদ্ দান করিয়াছেন। তিনি স্থায়ী জাতীয় উন্নতির একমাত্র মূল উপায় স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তিনিই আমাদের নিকটে যথার্থ শোকের মধ্যে সান্ত্বনা, অবনতির মধ্যে আশা, শ্রান্তির মধ্যে উৎসাহ এবং দারিদ্র্যের শূন্যতার মধ্যে চিরসৌন্দর্যের অক্ষয় আকর উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়াছেন। আমাদিগের মধ্যে যাহা-কিছু অমর এবং আমাদিগকে যাহা কিছু অমর করিবে, সেই সকল মহাশক্তিকে ধারণ করিবার পোষণ করিবার প্রকাশ করিবার এবং সর্বত্র প্রচার করিবার একমাত্র উপায় যে মাতৃভাষা তাহাকেই তিনি বলবতী এবং মহীয়সী করিয়াছেন।

রচনাবিশেষের সমালোচনা ভ্রান্ত হইতে পারে—আমাদিগের নিকট যাহা প্রশংসিত কালক্রমে শিক্ষা, রুচি এবং অবস্থার পরিবর্তনে আমাদের উত্তরপুরুষের নিকট তাহা নিন্দিত এবং উপেক্ষিত হইতে পারে, কিন্তু বঙ্কিম বঙ্গভাষার ক্ষমতা এবং বঙ্গসাহিত্যের সম্ভ্রম বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন, তিনি ভগীরথের ন্যায় সাধনা করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যে ভাবমন্দাকিনীর অবতারণ করিয়াছেন এবং সেই পুণ্যস্রোতঃস্পর্শে জড়ত্বশাপ মোচন করিয়া আমাদের প্রাচীন ভস্মরাশিকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছেন—ইহা কেবল সাময়িক মত নহে, এ-কথা কোনো বিশেষ তর্ক বা রুচির উপর নির্ভর করিতেছে না, ইহা একটি ঐতিহাসিক সত্য।

এই কথা স্মরণে মুদ্রিত করিয়া সেই বাংলা লেখকদিগের গুরু বাংলা পাঠকদিগের সুহৃদ্, এবং সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা বঙ্গভূমির মাতৃবৎসল প্রতিভাশালী সন্তানের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করি, যিনি জীবনের সায়াহ্ন আসিবার পূর্বেই নূতন অবকাশে নূতন উদ্যমে নূতন কার্যে হস্তক্ষেপ করিবার প্রারম্ভেই, আপনার অপরিম্লান প্রতিভা-রশ্মি সংহরণ করিয়া বঙ্গ সাহিত্যাকাশ ক্ষীণতর জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর হস্তে সমর্পণপূর্বক গত শতাব্দীর বর্ষশেষের পশ্চিম দিগন্তসীমার অকালে অস্তমিত হইলেন।

[১৩০০]

বিহারীলাল

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিহারীলালের কণ্ঠ সাধারণের নিকট তেমন সুপরিচিত ছিল না। তাঁহার শ্রোতৃমণ্ডলীর সংখ্যা অল্প ছিল এবং তাঁহার সুমধুর সংগীত নির্জনে নিভৃতে ধ্বনিত হইতে থাকিত, খ্যাতির প্রার্থনায় পাঠক এবং সমালোচক-সমাজের দ্বারবর্তী হইত না।

কিন্তু যাহারা দৈবক্রমে এই বিজনবাসী ভাবনিমগ্ন কবির সংগীতকাকলীতে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার কাছে আসিয়াছিল তাহাদের নিকটে আদরের অভাব ছিল না। তাহারা তাঁহাকে বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া জানিত।

বঙ্গদর্শন-প্রকাশ হইবার বহুপূর্বে কিছুকাল ধরিয়া অবোধবন্ধু নামক একটি মাসিক পত্র বাহির হইত। তখন বর্তমান লেখক বালক-বয়স-প্রযুক্ত নিতান্ত অবোধ ছিল। কিঞ্চিৎ বয়ঃপ্রাপ্তিসহকারে যখন বোধোদয় হইল তখন উক্ত কাগজ বন্ধ হইয়া গেল।

সৌভাগ্যক্রমে পত্রগুলি কতক বাঁধানো কতক বা খণ্ড আকারে আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আলমারির মধ্যে রক্ষিত ছিল। অনেক মূল্যবান পুঁথি থাকাতে সে আলমারিতে চপলপ্রকৃতি বালকদের হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ ছিল। এক্ষণে নির্ভয়ে স্বীকার করিতে পারি,—অবোধবন্ধুর বন্ধুত্ব-প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া সে নিষেধ লঙ্ঘন করিয়াছিলাম। এই গোপন দুষ্কর্মের জন্য কোনোরূপ শাস্তি পাওয়া দূরে থাক্, বহুকাল ধরিয়া যে আনন্দলাভ করিয়াছিলাম তাহা এখনো বিস্মৃত হই নাই।

এই ক্ষুদ্র পত্রে যে-সকল গদ্যপ্রবন্ধ বাহির হইত, তাহার মধ্যে কিছু বিশেষত্ব ছিল। তখনকার বাংলা গদ্যে সাধুভাষার অভাব ছিল না, কিন্তু ভাষার চেহারা ফোটে নাই, তখন যাঁহারা মাসিক পত্রে লিখিতেন তাঁহারা যেন সাজিয়া লিখিতেন, এই জন্য তাঁহারা পাঠকদের নিকট আত্মপ্রকাশ করেন নাই এবং এই জন্যই তাঁহাদের লেখার যেন একটা স্বরূপ ছিল না। যখন অবোধবন্ধু পাঠ করিতাম তখন তাহাকে ইস্কুলের পড়ার অনুবৃত্তি বলিয়া মনে হইত না। বাংলা ভাষায় বোধ করি সেই প্রথম মাসিক পত্র বাহির হইয়াছিল, যাহার রচনার মধ্যে একটা স্বাদ বৈচিত্র্য পাওয়া যাইত। বর্তমান বঙ্গসাহিত্যের প্রাণসঞ্চারের ইতিহাস যাঁহারা পর্যালোচনা করিবেন, তাঁহারা অবোধবন্ধুকে উপেক্ষা করিতে পারিবেন না। বঙ্গদর্শনকে যদি আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের প্রভাত-সূর্য বলা যায়, তবে ক্ষুদ্রায়তন অবোধবন্ধুকে প্রত্যুষের শুকতারা বলা যাইতে পারে।

সে প্রত্যুষে অধিক লোক জাগে নাই এবং সাহিত্যকুঞ্জে বিচিত্র কলগীত কূজিত হইয়া উঠে নাই। সেই ঊষালোকে কেবল একটি ভোরের পাখী সুমিষ্ট সুন্দর সুরে গান ধরিয়াছিল। সে সুর তাহার নিজের।

ঠিক ইতিহাসের কথা বলিতে পারি না, কিন্তু আমি সেই প্রথম বাংলা কবিতায় কবির নিজের সুর শুনিলাম।

রাত্রির অন্ধকার যখন দূর হইতে থাকে, তখন যেমন জগতের মূর্ত্তি রেখায় রেখায় ফুটিয়া উঠে—সেইরূপ অবোধবন্ধুর গদ্যে এবং পদ্যে যেন প্রতিভার প্রত্যুষকিরণে মূর্ত্তির বিকাশ হইতে লাগিল। পাঠকের কল্পনার নিকটে একটি ভাবের দৃশ্য উদ্‌ঘাটিত হইয়া গেল,—

"সর্ব্বদাই হু হু করে মন,
বিশ্ব যেন মরুর মতন;
চারি দিকে ঝালাপালা,
উঃ কি জ্বলন্ত জ্বালা!
অগ্নিকুণ্ডে পতঙ্গ-পতন।"

আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে এই প্রথম বোধ হয় কবির নিজের কথা। তৎসময়ে অথবা তৎপূর্ব্বে মাইকেলের চতুর্দ্দশপদীতে কবির আত্ম-নিবেদন কখনো কখনো প্রকাশ পাইয়া থাকিবে, কিন্তু তাহা বিরল, এবং চতুর্দ্দশপদীর সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে আত্মকথা এমন কঠিন ও সংহত হইয়া আসে যে, তাহাতে বেদনার গীতোচ্ছ্বাস তেমন স্ফূর্ত্তি পায় না।

বিহারীলাল তখনকার ইংরাজিভাষায় নব্যশিক্ষিত কবিদিগের ন্যায় যুদ্ধবর্ণনাসঙ্কুল মহাকাব্য, উদ্দীপনাপূর্ণ দেশানুরাগমূলক কবিতা লিখিলেন না, এবং পুরাতন কবিদিগের ন্যায় পৌরাণিক উপাখ্যানের দিকেও গেলেন না—তিনি নিভৃতে বসিয়া নিজের ছন্দে নিজের মনের কথা বলিলেন। তাঁহার সেই স্বগত উক্তিতে বিশ্বহিত, দেশহিত অথবা সভামনোরঞ্জনের কোনো উদ্দেশ্য দেখা গেল না। এই জন্য তাঁহার সুর অন্তরঙ্গরূপে হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া সহজেই পাঠকের বিশ্বাস আকর্ষণ করিয়া আনিল।

পাঠকদিগকে এইরূপ বিশ্রব্ধভাবে আপনার নিকটে টানিয়া আনিবার ভার প্রথম অবোধবন্ধু গদ্যে এবং অবোধবন্ধুর কবি বিহারীলালের কাব্যে অনুভব করিয়াছিলাম। পৌল বর্জ্জিনীতে (*Paul and Virginia*) যেমন মানুষের এবং প্রকৃতির নিকট-পরিচয় লাভ করিয়াছিলাম, বিহারীলালের কাব্যেও সেইরূপ একটি ঘনিষ্ঠ সঙ্গ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। বলা থাক্, নিম্ন উদ্ধৃত শ্লোকগুলির বর্ণনায় এবং সঙ্গীতে মনশ্চক্ষের সমক্ষে সুন্দর চিত্রপট উদ্‌ঘাটিত হইয়া হৃদয়কে চঞ্চল করিয়া তুলিত :—

"কভু ভাবি কোন বরষার,
উথলে বন্ধুর ধার ধার,
প্রচণ্ড প্রতাপ-ধ্বনি,
বায়ুবেগে প্রতিধ্বনি
চতুর্দ্দিকে হতেছে বিস্তার,—

ইহার মধ্যে প্রায় যুক্ত অক্ষর নাই। নিম্নলিখিত শ্লোকে অনেকগুলি যুক্তাক্ষর আছে, অথচ উক্ত শ্লোকই সুখপাঠ্য এবং শ্রুতিমধুর :—

"পদে পৃথ্বী, শিরে ব্যোম,
তুচ্ছ তারা সূর্য্য সোম,
নক্ষত্র নখাগ্রে যেন গণিবারে পারে ;
সমুখে সাগরাম্বরা
ছড়িয়ে রয়েছে ধরা
কটাক্ষে কখন যেন দেখিছে তাহারে।"

এই দুইটি শ্লোকই কবির রচিত সারদামঙ্গল হইতে উদ্ধৃত। এক্ষণে বঙ্গসুন্দরী হইতে দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তুলনা করা যাক্ :—

"একদিন দেব তরুণ তপন
হেরিলেন সুরনদীর জলে—
অপরূপ এক কুমারী-রতন
খেলা করে নীল নলিনীদলে।"

ইহার সহিত নিম্ন-উদ্ধৃত শ্লোকটি একসঙ্গে পাঠ করিলে প্রভেদ প্রতীয়মান হইবে :—

"অপ্সরী কিন্নরী দাঁড়াইয়ে তীরে
ধরিয়ে ললিত করুণ তান ;]
বাজায়ে বাজায়ে বীণা ধীরে ধীরে,
গাহিছে আদরে স্নেহের গান।",

'অপ্সরী কিন্নরী' যুক্ত অক্ষর নহে। এখানে ছন্দোভঙ্গ করিয়াছে। কবিও এই কারণে বঙ্গসুন্দরীতে যথাসাধ্য যুক্ত অক্ষর বর্জন করিয়া চলিয়াছেন।

কিন্তু বাংলা যে ছন্দে যুক্ত অক্ষরের স্থান হয় না সে ছন্দ আদরণীয় নহে, কারণ, ছন্দের ঝঙ্কার এবং ধ্বনিবৈচিত্র্য যুক্ত অক্ষরের উপরেই অধিক নির্ভর করে। একে বাংলা ছন্দে স্বরের দীর্ঘ-হ্রস্বতা নাই তাহার উপরে যদি যুক্ত অক্ষর বাদ পড়ে, তবে ছন্দ নিতান্তই অস্থিবিহীন সুললিত শব্দপিণ্ড হইয়া পড়ে, তাহা শীঘ্রই শ্রান্তিজনক তন্দ্রা-কর্ষক হইয়া উঠে, এবং হৃদয়কে আঘাতপূর্ব্বক ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিতে পারে না। সংস্কৃত ছন্দে যে বিচিত্র-সঙ্গীত তরঙ্গিত হইতে থাকে, তাহার প্রধান কারণ স্বরের দীর্ঘ-হ্রস্বতা এবং যুক্ত অক্ষরের বাহুল্য। মাইকেল মধুসূদন ছন্দের এই নিগূঢ় তত্ত্বটি অবগত ছিলেন, সেই জন্য তাঁহার অমিত্রাক্ষরে এমন পরিপূর্ণ ধ্বনি এবং তরঙ্গিত গতি অনুভব করা যায়।

আর্য্যদর্শনে বিহারীলালের সারদামঙ্গল-সঙ্গীত যখন প্রথম বাহির হইল, তখন ছন্দের প্রভেদ সুস্পষ্টই প্রতীয়মান হইল। সারদামঙ্গলের ছন্দ নূতন নহে, তাহা প্রচলিত ত্রিপদী, কিন্তু কবি তাহা সঙ্গীত-সৌন্দর্য্যে সিক্ত করিয়া তুলিয়াছেন। বঙ্গসুন্দরীর

ছন্দোলালিত্য অনুকরণ করা সহজ, সেই নিষ্ঠা একবার অভ্যস্ত হইয়া গেলে তাহার বন্ধন ছেদন করা কঠিন, কিন্তু সারদামঙ্গলের গীতসৌন্দর্য্য অনুকরণসাধ্য নহে।

সারদামঙ্গল এক অপরূপ কাব্য। প্রথম যখন তাহার পরিচয় পাইলাম, তখন তাহার ভাষায়, ভাবে এবং সঙ্গীতে নিরতিশয় মুগ্ধ হইতাম, অথচ তাহার আদ্যোপান্ত একটা সুসংলগ্ন অর্থ করিতে পারিতাম না। যেই একটু মনে হয় এইবার বুঝি কাব্যের মর্ম্ম পাইলাম, অমনি তাহা আকার-পরিবর্ত্তন করে। সূর্য্যাস্তকালের সুবর্ণমণ্ডিত মেঘমালার মতো সারদামঙ্গলের সোনার শ্লোকগুলি বিবিধ রূপের আভাস দেয়, কিন্তু কোনো রূপকে স্থায়িভাবে ধারণ করিয়া রাখে না, অথচ সুদূর সৌন্দর্য্যস্বর্গ হইতে একটি অপূর্ব্ব পূরবী রাগিণী প্রবাহিত হইয়া অন্তরাত্মাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিতে থাকে।

এই জন্য সারদামঙ্গলের শ্রেষ্ঠতা অরসিক লোকের নিকট তর্কদ্বারা প্রমাণ করা বড়ই কঠিন হইত। যে বলিত, আমি বুঝিলাম না, আমাকে বুঝাইয়া দাও, তাহার নিকট হার মানিতে হইত।

কবি যাহা দিতেছেন, তাহাই গ্রহণ করিবার জন্য পাঠককে প্রস্তুত হওয়া উচিত, পাঠক যাহা চান, তাহাই কাব্য হইতে আদায় করিবার চেষ্টা করিতে গেলে অধিকাংশ সময়ে নিরাশ হইতে হয়। তাহার ফল হয়, যাহা চাই তাহা পাই না এবং কবি যাহা দিতেছেন তাহা হইতেও বঞ্চিত হইতে হয়। সারদামঙ্গলে কবি যাহা গাহিতেছেন তাহা কান পাতিয়া শুনিলে একটি স্বর্গীয় সঙ্গীত-সুধায় হৃদয় অভিষিক্ত হইয়া উঠে, কিন্তু সমালোচনা-শাস্ত্রের আইনের মধ্য হইতে ছাঁকিয়া লইবার চেষ্টা করিলে তাহার অনেক রস বৃথা নষ্ট হইয়া যায়।

প্রকৃতপক্ষে সারদামঙ্গল একটি সমগ্র কাব্য নহে, তাহাকে কতকগুলি খণ্ড কবিতার সমষ্টিরূপে দেখিলে তাহার অর্থবোধ হইতে কষ্ট হয় না। দ্বিতীয়ত, সরস্বতী সম্বন্ধে সাধারণ পাঠকের মনে যেরূপ ধারণা আছে, কবির সরস্বতী তাহা হইতে স্বতন্ত্র।

কবি যে সরস্বতীর বন্দনা করিয়াছেন, তিনি নানা আকারে, নানা চিহ্নে নানা লোকের নিকট উদিত হন। তিনি কখনো জননী, কখনো প্রেয়সী, কখনো কন্যা। তিনি সৌন্দর্য্যরূপে জগতের অভ্যন্তরে বিরাজ করিতেছেন, এবং দয়া-স্নেহ-প্রেমে মানবের চিত্তকে অহরহ বিচলিত করিতেছেন। ইংরাজ কবি শেলি যে বিশ্বব্যাপিনী সৌন্দর্য্যলক্ষ্মীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন,—

> "Spirit of beauty, that does consecrate
> With thine own hues all thou dost shine upon
> Of human thought or form." *

যাঁহাকে বলিয়াছেন,—

> "Thou messenger of sympathies,
> That wax and wane in lovers' eyes,"

সেই দেবীই বিহারীলালের সরস্বতী।

*

সারদামঙ্গলের আরম্ভের চারি শ্লোকে কবি সেই সারদাদেবীকে মূর্ত্তিমতী করিয়া বন্দনা করিয়াছেন। তৎপরে, বাল্মীকির তপোবনে সেই করুণারূপিণী দেবীর কিরূপে আবির্ভাব হইল, কবি তাহা বর্ণনা করিতেছেন। পাঠকের নেত্র-সম্মুখে দৃশ্যপট যখন উঠিল তখন তপোবনে অন্ধকার রাত্রি।

" নাই চন্দ্র সূর্য্য তারা,
অনল-হিল্লোল-ধারা,
বিচিত্র বিদ্যুৎ-দামদ্যুতি ঝলমল ,
তিমিরে নিমগ্ন ভব,
নীরব নিস্তব্ধ সব,
কেবল মরুৎরাশি করে কোলাহল।"

এমন সময়ে উষার উদয় হইল।—

" হিমাদ্রি-শিখর পরে
আচম্বিতে আলো করে
অপরূপ জ্যোতি ওই পুণ্য-তপোবনে ;
বিকচ নয়নে চেয়ে
হাসিছে দুধের মেয়ে,—
তামসী-তরুণ-উষা কুমারী-রতন।

কিরণে ভুবন ভরা,
হাসিয়ে জাগিল ধরা,
হাসিয়ে জাগিল শূন্যে দিগঙ্গনাগণে।
হাসিল অম্বরতলে
পারিজাত দলে দলে,
হাসিল মানস সরে কমল কানন।"

তপোবনে এক দিকে যেমন তিমির রাত্রি ভেদ করিয়া তরুণ উষার অভ্যুদয় হইল, তেমনি অপর দিকে নিষ্ঠুর হিংসাকে বিদীর্ণ করিয়া কিরূপে করুণাময় কাব্যজ্যোতি প্রকাশ পাইল, কবি তাহার বর্ণনা করিতেছেন,—

অমনি করুণোদয়,
দুলে দুলে দুলে নব
রসনা হরিণী-বাণী রুনুঝুনু স্বনে ,
নিরখি লোচনলোভা
পুলিন বিপিন-শোভা
ভ্রমেন বাল্মীকি মুনি ভাবভোলা মনে।

শাখি-শাখে সমস্বরে
কোক-কোকী সুখে সুখে
কতই সোহাগ করে বসি' সু-ছন্দায়,
হানিল শবরে বাণ,
নাশিল ক্রৌঞ্চের প্রাণ
রুধিরে আপ্লুত পাখা ধরণী লুটায়।

ক্রৌঞ্চী প্রিয় সহচরে
ঘেরে ঘেরে শোক করে,
অরণ্য পূরিল তার কাতর ক্রন্দনে—
চক্ষে করি' দরশন
জড়িমা-জড়িত মন,
করুণ-হৃদয় মুনি বিহ্বলের প্রায় ;
সহসা ললাট-ভাগে
জ্যোতির্ম্ময়ী কন্যা জাগে,
জাগিল বিজলী যেন নীল নবঘনে।

কিরণে কিরণময়
বিচিত্র আলোকোদয়,
ম্রিয়মাণ রবিচ্ছবি, ভুবন উজলে।
চন্দ্র নয়, সূর্য্য নয়,
সমুজ্জ্বল শান্তিময়,
ঋষির ললাটে আজি না জানি কি জ্বলে।

কিরণ-মণ্ডলে বসি'
জ্যোতির্ম্ময়ী সুরূপসী
যোগীর ধ্যানের ধন ললাটিকা মেয়ে
নামিলেন ধীরি ধীর,
দাঁড়ালেন হ'য়ে স্থির
মুগ্ধনেত্রে বাল্মীকির মুখপানে চেয়ে।

করে ইন্দ্রধনু বালা,
গলায় তারার মালা,
সীমন্তে নক্ষত্র জ্বলে, ঝল্‌মলে কানন,
কানে কিরণের ফুল,
দোদুল চাঁচর চুল
উড়িয়ে উড়িয়ে পড়ে ঢাকিয়ে আনন।

* * * *

করুণ ক্রন্দন-রোল
উঃ উঃ উতরোল,
চমকি' বিহ্বলা বালা চাহিলেন ফিরে,

হেরিলেন রত্নাকর
মৃত ক্রৌঞ্চ ভগ্ন-পাখা,
কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে ক্রৌঞ্চ ওড়ে ঘিরে' ঘিরে'।
একবার সে ক্রৌঞ্চীরে
আরবার বাল্মীকিরে
নেহারেন ফিরে ফিরে, যেন উন্মাদিনী।
কাতরা করুণা-ভরে,
গা'ন সকরুণ স্বরে,
ধীরে ধীরে বাজে করে বীণা বিষাদিনী।
সে শোক-সংগীত-কথা
শুনে কাঁদে তরু-লতা,
তমসা আকুল হয়ে কাঁদে উভরায়।
নিরখি' নন্দিনী-ছবি
গদ্‌গদ আদি কবি,
অন্তরে করুণা-সিন্ধু উথলিয়া যায়।"

সারদাদেবীর এই এক করুণামূর্ত্তি। তাহার পর ২১ শ্লোক হইতে আবার একটি কবিতার আরম্ভ হইয়াছে। সে কবিতায় সারদাদেবী ব্রহ্মার মানস-সরোবরে স্বর্ণ-পদ্মের উপর দাঁড়াইয়াছেন এবং তাঁহার অসংখ্য ছায়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। ইহা সারদাদেবীর বিশ্বব্যাপিনী সৌন্দর্য্যমূর্ত্তি।—

"ব্রহ্মার মানস-সরে
ফুটে ঢল ঢল করে
নীল জলে মনোহর স্বর্ণ-কমলিনী,
পাদপদ্ম রাখি তায়
হাসি হাসি ভাসি যায়
ষোড়শী রূপসী বামা পূর্ণিমা-যামিনী।
কোটি শশী উপহাসি
উথলে লাবণ্যরাশি,
তরল দর্পণে যেন দিগন্ত আবরে,
আচম্বিতে অপরূপ
রূপসীর প্রতিরূপ
হাসি হাসি ভাসি ভাসি উদয় অম্বরে।"

এই সারদাদেবীর এই Spirit of Beautyর নব-প্রস্ফুটিত করুণা বালিকামূর্ত্তি এবং সর্ব্বত্র-ব্যাপ্ত সুন্দরী ষোড়শীমূর্ত্তির বর্ণনা সমাপ্ত করিয়া কবি গাহিয়া উঠিয়াছেন,—

"তোমারে হৃদয়ে রাখি
সদানন্দ মনে থাকি
শ্মশান অমরাবতী দুই ভাল লাগে,

গিরিবালা, কুঞ্জবন,
গৃহ, নাট-নিকেতন,
যখন যেখানে যাই, যাও আগে আগে।
* * * *
যত মনে অভিলাষ,
তত তুমি ভালবাস,
তত মন-প্রাণ ভোরে আমি ভালবাসি।
ভক্তিভাবে একতানে
মজেছি তোমার ধ্যানে,
কমলার ধন-মানে নহি অভিলাষী।"

এই মানসীরূপিণী সাধনার ধনকে পরিপূর্ণরূপে লাভ করিবার জন্য কাতরতা প্রকাশ করিয়া কবি প্রথম সর্গ সমাপ্ত করিয়াছেন।

তাহার পরের সর্গ হইতে প্রেমিকের ব্যাকুলতা। কখনো অভিমান, কখনো বিরহ, কখনো আনন্দ, কখনো বেদনা, কখনো ভর্ৎসনা, কখনো স্তব। দেবী কবির প্রণয়িনীরূপে উদিত হইয়া বিচিত্র সুখ-দুঃখে শতধারে সঙ্গীত উচ্ছ্বসিত করিয়া তুলিতেছেন। কবি কখনো তাঁহাকে পাইতেছেন, কখনো তাঁহাকে হারাইতেছেন—কখনো তাঁহার অভয়-রূপ, কখনো তাঁহার সংহারমূর্তি দেখিতেছেন। কখনো তিনি অভিমানিনী, কখনো বিষাদিনী, কখনো আনন্দময়ী। এইরূপ বিষাদ, বিরহ, সংশয়ের পর কবি হিমালয়শিখরে প্রণয়িনী দেবীর সহিত আনন্দ-মিলনের চিত্র আঁকিয়া গ্রন্থ শেষ করিয়াছেন।

কবি যে সূত্রে সারদামঙ্গলের এই শেষের কবিতাগুলি গাঁথিয়াছেন তাহা ঠিক ধরিতে পারিয়াছি কি-না জানি না—মধ্যে মধ্যে সূত্র হারাইয়া যায়, মধ্যে মধ্যে উচ্ছ্বাস উন্মত্ততায় পরিণত হয়, কিন্তু এ কথা বলিতে পারি, আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে প্রেমের সঙ্গীত এরূপ সহস্রধারে উৎসের মতো কোথাও উৎসারিত হয় নাই। এমন নির্মল সুন্দর ভাষা, এমন ভাবের আবেগ, কথার সহিত এমন সুরের মিশ্রণ আর কোথাও পাওয়া যায় না। বর্তমান সমালোচক এককালে বঙ্গসুন্দরী ও সারদামঙ্গলের কবির নিকট হইতে কাব্য-শিক্ষার চেষ্টা করিয়াছিল, কতদূর কৃতকার্য হইয়াছে বলা যায় না, কিন্তু এই শিক্ষাটি স্থায়িভাবে হৃদয়ে মুদ্রিত হইয়াছে যে, সুন্দর ভাষা কাব্য-সৌন্দর্যের একটি প্রধান অঙ্গ; ছন্দে এবং ভাষায় সর্বপ্রকার শৈথিল্য কবিতার পক্ষে সাংঘাতিক। এই প্রসঙ্গে আমার এই কাব্যগুরুর নিকট আর একটি ঋণ স্বীকার করিয়া লই। বাল্যকালে বাল্মীকি-প্রতিভা নামক একটি গীতি-নাট্য রচনা করিয়া 'বিদ্বজ্জন-সমাগম' নামক সম্মিলন-উপলক্ষে অভিনয় করিয়াছিলাম। বঙ্কিমচন্দ্র এবং অন্যান্য অনেক রসজ্ঞ লোকের নিকট সেই ক্ষুদ্র নাটকটি প্রীতিপ্রদ হইয়াছিল। সেই নাটকের মূল ভাবটি, এমন কি, স্থানে স্থানে তাহার ভাষা পর্যন্ত বিহারীলালের সারদামঙ্গলের আরম্ভভাগ হইতে গৃহীত।

আজ কুড়ি বৎসর হইল সারদামঙ্গল আর্য্যদর্শন পত্রে, এবং ষোল বৎসর হইল পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে, ভারতী পত্রিকায় কেবল একটিমাত্র সমালোচক ইহাকে সাদর-সম্ভাষণ করেন। তাহার পর হইতে সারদামঙ্গল ষোড়শ বৎসর অনাদৃত ভাবে প্রথম সংস্করণের মধ্যেই অজ্ঞাতবাস যাপন করিতেছে। কবিও সেই অবধি আর বাহিরে দর্শন দেন নাই। যিনি জীবন-রঙ্গভূমির নেপথ্যে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া দর্শক-মণ্ডলীর করতালিধ্বনির অতীত ছিলেন, তিনি আজ মৃত্যুর যবনিকান্তরালে অপসৃত হইয়া সাধারণের বিদায়-সম্ভাষণ প্রাপ্ত হইলেন না, কিন্তু এ কথা সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারি, সাধারণের পরিচিত কণ্ঠস্থ শত-সহস্র রচনা যখন বিনষ্ট এবং বিস্মৃত হইয়া যাইবে, সারদামঙ্গল তখন লোকস্মৃতিতে প্রত্যহ উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিবে, এবং কবি বিহারীলাল যশঃস্বর্গে অম্লান বরমাল্য ধারণ করিয়া বঙ্গসাহিত্যের অমরগণের সহিত একাসনে বাস করিতে থাকিবেন।

[১৩০১]

মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র

• সুরেশচন্দ্র দত্ত

বাল্যকালে শুনিতাম, ভারতচন্দ্রের ন্যায় কবি আর কখনও জন্মগ্রহণ করে নাই। শুনিতাম, বাঙ্গালা ভাষায় ভারতের কবিত্বের ন্যায় কবিত্ব আর হয় নাই, তাঁহার ন্যায় মৌলিকতা অন্য কোনও কবির নাই, তাঁহার ন্যায় মধুরতা ও লালিত্যও অন্য কবির নাই।

এখনও অনেকে ভারতচন্দ্রকে বঙ্গদেশের প্রধান কবি মনে করেন। মাননীয় পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন, ভারতচন্দ্রের সিংহাসন গ্রহণ করিতে পারে, এরূপ কবি এখনও বঙ্গদেশে হয় নাই। অন্যান্য বঙ্গীয় লেখক ও পাঠকেরও মত এই যে, কাশীরাম, কৃত্তিবাস, মুকুন্দরাম প্রভৃতি প্রাচীন কবিগণ গুণাকর ভারতচন্দ্রের সমকক্ষ নহেন; আধুনিক কবি মধুসূদন দত্তও ভারতের নিকটে স্থান গ্রহণ করিতে পারেন না।

আমরা অদ্য এ বিষয়ে কোনও সমালোচনা করিব না। ভারতচন্দ্র কি দরের কবি, তাহার নিষ্পত্তি করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। তবে যাঁহারা ভারতচন্দ্রের মৌলিকতার প্রশংসা করেন, তাঁহারা একবার কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের কবিতা পড়িবেন, এইটি আমাদের প্রার্থনা। গুণাকর পত্রে-পত্রে কবিকঙ্কণের নিকট ঋণী, কবিকঙ্কণের কবিত্ব পত্রে-পত্রে নকল করিয়াছেন, কবিকঙ্কণের স্বাভাবিক ও সুন্দর বর্ণনাগুলি অলঙ্কার দিয়া কিঞ্চিৎ অস্বাভাবিক করিয়া তুলিয়াছেন। কবিকঙ্কণের কাব্য সরল,

স্বাভাবিক ও সুপাঠ্য, গুণাকরের কাব্য অধিকতর সুললিত, কিন্তু অস্বাভাবিক এবং অনেক স্থানে অপাঠ্য। আমরা এ বিষয়ে অল্প কয়েকটি উদাহরণ দিতে ইচ্ছা করি।

সতী ও দক্ষযজ্ঞের কথা লইয়া উভয় কবির কাব্য আরম্ভ হইয়াছে। শঙ্করের নিকট অনুমতি না পাইয়া, সতী অভিমানিনী হইয়া দক্ষালয়ে চলিলেন, এই কথা উভয় কবি বর্ণনা করিয়াছেন। মুকুন্দরাম সতীর অভিমানের স্বাভাবিক বর্ণনা দিয়াছেন, গুণাকর ভারতচন্দ্র এই স্থলে সতীর দশ রূপের বিস্তীর্ণ বর্ণনা দিয়া আপনার চাতুর্য্য ও পাণ্ডিত্য দেখাইয়াছেন :—

"অনুমতি দেহ হর, যাইব বাপার ঘর,
যজ্ঞ মহোৎসব দেখিবারে।
ত্রিভুবনে যত বৈসে, চলিলা বাপার পাশে,
তনয়া কেমনে পাসরবে ॥

চরণে ধরিয়া সাধি, কৃপা কর কৃপানিধি,
যাব পঞ্চ দিবসের তরে।
চিরদিন আছে আশ, যাইতে বাপের বাস,
নিবেদন নাহি করি ডরে ॥

পর্ব্বত-কন্দরে বসি, নাহি পাশে সুপড়শী,
সীমন্তে সিন্দুর দিতে সখী।
এক দিন যথা যাই, জুড়াইতে নাহি ঠাঁই,
বিধি মোরে কৈল জন্মদুঃখী ॥

সুবদন-সুত্র-করে, আইনু তোমার ঘরে,
পূর্ণ হৈল বৎসর দুই সাত।
দূর কর বিসম্বাদ, পূরহ আমার সাধ,
বাপের বচনে যাব তাত ॥

পিতা মোর পুণ্যবান্, করিবে অনেক দান,
কন্যাগণে দিবে ব্যবহার।
আমি আগে পাব মান, আভরণ পরিধান,
ভেদবুদ্ধি নাহিক বাপার ॥

সতীর বচন শুনি, কহিলেন শূলপাণি,
শুন প্রিয়ে আমার বচন।
বাপ-ঘরে যদি চল, তবে না হইবে ভাল,
অবশ্য হইবে বিড়ম্বন।

যাইবারে অনুমতি, নাহি দিল পশুপতি,
হৈমবতী হৈলা কোপবতী।
আপন মতাবে যাবা, চলিলা ভ্রূকুটি-ভীমা,
একাকিনী বাপের বসতি ॥

হইয়া উন্মত্তবেশা, যান চণ্ডী মুক্তকেশা,
না শুনিয়া শিবের বচন।
হরের আদেশ পেয়ে, পিছে নন্দী যায় ধেয়ে,
বৃষভেরে করিয়া সাজন॥"

—মুকুন্দরাম

"নিবেদন শুনহ ঠাকুর পঞ্চানন।
যজ্ঞ দেখিবারে যাব পিতার ভবন॥
শঙ্কর কহেন বটে বাপঘরে যাবে।
নিমন্ত্রণ বিনা গিয়া অপমান পাবে॥
যজ্ঞ করিয়াছে দক্ষ শুন তার মর্ম।
আমারে না দিবে ভাগ এই তার কর্ম॥
সতী কন মহাপ্রভু হেন না কহিবা।
বাপঘরে কন্যা যেতে নিমন্ত্রণ কিবা॥
যত কন সতী শিব না দেন আদেশ।
ক্রোধে সতী হৈলা কালী ভয়ঙ্কর বেশ॥
মুক্তকেশী মহামেঘবরণা দন্তুরা।
শবারূঢ়া করকাঞ্চী শবকর্ণপুরা॥
গলিতরুধিরধারা মুণ্ডমালা গলে।
গলিতরুধির মুণ্ড বামকরতলে॥
আর বামকরেতে কৃপাণ খরশাণ।
দুই ভুজে দক্ষিণে অভয় বরদান॥
লোলজিহ্বা রক্তধারা মুখের দুপাশে।
ত্রিনয়ন অর্দ্ধচন্দ্র ললাটে বিলাসে॥ ১॥
দেখি ভয়ে মহাদেব ফিরাইলা মুখ।
তারারূপ ধরি সতী হইলা সম্মুখ॥
নীলবর্ণা লোলজিহ্বা করালবদনা।
সর্প বান্ধা ঊর্দ্ধ এক জটা বিভূষণা॥
অর্দ্ধচন্দ্র পাঁচখানি শোভিত কপাল।
ত্রিনয়ন লম্বোদর পরা বাঘছাল॥
নীলপদ্ম খড়্গ কাতি সমুণ্ড খর্পর।
চারি হাতে শোভে আরোহণ শিবোপর॥ ২॥"

—ভারতচন্দ্র

দক্ষের শিব-নিন্দার কথাও সেইরূপ। মুকুন্দরামের বর্ণনা স্বাভাবিক; যথা—

"পরিধান বাঘছাল, গলায় হাড়ের মাল,
বিভূতি-ভূষণ শোভে অঙ্গে।
শ্মশানে যাহার স্থান, কেবা তার করে মান,
প্রেত ভূত চলে যার সঙ্গে॥"

ভারতচন্দ্রের বর্ণনা পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং যথার্থ, যথা—

"গণ্ডারের তন, কামারের গুণ,
বয়সে বাপের বড়;
কোন গুণ নাই, যেথা সেথা ঠাঁই,
সিঁদেতে নিপুণ দড়।"

দক্ষযজ্ঞ-বিনাশের বর্ণনায়ও কবিদ্বয়ের বিভিন্নতা বিশেষ লক্ষিত হয়। মুকুন্দরাম সহজ কথায় লিখিয়াছেন—

"সঙ্গে নানা ভূত রুদ্র বীরভদ্র
চলে যজ্ঞ নাশিবারে।
দক্ষের নিজ পুর ভাঙ্গিয়া করে চুর,
কেহ নিবারিতে নারে॥
ব্রাহ্মণে ধরিয়া, পুঁথি লয় কাড়িয়া,
ডোর দিয়া ভুজ বান্ধে।
ব্রাহ্মণ না মার, ব্রাহ্মণে না মার,
পৈতা দেখাইয়া কান্দে॥
বেগে ঘোড়া ধায়, শালা ধরে তায়,
পাড়িয়া উপাড়ে দাড়ি।
ভাঙ্গিল দশন, ছিঁড়িল বসন,
ভৃগুর ধরিয়া দাড়ি॥"

ভারতচন্দ্রের বর্ণনা সকলেই জানেন। তাঁহার কথার বিন্যাস ও ভাষার লালিত্য বিস্ময়কর—

"মহারুদ্র-রূপে মহাদেব সাজে।
ভভম্ ভভম্ শিঙ্গা ঘোর বাজে॥
লটাপট জটাজূট সংঘট্ট গঙ্গা।
ছলচ্ছল টলট্টল কলক্কল তরঙ্গা॥
ফণাফণ্ ফণাফণ্ ফণীফণ্ণ গাজে।
দিনেশ-প্রতাপে নিশানাথ সাজে॥
* * * *
ভূতনাথ ভূতসাথ দক্ষযজ্ঞ নাশিছে।
যক্ষ রক্ষ লক্ষ লক্ষ অট্ট অট্ট হাসিছে॥
প্রেতভাগ সানুরাগ ঝম্প ঝম্প ঝাঁপিছে।
ঘোর রোল গণ্ডগোল চৌদ্দ লোক কাঁপিছে॥
মার মার ঘের ঘোর হান হান হাঁকিছে।
হুপ হাপ দুপ দাপ আশ পাশ ঝাঁকিছে॥
অট্ট অট্ট ঘট্ট ঘট্ট ঘোর হাস হাসিছে।
হুম হাম দুম দাম ভীমশব্দ ভাষিছে॥
ঊর্দ্ধ বাহু যেন রাহু চন্দ্র সূর্য্য পাড়িছে।
লম্ফ ঝম্প ভূমিকম্প নাগবৃন্দ নাড়িছে॥"

এই শব্দবিন্যাস যদি কবিত্ব হয়, তাহা হইলে ভারতচন্দ্রের ন্যায় কবি জগতে জন্মগ্রহণ করেন নাই!

তৎপরে উমার জন্ম-কথা উভয় কবি বর্ণনা করিয়াছেন। কুমারসম্ভব-নামক অতুল্য কাব্যে কবিগুরু কালিদাস যে সকল কথা বর্ণনা করিয়াছেন, অর্থাৎ কামদেবের ভস্ম হওন, রতির বিলাপ ইত্যাদি বৃত্তান্ত বঙ্গীয় কবিদ্বয়ও বর্ণনা করিয়াছেন। দুই-একটি অংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

"কামকান্তা কামে রতি কোলে করি মৃত পতি
ধূলায় ধূসর কলেবর।
লোটায়ে কুন্তল-ভার, তেজি নানা অলঙ্কার
সঘনে ডাকয়ে প্রাণেশ্বর ॥
পড়িয়া চরণ-তলে, রতি সকরুণে বলে,
প্রাণনাথ কর অবধান ॥
তিলেক দারুণ দৈবে, পালটিলা নিজ মায়া,
দূরে কৈলা সোহাগ সমান ॥
আছিলা উত্তম দেহ, রতিরে সংহতি লহ,
পালটিলা পূর্ব্বের পিরীত।
তুমি নাথ যাবে যথা, আমি আগে যাব তথা,
তবে কেন কৈলা বিপরীত ॥
মোর পরমায়ু লয়ে চিরকাল থাক জীয়ে,
আমি যাই তোমার বদলে।
যে গতি পাইবে তুমি, সে গতি পাইব আমি,
রহিব তোমার পদতলে ॥"

—মুকুন্দরাম।

"পতিশোকে রতি কাঁদে বিনাইয়া নানা ছাঁদে,
ভাসে চক্ষু জলের তরঙ্গে।
কপালে কঙ্কণ মারে, রুধির বহিছে ধারে,
কাম-অঙ্গ-ভস্ম লেপে অঙ্গে ॥
আলুথালু কেশ-পাশ, ঘন ঘন বহে শ্বাস,
সংসার পুরিল হাহাকার।
কোথা গেল প্রাণনাথ, আমারে করহ সাথ,
তোমা বিনা সকলি আঁধার ॥
তুমি কাম আমি রতি, আমি নারী তুমি পতি,
দুই অঙ্গ একই পরাণ।
পূর্ব্বে যে পীরিতি ছিল, শেষে তাহা না রহিল,
পিরীতির এ নহে বিধান ॥

যথা যথা যেতে প্রভু, মোরে না ছাড়িতে কভু,
এবে কেন আগে ছাড়ি গেলা।
বিচ্ছেদ প্রেম বাড়াইয়া, জ্ঞান গেলা ছাড়াইয়া,
এখন বুঝিনু বিচ্ছেদ খেলা।।
না দেখিব সে বদন না হেরিব সে নয়ন,
না শুনিব সে মধুরবাণী।
আগে মরিবেন স্বামী, পশ্চাতে মরিব আমি,
এত দিন ইহা নাহি জানি।।"

—ভারতচন্দ্র।

কবিগুরু কালিদাসের অনুসরণ করিয়া মুকুন্দরাম গৌরীর তপস্যা-বর্ণনা করিয়াছেন। তপস্যা-স্থানে মহাদেব দ্বিজবেশ ধারণ করিয়া উপস্থিত হইলেন :—

"অথাজিনাষাঢ়ধরঃ প্রগল্ভবাগ্
জ্বলন্নিব ব্রহ্মময়েন তেজসা।
বিবেশ কশ্চিজ্জটিলস্তপোবনং
শরীরবদ্ধঃ প্রথমাশ্রমো যথা।।" —কুমারসম্ভব।

কালিদাসের মহাদেবের ন্যায় মুকুন্দরামের দ্বিজরূপী মহাদেবও গৌরীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন :—

"কহ নিরুপমা, কার বোলে বামা,
থাকিলা তুমি কঠোর তপে।
হইয়া সুন্দরী, ভজহ ভিখারী,
বরিবে বর দিগম্বরে।।
শুন গো চন্দ্রমুখি, তোমারে আমি দেখি,
রূপেতে ভুবনমোহিনী।
কতেক আছে বর, ভুবনে মনোহর,
ইচ্ছিলা বুড়া বর আপনি।"

অবশেষে মহাদেব নিজ-রূপ ধারণ করিলেন। হরগৌরীর বিবাহ হইল। মহাদেবের বেশ দেখিয়া মেনকা খেদ করিলেন। পরে মহাদেব সুন্দর রূপ ধারণ করায় মেনকা তুষ্ট হইলেন। এ সমস্ত কথা মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র—উভয়েই বর্ণনা করিয়াছেন।

পরের সৌভাগ্য দেখিলে নিজের মন্দ ভাগ্যের কথা অনেকেরই মনে উদয় হয়। মহাদেবের সুন্দর রূপ দেখিয়া অনেক অভাগিনী নারী আপনাদিগের মন্দ-ভাগ্য-সম্বন্ধে আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মুকুন্দরামের সেই বর্ণনাটি উদ্ধৃত করা আবশ্যক :—

"দেখিয়া সুন্দর রূপ যতেক যুবতী।
একে একে নিন্দা করে আপনার পতি।।

সার্থক জনম গৌরী কৈল অভিলাষে।
সেই হেতু পাইল হর মনের হরিষে॥
অদৃষ্টের কথা কিছু কহনে না যায়।
যে লিখিল থাকে বিধি অবশ্য তা হয়॥
আর নারী বলে হোক না ভাবিহ বাধা।
মনোদুঃখ মনে থাক ভাল পাবে কোথা॥
যে হোক সে হোক নারীর স্বামী ত ভূষণ।
পতি-সেবা কর সবে বেদ নারায়ণ॥"

এই বর্ণনাটিতে বিশেষ সৌন্দর্য্য নাই, কিন্তু বর্ণনাটি সরল ও স্বাভাবিক। মুকুন্দরাম যাহাই লিখেন, তাহাই সরল ও স্বাভাবিক। নারীগণ আপনাদিগের মন্দ ভাগ্যের বিষয়ে আক্ষেপ করিতেছে বটে, কিন্তু পতিসেবাই যে পরম ধর্ম্ম, এই মহীয়সী কথাও স্মরণ করিতেছে।

এই বর্ণনার অনুকরণ করিয়া ভারতচন্দ্র তাঁহার বিদ্যাসুন্দরে কিরূপে নারীগণের পতিনিন্দা-বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পাঠকগণের অবিদিত নাই। মুকুন্দরামের বর্ণনা স্বাভাবিক ও সুপাঠ্য, ভারতচন্দ্রের বর্ণনা অস্বাভাবিক এবং ভদ্রসমাজে অপাঠ্য।

দেবদেবীর কথা সাঙ্গ করিয়া মুকুন্দরাম দুইটি উপাখ্যান লিখিয়াছেন—একটি কালকেতু ও ফুল্লরার উপন্যাস, অপরটি শ্রীমন্ত সদাগরের উপাখ্যান। দুইটি উপাখ্যানই সরল ভাষায় লিখিত, দুইটিতেই মানবহৃদয়ের স্বাভাবিক বৃত্তিগুলি ও নরনারীর সুখ-দুঃখ সহজভাবে বর্ণিত হইয়াছে। কালকেতু পশু-বধ করিয়া জীবন-ধারণ করে, তাহার গৃহিণী ফুল্লরা সেই পশু-মাংস হাটে বিক্রয় করিতে যায়, এবং স্বামীর গৃহকর্ম্ম সম্পাদন করে। চণ্ডীর অনুগ্রহে সেই কালকেতু দেশের রাজা হইল। চণ্ডী যখন প্রথমে ষোড়শী-রূপে কালকেতুর ঘরে দর্শন দিলেন, ফুল্লরা তাঁহাকে দেখিয়া বিস্মিত ও ভীত হইল, এবং পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। চণ্ডী যে পরিচয় দিলেন, সেটি উদ্ধৃত করা আবশ্যক :—

"কি আর জিজ্ঞাসা কর, আমার তোমার ঘর,
বীরের দেখিতে নারি দুখ।
দিয়া আপনার ধন, তুষিব বীরের মন
আজি হ'তে পাবে অতি সুখ॥
কি কব দুঃখের কথা, গঙ্গা নামে মোর সতা,
স্বামী রাখে ধরেন মস্তকে।
সতত গরল খায়, মোর পানে নাহি চায়,
তখন ছাড়িনু এই দুঃখে॥
গঙ্গা বড় ঝাটচালি সদাই পাড়িছে গালি,
স্বামীর সোহাগ পরতাপে।
দেখিয়া পতির দোষ, হইল পরম রোষ,
লাজে জলাঞ্জলি দিনু তাপে॥

দারুণ দৈবের গতি, হইনু অবলা জাতি,
তাহি সঙ্গে হয়ে গেল বেলা ।
বিষকণ্ঠ মোর স্বামী, সহিতে না পারি আমি,
তাহে হইল সতিনী প্রবলা ।।
সতীনের সম্মান, আপনার অপমান,
অভিমানে নাহি মেলি আঁখি ।
দেখিয়া দারুণ সতা, বিবাহ দিলেন পিতা
পিতৃকুলে হইনু বিমুখী ।।
আমার কর্ম্মের গতি, উগ্র হইল মোর পতি,
পাঁচ মুখে মোরে দেয় গালি ।
তাহে সতীনের জ্বালা, কতেক সহিবে বালা
পরিতাপে হয়ে গেনু কালী ।।
পুত্রের সম্পদ্ বড়, সাত সতীনেতে দড়,
অনুক্ষণ করায় কোন্দল ।
কি মোর কপালে এল, খাইয়া ধুতুরা ফল
আচম্বিতে হইল পাগল ।।
বিভূতি মাখেন গায়, ঝিকিকে ঝিকিকে যায়,
তাহে আছে পরে বাঘছাল ।
ভুজঙ্গ-বেষ্টিত অঙ্গ, মাথায় ডম্বুর গঙ্গ
গলায় লোটিছে হাড়মাল ।।
কি হবে বিষয়-সুখ, তাহে পতি পরাঙ্মুখ,
ভাবে বসে সাধে কায়-ঋষি ।
সাত সতিনীয়া মাঝে, বুঝিয়া না পারি কাজে
সাত সতা সবাকের বৈরী ।।
যে ঘরে সতিনী রয়, কালানলে প্রাণ দয়
যেমন লাগয়ে বিষ-জ্বালা ।
বিধি মোরে দৈল বাদ, না গণিনু পরিবার,
বনবাসী হইনু একলা ।।
এবে বিধি দৈল লেখা, বীর-সঙ্গে পথে দেখা,
সত্য করি আনে নিজ ঘরে ।
শুন গো বাপের ঝি, তোমারে বুঝাব কি,
এবে আমি যাব কোথাকারে ।।"

এই বর্ণনার অনুকরণ করিয়া ভারতচন্দ্র পাটুনীর নিকট অন্নপূর্ণার পরিচয়-দান ব্যাখ্যা করিয়াছেন :—

"ঈশ্বরীরে পরিচয় কহেন ঈশ্বরী ।
বুঝহ ঈশ্বরী আমি পরিচয় করি ।।
বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি,
জানহ স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী ।।

গোত্রের প্রধান পিতা মুখবংশজাত।
পরম কুলীন স্বামী বন্দ্যবংশখ্যাত॥
পিতামহ দিলা মোরে অন্নপূর্ণা নাম।
অনেকের পতি তেঁই পতি মোর বাম॥
অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।
কোন গুণ নাহি তার কপালে আগুন॥
কু-কথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ।
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ॥
গঙ্গা নামে সতা তার তরঙ্গ এমনি।
জীবন-স্বরূপা সে স্বামীর শিরোমণি॥
ভূত নাচাইয়া পতি ফেরে ঘরে ঘরে।
না মরে পাষাণ বাপ দিলা হেন বরে॥
অভিমানে সমুদ্রেতে ঝাঁপ দিলা ভাই।
যে মোরে আপনা ভাবে তারি ঘরে যাই॥"

চণ্ডীর প্রসাদে যখন কালকেতু নূতন নগর নির্ম্মাণ করিয়া রাজা হইলেন, তখন তাঁহার সৌভাগ্যের উদয় হইয়াছে দেখিয়া চারি দিক্ হইতে চতুর চাটুকারগণ ছুটিয়া আসিল। তাহাদিগের মধ্যে ভাঁড়ুদত্ত নামক একজন ধূর্ত্ত কায়স্থের কবি যে বর্ণনা দিয়াছেন, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্বাভাবিক বর্ণনা সাহিত্য-ভাণ্ডারে দুষ্প্রাপ্য :—

"ভেট লয়ে কাঁচকলা, পশ্চাতে ভাঁড়ুর শালা,
আগে ভাঁড়ুদত্তের প্রয়াণ।
ফোঁটা কাটা মহাদম্ভ, ছেঁড়া জোড়ে কোঁচা লম্ব,
শ্রবণে কলম খরশান॥
প্রণাম করিয়া বীরে, ভাঁড়ু নিবেদন করে,
সম্বন্ধ পাতিয়া খুড়া খুড়া।
ছেঁড়া কম্বলে বসি, মুখে মন্দ মন্দ হাসি,
ঘন ঘন দেয় বাহু নাড়া॥
আইনু বড় প্রীতি আশে, বসিতে তোমার দেশে,
আগেতে ডাকিবে ভাঁড়ু দত্তে।
যতেক কায়স্থ দেখ, ভাঁড়ুর পশ্চাতে লেখ,
কুল শীল বিচার মহত্ত্বে॥
কহি আপনার তত্ত্ব, আমার ইঁত্তার দত্ত,
তিন কুলে আমার মিলন।
ঘোষ ও বসুর কন্যা, দুই নারী মোর ধন্যা,
মিত্রে কৈল কন্যা-বিতরণ॥
গঙ্গার দুকূল পাশে, যতেক কায়স্থ বৈসে,
মোর ঘরে করয়ে ভোজন।
ধরি বস্ত্র অলঙ্কার, দিয়া করে ব্যবহার,
কেহ নাহি করয়ে বঞ্চন॥

বহু পরিবার বেলা, দুই ভার্য্যা চারি শালা,
চারি পুত্র বহিনী শাশুড়ী ।
ক্ষুধ খাবাই ক্ষুধ চেড়ি, সেই হেতু ছন্ন বাড়ী,
খানা দিবে নাহি দিব বাড়ী ॥
হাল-বলদ দিবে খুড়া, দিবে হে বিস্তর খুড়া,
ভেনে খাইতে ঢেঁকি কুলা দিবে ।
আমি পাত্র তুমি বাবা, আগে কর মোর পূজা,
অবশেষে ঠাকুরে আনিবে ॥"

ভারতচন্দ্র বর্ণনায় অদ্বিতীয় পণ্ডিত, কিন্তু এরূপ স্বাভাবিক বর্ণনা ভারতচন্দ্রের গ্রন্থের মধ্যে কোথায় পাইব ?

বিদ্যাসুন্দরে হীরা মালিনীর বর্ণনা পাঠ করিয়া সেকালের পাঠকগণ বিমোহিত হইতেন। কিন্তু মুকুন্দরাম শ্রীমন্ত সদাগরের উপাখ্যানে দুর্ব্বলা-নাম্নী এক দাসীর যে চরিত্র অঙ্কণ করিয়াছেন, হীরা মালিনী তাহারই ছায়া অবলম্বনে অঙ্কিত। শ্রীমন্ত সদাগরের পিতা ধনপতি সদাগর। তাহার দুই স্ত্রী, লহনা ও খুল্লনা। দুই সপত্নীর মধ্যে প্রথমে পরম প্রীতি ছিল, কিন্তু দুষ্টা দাসী দুর্ব্বলা কালসর্পের ন্যায় তাহাদের মধ্যে যাইয়া বিচ্ছেদ-সাধন করিল; বড় সপত্নী লহনার নিকট যাইয়া বলিল :—

"শুন শুন মোর বোল ওগো লহনা ।
এবে যে করিলে নাশ আপনি আপনা ॥
সাপিনী বাঘিনী সতা পোষ মানি রাখে ।
অবশেষে এই তোমায় বধিবে পরাণে ॥
কপালিকলাপ জিনি খুল্লনার কেশ ।
অর্দ্ধ পাকা কেশে তুমি কি করিবে বেশ ॥
খুল্লনার মুখশশী করে ঢল ঢল ।
শঙ্কিতায় মলিন তোমার গণ্ডস্থল ॥
ক্ষীণমধ্যা খুল্লনা যেমন মধুকরী ।
যৌবনবিহীনা তুমি হৈলা বটোদরী ॥
আসিবেন সাধু গৌড়ে থাকি কত দিন ।
খুল্লনার রূপে হবে কামের অধীন ॥
অধিকারী হবে তুমি রন্ধনের ধামে ।
মোর কথা স্মরণ করিবে পরিণামে ॥"

এইরূপ পরামর্শ পাইয়া লহনা ক্রমে খুল্লনার প্রতি বিরূপমনা হইলেন এবং অনেক অত্যাচার করিতে লাগিলেন। কিন্তু চণ্ডী লহনাকে স্বপ্ন দেওয়ায়, লহনা পুনরায় ছোট সপত্নীর প্রতি প্রসন্ন হইলেন। দুই সপত্নীর মধ্যে পুনরায় প্রীতি হইয়াছে, দাসী

বিদেশ হইতে ঘরে আসিতেছেন, খুল্লনার কপাল ফিরিয়াছে, তখন দুর্ব্বলা দাসী ছুটাছুটি করিয়া বড় মার নিন্দায় ছোট মার মনস্তুষ্টি-সাধনে প্রবৃত্ত হইল :—

"আর শুনেছ ছোট মা সাধু আইল ঘরে।
বাহির হইয়া শুন বাজনা নগরে॥
পোহাইল আজি যে তোমার দুঃখনিশা।
ভবানী-প্রসাদে তোর পূর্ণ হইল আশা॥
আমারে আপনা বলে' রাখিবে চরণে।
দুর্ব্বলা অভাগা দাসী নহে তোমা বিনে॥
তোমার প্রাণের আমি পাশরতি বাঁদী।
সাধুর নিকটে তার আনাইব পাঁজী॥
দোষ বড় বলি না কর প্রতিকার।
কি জানি ঘটায় পাছে দুঃখ পুনর্ব্বার॥
যত দুঃখ পাইলা তুমি জেঠী বলে বাধা।
তোমার হইয়া আমি কহিব সে কথা॥
সোনার খাট খুঞা সাজ রাখ বাসঘরে।
সাধুর চক্ষের বালি করি লহনারে॥"

আবার তাহারই পর বড় মার নিকট আসিয়া ছোট মার নিন্দা আরম্ভ করিল :—

"আর শুনেছ বড় মা মরম চরিত।
হেন বুঝি সাধুর কাছে বলে বিপরীত॥
যেই দণ্ডে সদাগরের পাইল ভেরী-সাড়া।
আনিল ভাণ্ডার হইতে আভরণ-পেড়া॥
কনক কঙ্কণ হাতে ভূষিত করি পা।
যৌবন-গরবে ভূমে নাহি পড়ে পা॥
সেই সদাগর আইল আপনার বাসে।
যোড়ন কাজল পরি বৈসে তার পাশে॥
আড় নয়নে কহে কথা অমৃতের কপা।
কোথায় নাহিক দেখি এমন ঠেঁটাপনা॥
উহার লোভা গৌর গায়ে নবীন যৌবন।
গুরুজন দেখি লাজে না দেয় বসন॥
তুমি বড় ভগিনী তোমায় সতীন দুখি।
স্বামী ভেটিবারে নাহি লয় অনুমতি॥
অন্যাকে দেখায় রূপ যৌবন-সম্পদ।
অন্য স্বামী হৈলে তার গলে দিত পদ॥"

তাহার পর সাধু ঘরে আসিলে মহা হুলুস্থুল পড়িয়া গেল, রন্ধনের আয়োজন হইতে

নির্মাণ করিতে পিঠা,　　কিনা-পরে কিনে আটা,
　　খণ্ড কিনে বিনা মাত আটি।
বেসাতি দুর্ব্বলা আনে,　　অবশেষে হাঁড়ি কিনে,
　　বাসো নয় তবে কিছু ভাট ॥
কিনিয়া বহু-শাক,　　অরুলিতে নয় বাধ,
　　হরিদ্রা দুরকি ভরি কিনে।
স্নান করি দুর্ব্বলা,　　খায় দধি খণ্ড কলা,
　　চিড়া দই যেন ভাণ্ডী কনে ॥
আগে পাছে ভারী জন,　　দুবা আগে নিবেদন,
　　উপনীত সাধুর বাড়িতে।
চতুরা সাধুর দাসী,　　আগে ঠেট দিয়া বাসী,
　　পুণায় করিল সন্তাপরে ॥"

এই স্থানে আমরা প্রবন্ধ সাঙ্গ করিলাম। কোনটি উৎকৃষ্ট কি সকলটি উৎকৃষ্ট, তাহা পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন। আমরা এইমাত্র বলিতে পারি যে, মুকুন্দরামের নায়ক-নায়িকার ন্যায় নর-নারী আমরা প্রতিদিন বিশ্ব-সংসারে দেখিতে পাই। ধনপতির ন্যায় বিষয়ী, লহনা ও খুল্লনার ন্যায় সপত্নী, ভাঁড়ুদত্তের ন্যায় প্রবঞ্চক, দুর্ব্বলার ন্যায় দাসী—আমরা সংসারে সর্ব্বদাই দেখিতে পাই। সংসার দেখিয়া মুকুন্দরাম নায়ক-নায়িকা চিত্রিত করিয়াছেন। ভারতচন্দ্র অসাধারণ পণ্ডিত, অসাধারণ চতুর, বাক্যবিন্যাসে অসাধারণ ক্ষমতাশালী; কিন্তু তাঁহার নায়ক-নায়িকাগুলি কি সংসারের নর-নারী? হীরার ন্যায় চতুরা মালিনী, সুন্দরের ন্যায় বিলাসপরায়ণ নায়ক, বিদ্যার ন্যায় বিলাসিনী নায়িকা সংসারের সচরাচর নর-নারী নহে।

মুকুন্দরাম সংসারের কথা বর্ণনা করিয়াছেন, ভারতচন্দ্র সমাজবিশেষের রসিকতা বর্ণনা করিয়াছেন।

[সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩০১]

নবীনচন্দ্র

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

সমাজ-দেহে জীবনীশক্তি বর্ত্তমান থাকিলে, উহাতে বাহিরের একটা নূতন রসের সঞ্চার হইলে, সে সমাজ-দেহ যতই কেন মুমূর্ষু হউক না, উহা কিছু কালের জন্য আবার সজীব হইয়া উঠে। জাতি প্রবল থাকিলে এই সজীবতার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় পুনরুত্থান সম্ভব হয়, নহিলে এই কিছু কালের সজীবতা পরিণামে প্রগাঢ়তর স্থবিরতায় পর্য্যবসিত হয়। সমাজ-তত্ত্বের এই সিদ্ধান্তকে মান্য করিয়া ভারতেতিহাসের দুই

কালের দুইটি বিপ্লবের পর্য্যালোচনা করিলে, আমরা কবি নবীনচন্দ্রের বঙ্গসাহিত্যে স্থান ও মান—এই দুই বিষয় বুঝিতে পারিব।

প্রথম ইস্লাম ধর্ম্মের ও মুসলমান সভ্যতার সংঘর্ষে আসিয়া ভারতের হিন্দুসমাজের ও সাহিত্যের বিপ্লব ঘটে। সেই বিপ্লবের ফলে এক পক্ষে গোরক্ষনাথ, রামানন্দ, নানক ও শ্রীচৈতন্য ধর্ম্মপ্রচারক- ও সমাজ-সংস্কারক-রূপে অবতীর্ণ হন; অন্য পক্ষে, সুরদাস, শ্যামদাস, তুলসীদাস, বিহারীলাল প্রভৃতি সাহিত্যসেবিগণ আর্য্যাবর্ত্তে, আর বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, কৃষ্ণদাস, মুকুন্দরাম, গোবিন্দদাস, জয়ানন্দ, চন্দ্রশেখর প্রভৃতি কবিগণ মিথিলায় ও বঙ্গে আবির্ভূত হন। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে ইহারাই পঞ্জাব হইতে বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে বিষম বিপ্লব উত্থিত করিয়াছিলেন। ভারতে ইস্লাম ধর্ম্মপ্রচারের ফলে জাতিভেদের মূলে কুঠারাঘাত হইল। হিন্দুসমাজ-দেহে যাহারা চিরকাল নীচ ও অস্পৃশ্য হইয়া ছিল, ইস্লামের কৃপায় তাহারা শ্রেষ্ঠের সমান হইয়া উঠিল। যে চণ্ডাল হিন্দু থাকিলে কখনই কোন উচ্চ জাতির সহিত একাসনে বসিতে পাইত না, সে মুসলমান হইলেই ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের সহিত একাসনে বসিতে পাইত। ফলে, হিন্দুসমাজের ভিত্তি-স্বরূপ নিম্নকুলের শূদ্র-শ্রেণি সকল দলে দলে মুসলমান হইতে লাগিল। সমাজে একটা বিষম বিপ্লব উপস্থিত হইল। অন্য দিকে সাদী, হাফেজ, ফর্দ্দৌসী ওমর খায়াম্ প্রভৃতি মুসলমান কবিগণের কাব্য ও গাথা নূতন ভাব ও নূতন তত্ত্ব হিন্দুর সম্মুখে আনিয়া দিল। হিন্দুর ভাব-বিপ্লবও ঘটিল। এই বিপ্লব হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য সমাজের মনীষিগণ ইস্লাম-শক্তির সহিত একটা আপোষ করিতে উদ্যত হইলেন। গোরক্ষনাথ জাতি-নির্ব্বিশেষে শৈব ধর্ম্মের প্রচার আরম্ভ করিলেন। তিনি ব্যাখ্যা করিলেন যে, মহাদেব সদাশিব নিরাকার, নির্ব্বিকার ঈশ্বর। তাঁহাতে রূপের আরোপ করিয়া তাঁহার উপাসনা করিতে হয় না। চিহ্ন বা প্রতীক-স্বরূপ এক খণ্ড প্রস্তর লিঙ্গ-বিধায় পূজিত হইবে। আর এই মহাদেবের মন্দিরে ও উপাসনায় উচ্চ-নীচ নাই, ব্রাহ্মণ-শূদ্র নাই। রামানন্দও বৈষ্ণব ধর্ম্মকে এই হিসাবে সর্ব্বজাতির সেব্য করিতে চাহিলেন। তিনি ভক্তির পন্থা অবলম্বন করিয়া ম্লেচ্ছ, শূদ্র হইতে ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত সকলকেই এক সূত্রে বাঁধিতে চাহিলেন। হরিভক্ত রামভক্ত, ম্লেচ্ছ-চণ্ডাল হইলেও ব্রাহ্মণের পূজ্য হইবে—ইহাই রামানন্দের আদেশ, কেন-না, ভক্তির পথ সকলেরই গম্য ও সেব্য। গুরু নানক ব্যবহার-ধর্ম্ম বা moralityকে ভক্তিতে ডুবাইয়া, সন্ন্যাসের সহিত মিশাইয়া, ইস্লাম ও হিন্দুত্বের আপোষে শিখধর্ম্মের সৃষ্টি করিলেন। শেষে বাঙ্গালায় শ্রীচৈতন্য শুদ্ধ হরিভক্তি-প্রবাহের প্রভাবে সকল বাধা অতিক্রম করিয়া এক নবীন ধর্ম্মের সৃষ্টি করিলেন; ঈশ্বরপ্রেম ও মধুর রসকে আশ্রয় করিয়া তিনি আচণ্ডালে হরিনাম বিলাইলেন।

এইভাবে ইস্লামের সহিত হিন্দুত্বের কতকটা আপোষ হইল। হিন্দুসমাজে কতকটা সামঞ্জস্যের ভাব দেখা দিল। পক্ষান্তরে, সাহিত্যেও এইরূপ বিপ্লব ঘটিল।

এই ভাবেই তাহারও সামঞ্জস্য হইয়াছিল। তবে এই সময়ে ভাবপ্রবাহ পশ্চিম হইতে বঙ্গে আসিয়াছিল। সুরদাস, শ্যামদাস, তুলসীদাস প্রভৃতির হিন্দী পদাবলী, গীত ও মহাকাব্য সকল পাঠ করিয়া বাঙ্গালার চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, মুকুন্দরাম প্রভৃতির লেখা পড়িলে মনে হয়, যেন বাঙ্গালায় হিন্দীর প্রতিধ্বনি শুনিতেছি। মুকুন্দরামের চণ্ডী-কাব্যে তুলসীকৃত রামায়ণের অনেক ছত্র, অনেক শ্লোক প্রায় পাওয়া যায়। সুরদাসের গীত-লহরী হইতে চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাসের সর্বস্ব পাওয়া যায়। এখন এক-একটি পদ তুলিয়া আশ্চর্য্য সম্মিলনের পরিচয় দিবার সময় নহে। তবে যাঁহারা হিন্দুস্থানী কবিদের লেখা পড়িয়াছেন সেই সঙ্গে চণ্ডীদাস জ্ঞানদাস মুকুন্দরাম ঘনরাম প্রভৃতিও পড়িয়াছেন তাঁহারা এই কথার যাথার্থ্য স্বীকার করিবেন। একটা কথা বলিয়া রাখা ভাল যে এ দেশে ইংরেজের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে বাঙ্গালা হিন্দুস্থানের সহিত সম্বন্ধ-চ্যুত হয় নাই —বাঙ্গালী স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া বিচ্ছিন্ন হয় নাই। বাঙ্গালার শিক্ষিত হিন্দুকে রাজদরবারে সভায় বাহিরে হইলে হিন্দী, উর্দ্দু ও ফারসী শিখিতে হইত। তখন বাঙ্গালী-মাত্রই হিন্দী বলিতে ও বুঝিতে পারিতেন। বাঙ্গালা ভাষাও হিন্দী হইতে এখনকার মত একটা পৃথক্ হইয়া যায় নাই। এই হেতু মনে হয় বাঙ্গালার কবি হিন্দুস্থানের কবিকে আদর্শ করিয়া কাব্য-গাথা লিখিতেন।

যে যাহা হউক, এই জাতীয় নবোন্মেষের সময়ে যেমন ধর্ম্মে হিন্দু ও মুসলমানের বিশ্বাস-সামঞ্জস্য ঘটিয়াছিল, তেমনই সাহিত্যেও হিন্দু ও মুসলমান-রুচির সামঞ্জস্য সাধিত হইয়াছিল। ভক্তি যেমন ধর্ম্মসম্বন্ধে সামঞ্জস্যীকরণের উপাদান ছিল, তেমনই রূপজ মোহ, লালসা ও ভক্তির মধ্য আস্বাদন সাহিত্যের ভূষণ-স্বরূপ হইয়াছিল। সাহিত্যে ইসলাম-রুচি পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরে এই রুচির বিকট বিকাশ হইয়াছে। কবিকঙ্কণের কাঁচলীর বর্ণনা আর কবি শ্যাম-দাসের শ্রীমতীর কাঁচলীর বর্ণনা ভাবে ও ভাষায় একরূপ। এ বর্ণনা ইসলাম রুচি-জাত। এমন ভাবে নারীর আভরণের বর্ণনা হিন্দুর পূর্ব্বের সাহিত্যে পাওয়া যায় না। হিন্দুর সমাজ-দেহের এই যে অভ্যুত্থান ইহাকে ইংরাজীতে Indo-Islamic Renaissance বলা যাইতে পারে।

ইংরেজের অভ্যুদয় প্রথমে বাঙ্গালা দেশেই হয়। বাঙ্গালীই প্রথমে ইংরেজের সভ্যতার ও বিদ্যার পরিচয় পায়। সে পরিচয়ে বাঙ্গালা একটা নূতন সামগ্রী পাইল উহা European Individualism —উচ্চ-নীচ নাই, পুরাতনের নাই। পুরুষকার সকলেরই আয়ত্ত, তাহার প্রভাবে সকলেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদ পাইতে পারে। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন পুরুষকার তত্ত্ব ভুলিয়া গিয়া বাঙ্গালী এই পুরুষকারের মোহে মুগ্ধ হইয়াছিল। মুগ্ধ হইবার একটু হেতুও ছিল। ফরাসী-বিপ্লবের পরে ইউরোপ ফরাসীর অনুশীলিত ও প্রচারিত নূতন সাম্যবাদ পাইয়াছিল। সেই সাম্যবাদের উপঢৌকন প্রথমেই ইংরেজ বাঙ্গালীকে দিয়াছিল। এই সাম্যবাদ ও এই পুরুষকারের মোহে বাঙ্গালী প্রথমে দলে দলে খ্রীষ্টান হইতে লাগিল। নব্যরা আসনে বসং জাতি-

বিচার ছিল উচ্চ-নীচের পার্থক্য ছিল, সমাজে বিধি-নিষেধ ছিল। ইংরেজ এ দেশে আসিয়া সে সব উড়াইয়া দিতে চাহিলেন। ফরাসীদের নিকট হইতে ধার করিয়া Liberty, Fraternity ও Equality—এই তিন মহামন্ত্র ইংরেজ বাঙালীকে শিখাইলেন। হিন্দুসমাজে এই নবীন শিক্ষার প্রভাবে একটা বিপ্লব ঘটিল। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার ও খ্রীষ্টান ধর্ম্মের সহিত আপোষ করিয়া সমাজ রক্ষার উদ্দেশ্যে রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্ম ধর্ম্ম গড়িলেন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র শিক্ষা-প্রণালীর সাহায্যে নবীন ছাঁচে পাশ্চাত্ত্য ভাব ও কথা এ দেশে প্রচুর পরিমাণে আমদানী করিলেন। পাশ্চাত্ত্য-শিক্ষার তিনিই প্রথম সমাজ-সংস্কারক হইলেন। পক্ষান্তরে, মাইকেল মধুসূদন হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র এক দিকে, আর বঙ্কিমচন্দ্র ও ভূদেব অন্য দিকে, সাহিত্যের পথে স্বদেশীর আবরণে এ দেশে পাশ্চাত্ত্য ভাব প্রচুর আমদানী করিলেন। ইঁহারাই আধুনিক Indo-European Renaissance এর প্রচারক- ও প্রবর্ত্তক-স্বরূপ।

প্রথমেই ইংলণ্ডের সাহিত্যে যাহা আছে, আমাদের বাঙ্গালা-সাহিত্যে যাহা নাই, তাহারই আমদানী আরম্ভ হইল। মাইকেল মিল্টনের অনুকরণে অমিত্রাক্ষরে মহাকাব্য মেঘনাদবধ রচনা করিলেন। এ কাব্যে পাশ্চাত্ত্য Individualism পূর্ণ-পরিস্ফুট। আদিম মহাভারতে বা বিষ্ণুপুরাণে যেমন কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন, হিরণ্য-কশিপু, ভীষ্ম প্রভৃতি পুরুষার্থ পুরুষ চরিত্র-কথা আছে, ইস্লাম-যুগে অনুষ্ঠানের প্রাবল্যে ভক্তিমূলক আত্ম-নিবেদনের আধিক্যে জাতীয় সাহিত্যে ঐরূপ চরিত্র-কথার অভাব হইয়াছিল। মাইকেল সে অভাব পূর্ণ করিলেন,—রাবণ, মেঘনাদ প্রভৃতি পুরুষার্থ-পুরুষ চরিত্রের অঙ্কন করিয়া জাতীয় সাহিত্যকে অলঙ্কৃত করিলেন। কবি হেমচন্দ্র এই Individualism-কে বা পুরুষকারকে দেশভক্তিচেতনায় পরিবর্ত্তিত করিলেন, তাঁহার কবিতাবলী, আশা ও বৃত্রসংহারের দধীচির চরিত্র ইহার পরিচায়ক। খাঁটি Patriotism ইউরোপের সামগ্রী—এ দেশের নহে। কবি হেমচন্দ্র উহা এ দেশে কবির ভাষায় ফুটাইয়াছিলেন।

কবি নবীনচন্দ্র প্রথমে মাইকেল ও হেমচন্দ্রের ভাবস্রোতে পড়িয়াছিলেন। তাহার ফলে তাঁহার শ্রেষ্ঠ কাব্য—পলাশীর যুদ্ধ। উহাতে Patriotism অতি মধুর-ভাবে বর্ণিত ও বিবৃত আছে।

এই সময়ে এ দেশের ডাক্তার কঙ্গ্রিভের মুখে অগষ্ট কোম্তের (Auguste Comte) মতের আমদানী হয়। সে Humanitarianism আমাদের চক্ষে সম্পূর্ণ নূতন বোধ হইল। সে Humanitarianism এর প্রভাবে ভারতের নানা জাতি ও নানা ধর্ম্মের সমন্বয় সম্ভব মনে হইল। এই সময়ে আবার Nationalism বা জাতীয়তার প্রথম বিকাশ বাঙ্গালায় হয়। বঙ্কিমচন্দ্র ইউরোপীয় ভাবকে দেশীয় ছাঁচে ঢালিয়া মিলাইবার চেষ্টা করিতেছেন—ইউরোপের Culture-তত্ত্বটিকে কালা আদমীর শাস্ত্রসম্মত করিতে উদ্যত

পরিস্ফুট হইয়াছে। কবি নবীনচন্দ্র তাঁহার কাব্যে ইউরোপের এই বিচিত্র Transcendentalism এর কতকটা বেশ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

কবি নবীনচন্দ্রের কাব্য-শক্তির পরিচয় দিবার এখনও সময় হয় নাই। তবে বঙ্গ-সাহিত্য ও সমাজে তাঁহার স্থান ও মান কেমন তাহার পরিচয় যথাশক্তি প্রদত্ত হইল। তিনি বর্ত্তমান অভ্যুত্থানের শেষ মহাকবি—শেষ ব্যাখ্যাতা ও প্রচারক। জয়ানন্দ, কৃষ্ণদাস কবিরাজ-প্রমুখ বৈষ্ণব কবিগণ কবিতার প্রভাবে ও কাব্যগ্রন্থ-প্রচারে যে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন ঠিক সেই রকম উদ্দেশ্য না হউক, তদনুরূপ উদ্দেশ্য-সিদ্ধির প্রয়াসে কবি নবীনচন্দ্র ইদানীং কবিতাগ্রন্থসকল লিখিয়া দিয়াছেন। আপাততঃ ইহাই তাঁহার যথেষ্ট পরিচয়।

[সাহিত্য, ১৩১৫]

কবি হেমচন্দ্র*

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

কবি হেমচন্দ্র বাঙ্গালায় নবীন যুগের প্রবর্ত্তনার কালে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ১২৪৫ সালের ৬ই বৈশাখ তিনি ভূমিষ্ঠ হন। সে সময়ে বঙ্গদেশে নবীন ইংরেজি শিক্ষা ও সভ্যতার বন্যা আসিয়াছিল। সে ইংরেজি শিক্ষা ও সভ্যতায় ফরাসী-বিপ্লবজাত সিদ্ধান্তসকল অতিমাত্রায় বাঙ্গালায় আমদানী হইতেছিল। সে আমদানীর ফলে—'কালস্রোত তখন কেবলই ভাঙ্গিতেছিল, ভাঙ্গিব বলিয়া ভাঙ্গিতেছিল, গড়িব বলিয়া ভাঙ্গিতেছিল। হেমবাবুর জন্ম-সময়ে কোন কিছু ভাঙ্গিতে পারিলেই কৃতবিদ্য আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিতেন। সমাজ ভাঙ্গিতে হইবে, ধর্ম্ম ভাঙ্গিতে হইবে, প্রথা ভাঙ্গিতে হইবে, চরিত্র ভাঙ্গিতে হইবে, সদাচার ভাঙ্গিতে হইবে। এমন কি, অনাচারে অত্যাচারে ব্রহ্মতেজ করিয়া অকালে কালস্রোতে ডুবিতে পারাও যেন সেই সময়ে গৌরবের বিষয় বলিয়া বিবেচিত হইত।' অক্ষয়বাবু কবিবরের জীবন-কথা লিখিতে যাইয়াও এই কথা বলিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে—ফরাসী-বিপ্লব সমাজ-দেহের যে কাল-মূর্ত্তি ইয়ুরোপে প্রবেশলাভ করিয়া ও সেইখানেই থাকিয়াছে, অতীতকে ভুলিয়া ফেলিয়া সমাজের জন্য যেন এক নূতন বেদী গড়িয়া দিয়াছে। সেই বেদীর উপর সমাজ তাঁর ব্যক্তিত্বকে প্রচণ্ড শক্তির প্রভাবে নিজ রুচি দেশ-কাল-পাত্রের অনুকূল নূতন করিয়া গড়িয়া লইয়াছে। এই গড়নে প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক জাতির Genius বা প্রকৃতি ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহাই তখন নবীন সিদ্ধান্ত।

*অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রণীত 'কবি হেমচন্দ্র' গ্রন্থ।

মাইকেল 'নূতন মালা গাঁথিয়া,' গৌড়জন-সুধাবহ 'মধুচক্র রচিয়া' বহুদিন মধুর সংসার ত্যাগ করিয়াছেন। আজ বিরোধ, বিদ্বেষ ও ঐহিক সুখ-দুঃখের অতীত মহাকবি মধুসূদনের স্মৃতি সপ্রমাণ করিতেছে,—'কীর্তির্যস্য স জীবতি!' মধুসূদন বাঙ্গালীর মানসে, স্মৃতি-জলে, কি বসন্তে কি শরতে, মধুময় তামরসের মত দিবা-শ্রীমণ্ডিত হইয়া ফুটিয়া আছেন। নিন্দুকের—পরকীর্তিদ্বেষী পুঙ্গবের সাম্প্রদায়িক নিন্দার ঝড়ে সে তামরস ঝরে নাই, ঝরিবে না।

যে মধুসূদন স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল—ত্রিভুবনের রমণীয় এবং ভয়াবহ প্রাণী ও পদার্থসমূহ সম্মিলিত করিয়া পাঠকের দর্শনেন্দ্রিয় সমক্ষে চিত্রফলকের ন্যায় চিত্রিত করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার কাব্য ও কবিত্বের বিশ্লেষণ ক্ষুদ্র পরিসরে সম্ভব নয়। তাই আজ তাঁহার কাব্য ও কবিত্বের মূলতত্ত্ব স্মরণ করিতেছি। মধুসূদন স্বদেশবৎসল। গৌড়' তাঁহার স্মৃতি-পট হইতে কপোতাক্ষের ছবি মুছিয়া ফেলিতে পারে নাই:—

'জুড়াই এ কান আমি ভ্রান্তির ছলনে।
বহু দেশে দেখিয়াছি বহু নদ-দলে,
কিন্তু এ স্নেহের তৃষা মিটে কার জলে?
দুগ্ধ-স্রোতোরূপী তুমি জন্মভূমি-স্তনে।'

—দেশমাতার প্রতি প্রেম-ভক্তির এমন সুন্দর ছবি, দেশাত্মবোধের এমন মমতাপূর্ণ অভিব্যক্তি বাঙ্গালা সাহিত্যে আর আছে কি?

মাইকেল সহানুভূতি ও সমবেদনার উৎস এবং তাহাই মাইকেলের বিশেষত্ব, পূর্বে তাহা বলিয়াছি। মাইকেল উদার অন্তঃকরণে সমবেদনায় নিমজ্জিত। বীর কবি বীরের ভক্ত। ব্যথিতের বেদনায় কবির প্রাণ কাঁদে। স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতালে মধুসূদনের মমতার অনুভূতি বহিয়া যায়।

আদি কবি বাল্মীকি হইতে নবীন পর্যন্ত প্রায় সকল কবিই অযোধ্যার রাজবংশের সহিত সমবেদনা ও সহানুভূতির সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। সোনার লঙ্কা শ্মশান হইল, রাবণের বংশ গেল, এ জন্য তাঁহাদের কোনও কবির চিত্ত বেদনায় চঞ্চল হয় নাই,—কেহ এক বিন্দু অশ্রুজলে সে শোচনীয় নির্যাতন নির্বাণকে সিক্ত করিবার চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু মাইকেল রাবণ-পরিবারেও সমবেদনা ও সহানুভূতির অশ্রুধারা ঢালিয়া দিয়াছেন। ইন্দ্রজিতের বীরত্বে মুগ্ধ না হয়, এমন বাঙ্গালী কে আছে? প্রমীলার দুঃখে বিগলিত না হয়, এমন পাষাণ কে আছে? সুখশান্তি-বঞ্চিত নিরাশের হিমাচলকে যিনি সমবেদনার অশ্রুজলে ভাসাইয়া দিতে পারেন, তাঁহার শক্তির গভীরতার পরিমাণ কে করিবে?

মাইকেল শুধু বীররসের কবি নন, তিনি করুণরসেও সিদ্ধহস্ত। মাইকেলের সমবেদনা, সহানুভূতি ও করুণায় বাঙ্গালার মরুক্ষেত্র স্নিগ্ধ হউক।

মাইকেলের দুইটি উপদেশ যেন বাঙ্গালীর মনে যুগযুগান্তর দেদীপ্যমান থাকে। তিনি বাঙ্গালী সম্বন্ধে মধুসূদনের নিকুম্ভিলা দূতী বলিয়াছেন—

'বাহু-তেজে তব জাতি বাক্য দুর্বল।'

তুমি কু-জন্ম মানব বাঙ্গালী! ইহা স্মরণ রাখিও।

মেঘনাদবধের মত সর্গ বাঙ্গালীর জীবন-বেদ হউক। অরিন্দম, কর্ব্বুরকুলগর্ব্ব, মেঘনাদ রাবণের দাস বিভীষণকে যে ধিক্কার করিয়াছিলেন, তাহা বাঙ্গালীর মনে আগুনের অক্ষরে লিখিয়া দাও। যথা—

'—শাস্ত্রে বলে গুণবান্ যদি
পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি
নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ; পর পর সদা।'

আজ মধুসূদনের স্মরণে বাঙ্গালার গগনে-পবনে এই 'লাখ কথার এক কথা' উড়াইয়া দাও। প্রত্যেক বাঙ্গালী—ভারতবাসীর হৃদয়ে এই কয়টি কথা যেন গাঁথা থাকে। তা যদি থাকে, তাহা হইলে এ দেশে মধুসূদনের জন্ম সার্থক। তা যদি না হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালায় মধুসূদনের আবির্ভাব নিষ্ফল।

[সাহিত্য, ১৩২৩]

কৃত্তিবাস

স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

আদিকবি বাল্মীকির রামায়ণের পর কালিদাস আবার সেই রাম-চরিত্রেরই পুনরায় বর্ণনা করিলেন। রামায়ণ শ্লোকবদ্ধ মহাকাব্য, কালিদাসের রঘুবংশও শ্লোকবদ্ধ মহাকাব্য। কালিদাসের আবির্ভাবের বহু পূর্ব্ব হইতে রামায়ণ ভারতের সকল সমাজে কীর্ত্তিত, গীত, পঠিত ও ভক্তি-পূর্ব্বক শ্রুত হইত। তথাপি কালিদাসের রঘুবংশ ভারতের বিদ্বজ্জন সাদরে গ্রহণ করিলেন। ইহার হেতু কি? এরূপ সুপরিচিত ও সর্ব্বদা শ্রুত বৃত্তান্তের পুনঃ পঠন-পাঠনে এই যে আগ্রহ, এত যে আদর, তাহার একমাত্র কারণ কালিদাসের প্রাঞ্জল ভাষা ও ভাবের সুস্পষ্টতা। যদি ভাষা এত সুন্দরী এবং সম্পদ্‌শালিনী না হইত, তাহা হইলে কেবল ভাবের তরঙ্গলীলায় বা কল্পনার ক্রীড়ায় কালিদাসের কাব্য সুধী-সমাজের চিত্তাকর্ষণ করিতে পারিত না।

কল্পনা-বিষয়ে বাল্মীকির সহিত কালিদাসের তুলনা করিতে যাওয়া বৃথা। তবুও যে, কালিদাস এত প্রসিদ্ধি-লাভ করিয়াছেন তাহার প্রধান কারণ তাঁহার সুমধুর ভাষা। কালিদাস ব্যতীত আরও অনেকে রামায়ণ উপজীব্য করিয়া কাব্যাদি রচনা করিয়াছেন কিন্তু তাঁহাদের গ্রন্থ জন-সমাজে রঘুবংশাদির ন্যায় আদৃত হয় নাই। এই সাদর অনাদরের একমাত্র কারণ, ভাষাগত প্রাঞ্জলতা এবং ভাবের সুস্পষ্টতা। কালিদাস এমন মনোহারিণী ভাষায় তদীয় কাব্য রচনা করিয়াছেন যে যে কোন সময়ে, যে কোন সমাজের লোকেই তাহা পাঠ করুক না কেন বিমুগ্ধ হইবেন। সংস্কৃত সাহিত্যে এই ভাষাগত উৎকর্ষের জন্য যেমন কালিদাসের শ্রেষ্ঠতা, বঙ্গীয় সাহিত্যেও তেমনই ভাষাগত উৎকর্ষের নিমিত্ত কৃত্তিবাসের শ্রেষ্ঠতা। যে ভাষা সম্প্রদায়-বিশেষের জন্য গঠিত অর্থাৎ কেবল শিক্ষিত বা কেবল অশিক্ষিতদিগের জন্য যে ভাষা রচিত, ধনী-নির্ধন, পণ্ডিত-মূর্খ ইহাদের একতরের উদ্দেশ্যে যে ভাষা গঠিত তাহা কদাচ স্থায়ী বা সর্বসাধারণের উৎকৃষ্ট ভাষা হইতে পারে না। সেরূপ ভাষায় নিবদ্ধ গ্রন্থাদি কখনও চিরস্থায়ী হইতে পারে না। তাহাকে প্রকৃত ভাষা বলা যায় না। তাদৃশী ভাষায় বিরচিত গ্রন্থাদি কালের অনন্ত স্রোতে দেখিতে দেখিতে ভাসিয়া যায়—অল্প কালমধ্যেই তাহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়।

যে ভাষা কোনও সম্প্রদায়-বিশেষে সীমাবদ্ধ নহে, সকল সম্প্রদায়-নির্বিশেষে সমাজ-দেহের প্রত্যেক শিরা-ধমনী শৈলিকায় যে ভাষা প্রবেশ করিতে পারে, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোকে যে ভাষাকে "আমার" বলিয়া গ্রহণ করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করে,—শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-নির্ধন, পণ্ডিত-অপণ্ডিত সকলেই সমান ভাবে যে ভাষাকে আদর করিয়া লয়েন তাহাই যথার্থ ভাষা। কালিদাস, সর্বকালানুযায়িনী সর্বভাব-প্রকাশিনী, সর্বমনোহারিণী ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়াই যেমন তাঁহার কাব্য সকল সম্প্রদায়ে সকল সময়ে, সকলের প্রিয়, মহাকবি কৃত্তিবাসও তদীয় অনবদ্য রামায়ণ-কাব্য সেইরূপ সর্বজনবোধগম্য ও সর্বজনমনোহারিণী ভাষায় রচনা করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার রামায়ণ এত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। যে সমুদয় কাব্যের ভাষা প্রাঞ্জল নহে বা ভাবও সুস্পষ্ট নহে সেই সকল কাব্যের প্রচার হওয়া বা স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে না। ভাষা ও ভাব উভয় সম্পদে সম্পন্ন বলিয়াই কৃত্তিবাসের রামায়ণ দীর্ঘজীবী হইয়া রহিয়াছে। সংস্কৃতে কালিদাস এবং বঙ্গভাষায় কৃত্তিবাস—এই দুই জন একই কারণে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন।

কৃত্তিবাসের পরে আরও অনেক কবিযশঃপ্রার্থী ব্যক্তি রামায়ণ রচনা পূর্বক বঙ্গসাহিত্যের অঙ্গ পরিপুষ্ট করিয়াছেন কিন্তু তাঁহাদের সকলের দ্বারাই যে ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে এ কথা নিঃসংকোচে বলা যায় না।

কৃত্তিবাস এবং তৎপরবর্তী অনেকে একই রামায়ণ-উপজীব্য কাব্য রচনা করিলেন, কিন্তু কৃত্তিবাসের কাব্য আবালবৃদ্ধবনিতার নিকট সকল সময়েই আদরণীয় হইল, ইহার প্রকৃত কারণ কি?

শাক্ত এবং বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের লিপিকারগণের কল্যাণে কৃত্তিবাসের অনেক স্থলে যেমন শাক্ত-প্রভাব পরিদৃষ্ট হয়, তেমনই বৈষ্ণব-প্রভাবও পরিদৃষ্ট হয়। ইহা ছাড়া, অন্যান্য পুরাণ, উপপুরাণ প্রভৃতি হইতে অনেক মনোরম অংশও লিপিকারগণ বাছিয়া আনিয়া কৃত্তিবাসে জুড়িয়া দিয়াছেন। অনেকে অনেক নূতন কবিতার প্রণয়ন করিয়া কৃত্তিবাসের গ্রন্থে পুরিয়া দিয়া স্ব স্ব আত্মাভিমানের পূজা করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ কৃত্তিবাস হইতে শত শত স্থল উদ্ধৃত করা যাইতে পারে,—ঐতিহাসিকের সে কার্য্য হইতে আমি বিরত হওয়াই সঙ্গত মনে করি।

রামায়ণী কথার আশ্রয়ে কালিদাস, ভবভূতি, রঘুবংশ, উত্তররামচরিত রচনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু যে স্থানে যেরূপ প্রয়োজন, তাঁহারা নূতন মূর্ত্তিও গঠন করিয়াছেন। কবির কল্পনা বৈদ্যুতিক শক্তিতে শক্তিমান্। সেই সতত চঞ্চলা শক্তি কদাচ কোন নির্দ্দিষ্ট পথে, কোন পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট রেখা বাহিয়া চলিতে পারে না, জানেও না। তাই কবি-কৃত সৃষ্টিতে অনেক স্থলে মূল আদর্শেরও পরিবর্ত্তন দেখিতে পাই। কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি মহাকবিগণ তাই মহর্ষি-কৃত পথ কল্পনার সোজা অল্প-বিস্তর ছাড়িয়া অন্য পথেও গিয়াছেন। কৃত্তিবাসও সেইরূপ নিজ-কল্পনার দ্বারা অনেক আলেখ্য অঙ্কিত করিয়া তাহার খুব মনোজ্ঞ করিয়াছেন, সর্ব্বত্রই বাল্মীকির অনুসরণ করেন নাই। বীরবাহু, তরণীসেন প্রভৃতির সৃষ্টি তাঁহার চরম কল্পনা-শক্তির উৎকর্ষ খ্যাপন করিতেছে। কবিগণ কাহারও অঙ্গুলি-সঙ্কেতে চলেন না। কল্পনা কাহারও দাসীত্ব করিতে জানে না। কল্পনা কখনও কবিকে মেঘের উপর লইয়া গিয়া সৌদামিনীর বিলাসচঞ্চলা মূর্ত্তি প্রদর্শন করে, কখনও আবার তুষারমণ্ডিত কমলের কেশরের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া তাঁহাকে কত নিভৃত সৌন্দর্য্য দেখায়। উন্মাদিনী চঞ্চলার ন্যায় কবির উন্মাদিনী কল্পনা কাহারও অঙ্গুলি-সঙ্কেতে পরিচালিত বা ভ্রূ-কম্পনে বিকম্পিত হয় না। সে আপনার ভাবেই আপনি বিভোর হইয়া ছুটে, পরের ভাবে ভুলে না। কৃত্তিবাসের স্বেচ্ছাবিহারিণী কল্পনা কোনও নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া রহে নাই। কোথাও প্রাচীন পথে, কোথাও-বা নূতন পথে—যেখানে যেমন ইচ্ছা, সে কল্পনা চলিয়া গিয়াছে। তরণীসেন, বীরবাহু প্রভৃতির সৃষ্টি এই নূতন পথে যাত্রারই ফল।

কৃত্তিবাস ধরাধামে অবতীর্ণ হইবার পর পাঁচ শত বৎসরেরও অধিক কাল অতীত হইয়াছে বটে, কিন্তু আজও প্রতিক্ষণে তাঁহার নাম বঙ্গের গৃহে গৃহে, বিপণির পণ্যকুটিরে, চাষার আশার কৃষিক্ষেত্রে—সর্ব্বত্র—কীর্ত্তিত হইতেছে। আজ আর

"দক্ষিণে পশ্চিমে যার গঙ্গা তরঙ্গিণী"—

সে "ফুলিয়া" নাই, সে "ফুলিয়া"র কৃত্তিবাসের সেই "চাপিয়া বসতি"র চিহ্নও নাই; কিন্তু সেই ফুলিয়া-পণ্ডিতের মোহন বাঁশরীর ঝঙ্কার এখনও বাঙ্গালীর "কানের ভিতর দিয়া মরমে" প্রবেশ করিতেছে, বাঙ্গালীকে উন্মত্ত করিয়া—বিভোর করিয়া রাখিয়াছে।

কৃত্তিবাসের এই সার্ব্বভৌম প্রসিদ্ধির অপর কতকগুলি কারণও দেখা যায়। ভারতবর্ষের মৃত্তিকা বড়ই কোমল, বড়ই উর্ব্বর। রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির, কর্ণ, ভীষ্ম, দধীচি, শিবি, সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, অরুন্ধতী, লোপামুদ্রা, উশীনরী প্রভৃতি এই ভারতবর্ষেরই চিত্র। যাহার প্রাণে প্রেম, নয়নে ভক্তির অশ্রু, ভারতবাসীরা তাহাকে হৃদয় পাতিয়া গ্রহণ করে—প্রাণ দিয়া পূজা করে। কৃত্তিবাস এ রহস্য বুঝিতেন। তিনি আরও বুঝিতেন যে, নিশীথে নিস্তব্ধ রজনীর সৌম্যমূর্ত্তি যাহার চিত্তকে অভিভূত, বা অনুভূতির বিমল কর ধৌত করিতে না পারে, সে কদাচ ঐ নৈশ নীরবতার মাধুর্য্য অপরকে বুঝাইতে পারে না; সায়ংকালের শ্যামায়মানা বনভূমির প্রাঞ্জল মূর্ত্তি যাহার প্রাণে আকুলতা জন্মাইতে অসমর্থ, সে কখনও সান্ধ্য সুষমার পবিত্র আলেখ্য অঙ্কন করিতে পারে না। সকল পদার্থেরই অনুভূতি চাই। সমস্ত বিষয়েই মগ্ন হওয়া চাই,—প্রাণ অকৃপণভাবে ঢালিয়া দেওয়া চাই, অন্যথা সিদ্ধিলাভ সুদূরপরাহত। কৃত্তিবাস অকৃপণভাবে আপনার প্রাণ কবিতাদেবীর পাদপদ্মে ঢালিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার হাতে আর কিছুই ছিল না; সমস্তই ঐ চরণে অঞ্জলি দিয়াছিলেন, তাই তাঁহার কবিতার কোথায়ও কোনরূপ বাধা দেখিতে পাই না—সর্ব্বত্রই সমান এবং অপ্রতিহত গতি। অসম্ভব হইলেও মনে হয়, যেন এক সময়ে, এক স্থানে বসিয়া, অন্য চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া, মহাকবি তাঁহার সাধের রামায়ণ-গান গাহিয়াছেন। তিনি নিজে সে গানে মজিতে পারিয়াছিলেন, তাই তাঁহার শ্রোতৃবর্গও মজিয়াছে, আত্মবিস্মৃত হইয়া তাঁহার সেবা করিয়াছে, যতদিন চন্দ্র-সূর্য্য থাকিবেন ততদিন করিবেও।

তুমি যখন অভ্রভেদী শুভ্রতুষারশীর্ষ হিমাচলের পাদদেশে বসিবে, বিধাতার কৃপায় তখন যদি তোমার হৃদয়ে কোন প্রশান্ত ছবির ছায়াপাত হয়, কোন বিরাট্ শক্তির স্পন্দন অনুভূত হয়, তবেই তুমি ঐ বিরাট্ হিমাচলের প্রশান্ত ভাবের, প্রশান্ত মূর্ত্তির কিয়দংশ হয়ত তোমার কল্পনা-দর্পণের সাহায্যে অন্যকে প্রদর্শন করিতে পারিবে। অন্যথা তোমার সাধ্য কি যে তুমি হিমাচলের ঐ গাম্ভীর্য-মাধুর্য্যের বর্ণন করিবে? তুমি যে স্থানে, যে সময়ে, যে অবস্থায় বর্ত্তমান, যদি সেই স্থানের, সেই সময়ের, সেই অবস্থার সহিত নিজেকে মিশাইতে না পার, "তদ্ভাবভাবিত" করিতে না পার, তবে কদাচ তদ্দেশীয় ও তৎকালীন ভাবের স্ফুরণ তোমার দ্বারা সম্ভব হইবে না। তোমার দ্বারা তদ্দেশবাসিগণের হৃদয় কদাচ বিমোহিত হইতে পারে না। দীপক রাগের সময়ে তুমি বেহাগ পূরবীতে আলাপ করিলে, তাহা কখনও জমিতে পারে না। সে আলাপে শ্রুতির সুখ হয় না, বরং পীড়াই জন্মে। ভারতবর্ষের, বিশেষতঃ বঙ্গদেশের, ধর্ম্মপ্রাণ অধিবাসীরা কি চায়, কি ভালবাসে, এ তত্ত্ব মহাকবি কৃত্তিবাস বুঝিতেন। এ দেশের লোকের হৃদয় কি উপাদানে গঠিত, কোন্ উপকরণ অধিক, তাহা কৃত্তিবাস জানিতেন, তাই তাঁহার দেশবাসিগণের হৃদয়ের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি তদীয় কল্পনার মোহন বীণায় ঝঙ্কার দিয়াছিলেন। তাই সে ঝঙ্কার, বসন্তের পিক-ঝঙ্কারের ন্যায়,

বঙ্গবাসীদিগকে বিমুগ্ধ—একেবারে আকুল করিয়া তুলিয়াছিল। এই হিসাবেও সংস্কৃতে কালিদাস ও বাঙ্গালায় কৃত্তিবাস একই মন্ত্রে দীক্ষিত, একই পথের যাত্রী। তোমার পাঠকগণ কি চান, কতটুকু চান, তোমার বীণার কোন্ তার স্পর্শ করিলে তাহার ধ্বনি তোমার পাঠকের হৃদয়ে অনুরণিত হইবে, তাহার "কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিবে"—এ জ্ঞান যদি তোমার না থাকে, তবে তুমি যত বড় শক্তিশালী লেখকই হও না কেন, যত বড় কলাবিদ্যাবিশারদই হও না কেন, তোমার লেখায় বা তোমার অঙ্কিত আলেখ্যে তোমার সামাজিকবর্গের বা তোমার দর্শকবৃন্দের পরিতৃপ্তি হইবে না। তোমার সে লেখায় বা সে চিত্রে তোমার দেশবাসী সহৃদয়বর্গের হৃদয় আকৃষ্ট ও বিমোহিত হইবে না। যে সমুদয় লেখকের এই জ্ঞান আছে, তাঁহাদের লেখাই কালজয়ী হয়, থাকিয়া যায়; আর যাঁহাদের এই জ্ঞান নাই, তাঁহাদের লেখা ছিন্ন তুষারের ন্যায় অতি অল্পকালমধ্যেই কোথায় মিলাইয়া যায়। আর্ষ রামায়ণ অবলম্বনপূর্ব্বক অন্য অনেক কবি বঙ্গভাষায় রামায়ণ রচনা করিয়াছেন, কিন্তু তন্মধ্যে কৃত্তিবাসের রামায়ণ যে এত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, প্রায় পাঁচ শত বৎসরেরও অধিক কাল সমানভাবে বা উত্তরোত্তর ক্রমেই অধিকতরভাবে শিক্ষিত-অশিক্ষিত, স্ত্রী-পুরুষ, ইতর-ভদ্র সকল সমাজেই পূজিত হইতেছে, ইহার কারণ হইল পূর্ব্বোক্ত জ্ঞান। কৃত্তিবাসের ঐ জ্ঞান প্রচুর পরিমাণে ছিল। যে দেশে তিনি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সে দেশের অধিবাসীরা কি ভালবাসে, কি চায়, তাহা তিনি জানিতেন এবং তিনিও তাহাই চাহিতেন ও ভালবাসিতেন। তাই তিনি যদি কখনও সামান্য একটু গুন্ গুন্ করিয়া স্বরবিলাস করিয়াছেন, অমনই সেই গুন্ গুন্ ধ্বনি শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়াই যেন তদীয় দেশবাসীদিগের হৃদয় বিমোহিত করিয়া তুলিয়াছে। দিবাবসানে সাগরগামিনী তটিনীর প্রাণের আকুল গীতিকা কুলকুল ধ্বনিতে যেমন শ্রান্ত পথিকের চিত্তে একটা জড়তা, একটা তন্দ্রা আনিয়া দেয়, পথিক অকস্মাৎ তাঁহার কর্ম্মময় দীর্ঘ দিবসের সমস্ত ক্লেশ ভুলিয়া যান, কেমন একটা ঘুমের ঘোরে তাঁহার নয়ন নিমীলিত হইয়া আসে, সেইরূপ প্রেমিক কবি কৃত্তিবাসের মোহিনী বীণার ঝঙ্কারেও বঙ্গবাসীর হৃদয় বিমোহিত—আনন্দালস হইয়া রহিয়াছে।

কবে কোন্ দিন, কত শত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে, তমসার তীরে "মা নিষাদ" বলিয়া বাল্মীকি গান ধরিয়াছিলেন, আর আজও যেন সেই গানের ধ্বনির বিরাম হয় নাই। সে স্বরলহরী যেন বাতাসে এখনও ভাসিয়া বেড়াইতেছে ও ভারতবাসীদের প্রাণে কেমন একটা তন্দ্রা জন্মাইয়া দিতেছে; সেইরূপ কবে কোন্ দিন, কোন্ শুভমুহূর্ত্তে পতিতোদ্ধারিণীর তীরে বসিয়া, তাঁহারই কুলকুল গীতির সুরে সুর মিলাইয়া ফুলিয়ার পণ্ডিত তান ধরিয়াছিলেন—আজ সে ফুলিয়া নাই, সে ভাগীরথীও দূরে সরিয়া গিয়াছেন—কিন্তু সেই স্বপ্নময়, আবেশময় তানের এখনও যেন শেষ হয় নাই। সে রাম, সে অযোধ্যা—কিছুই

নাই, তবুও সেই রামের কথা, রামের স্মৃতি যেমন ভারতের নরনারীর প্রাণে-প্রাণে গাঁথা রহিয়াছে, আজীবন থাকিবেও,—তদ্রূপ আজ সে ফুলিয়া নাই, সে জাহ্নবী নাই, সে কৃত্তিবাস নাই, কিন্তু কৃত্তিবাসের কথা, কৃত্তিবাসের স্মৃতি বঙ্গবাসী কদাচ বিস্মৃত হইবে না।

[নারায়ণ, ১৩২৩]

২৮-১১-৫৮